চিন্তাতরঙ্গিণী।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিদ্যাভূষণ এম, এ-প্রণীত।

শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায়-সঙ্কলিত
ও
তৎকর্ত্তৃক
কলিকাতা মৃজাপুর ২৩ নং কালিদাস সিংহের গলি হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৫৪/২/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, আর্য্যযন্ত্রে,
শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৬

মুখবন্ধ।

আর্য্যদর্শনে সম্পাদকীয় যে সকল রাজনৈতিক, সমাজ-নৈতিক, ও ধর্ম্মনৈতিক অথবা ঐ তিন প্রকার ভাবমিশ্রিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহারই কতকগুলি দ্বারা "চিন্তাতরঙ্গিণী"র সৃষ্টি হইল।

পাঠক পাঠিকা দেখিবেন, প্রাগুক্ত-সম্যগালোচিত প্রবন্ধরাজির কোন কোন স্থলে সহৃদয় লেখক সমাজের বর্ত্তমান দুরবস্থায় আন্তরিক ব্যথিত হইতেছেন, কোথাও বা উহার পূর্ব্বতন সুশৃঙ্খলার বিষয় সুন্দর বিবৃত করিতেছেন, অথবা প্রাচীন অবস্থা স্মরণ করাইয়া সমাজসংস্কারক গণের দৃষ্টিহীনতা আরোগ্যের ব্যবস্থা করিতেছেন; কুত্রাপি বা হৃদয়ের নেপথ্য হইতে রাজনীতির গূঢ় ভাব পরিব্যক্ত করিতেছেন, কোথাও স্বদেশের গভীর অধঃপতনের জন্য অনুশোচনা করিতেছেন, জন্মভূমির গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাণে প্রাণে সম্মিলিত হইতে সকলকে অন্য কোন প্রকারে অনুরোধ না করিয়া সহোদরপ্রতিম স্বদেশবাসিগণের হস্ত ধারণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন; অন্যত্র বা ধর্ম্মনীতির মূল সূত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন।

এক্ষণে, ওজস্বিতা, প্রাঞ্জল্য, ভাবের বিশালতা ও গাম্ভীর্য্য, বর্ণনার সমীচীনতা এবং আলোচনার দূরদর্শিতা দ্বারা এই তরঙ্গিণীর কলেবর পরিপুষ্ট হইয়াছে কি না, তাহা উদার-হৃদয় ও নিরপেক্ষ পাঠক পাঠিকা-গণই বিবেচনা করিবেন।

পরিশেষে বক্তব্য, এই চিন্তাতরঙ্গিণীর প্রবলস্রোতে আবর্জ্জনা-রাশি ভাসিয়া গিয়া যদি কোন হৃদয়-ক্ষেত্র উর্ব্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়া বীজধারণে সক্ষম হয়, তবেই সাক্ষাৎসম্বন্ধে সঙ্কলয়িতার এবং পরোক্ষে লেখকের তাবৎ শ্রম সার্থক বিবেচিত হইবে।

কলিকাতা।
চৈত্র, সন ১২৯৬ সাল।

সঙ্কলয়িতা ও প্রকাশক।
শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায়

চিন্তা-তরঙ্গিণী।

আহ্বান।

আর যে পারি না! এ দুর্ভর যন্ত্রণাময় জীবন আর যে বহিতে পারি না! যে চাকরীতে আমাদের দেশ মাতিয়া রহিয়াছে, সে চাকরীর মদে আমার মন মত্ত হইতেছে না কেন? আমার মন সর্ব্বদা হু হু করে কেন? আমার প্রাণ সর্ব্বদা কাঁদে কেন? অন্তরে সর্ব্বদা রাবণের চিতা জ্বলিতেছে কেন? খুনী আসামীর অন্তরের যে নিরন্তর অন্তর্দাহী যাতনা, তাহা আমি ভোগ করি কেন? উচ্চ পদের পোষাক পরিয়া সকলেই অহঙ্কারে টল মল হইয়া হাসিয়া খুসিয়া আমোদ আহ্লাদে নিতান্ত বিভোর হইয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু সে পোষাক আমার শেল বোধ হইতেছে কেন? শ্বেতচরণে অঞ্জলি দিতে কত পোষাক-ধারী নবীন উৎসাহে মাতিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু সে দৃশ্যে আমার হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হয় কেন? মধুর সঙ্গীত শুনিয়া আর সকলের মন আহ্লাদে নাচিয়া উঠে, কিন্তু আমার মন কাঁদিয়া উঠে কেন? সকলের মুখে গাল-ভরা হাসি, কিন্তু আমার চক্ষে ফল্গুর অন্তর্বাহিনী ধারা কেন? অন্তঃস্থিত বজ্রের স্ফূরণে সকলকেই চমকিত করিতে— তাহার প্রহারে নিরুপায় স্বদেশীয়ের মস্তক চূর্ণীকৃত করিতে, আমাদের দলের বড় আমোদ, কিন্তু তাহাতে আমার হৃদয় কাতর হয় কেন? দলে দলে বসিয়া বৃথা জল্পনায়, পরের নিন্দায় সকলেই মনের স্ফূর্ত্তিতে জীবন কাটাইতেছে, কিন্তু আমার হৃদয় বিষাদে পূর্ণ কেন? বিলাতী পরিচ্ছদে দাস-দেহ বিভূষিত করিয়া বিলাতী চর্ব্ব্য-চোষ্যে লেলিহমান রসনাকে পরিতৃপ্ত করিয়া, ও বিলাতী পেয়ে দুর্ব্বল মস্তিষ্ককে বিঘূর্ণিত করিয়া, বঙ্গীয় যুবক আনন্দে কেমন জ্ঞানশূন্য! কিন্তু কি পাপে এ দৃশ্যে তুষানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হয়? এ বিশ্বব্যাপী আনন্দে— এ সর্ব্বগ্রাসী আমোদ-আহ্লাদে আমি যোগ দিতে পারি না কেন?

চতুর্দ্দিকে শ্বেতাননের পূজার ঘোর ঘটা! ভ্রাতৃবৃন্দ ভক্তিতে গদ্‌গদ-চিত্ত;—পঞ্চ আননে শ্বেতাননের স্তব করিতেছেন, বাছিয়া বাছিয়া পুষ্প চয়ন করিয়া চরণে অঞ্জলি দিতেছেন, ধূপ ধূনা গুগ্‌গুলের গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত। লম্বোদর উপাসকগণ শঙ্খ ঘণ্টা বাদন করিতেছেন; অণ্ড হইতে ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীব বলি পড়িতেছে, বেতনের পরিমাণের বা আশার অনুরূপ নৈবেদ্যের আয়োজন হইতেছে! দেবদেবীর প্রসাদ ভক্তেরা ভক্তিভাবে কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিতেছেন। আনন্দের সীমা নাই। যেন ভারতে কি সৌভাগ্যের দিন উপস্থিত হইয়াছে। যেন আট শত বৎসরের পর ভারতের অদৃষ্ট-গগনে আবার সৌভাগ্য-সূর্য্য সমুদিত হইয়াছে! এমন উৎসবের সময় আমার প্রাণ কাঁদে কেন? কাঁদে কেন কাহাকে বলিব? যাঁহাদের জন্য কাঁদিতেছে, তাঁহারাই যে উৎসবে উন্মত্ত। তাহারাই যে দেব-যাত্রায় সং সাজিতে বিশেষ মজবুৎ। শ্বেত দেবতার সন্তোষার্থ তাঁহারা বহুরূপী হইয়া পড়িয়াছেন। কখন রাজা, কখন রায় বাহাদুর, কখন ডেপুটী, কখন চাপরাশী, নানা রূপ ধারণ করিতেছেন। পরকে ভুলাইবার জন্য সং সাজুন, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু সং সাজিতে সাজিতে ক্রমে আসল সং হইয়া দাঁড়াইতেছেন, ইহাই যে সর্ব্বনাশের মূল। তাঁহাদের জীবনের কোন লক্ষ্য নাই।—অথবা লক্ষ্য নাই বা কেমন করিয়া বলি? নিজের বেতন-বৃদ্ধি, নিজের বেশ-ভূষা, নিজের আসবাব, নিজের ভোজন-পারিপাট্য প্রভৃতিই তাঁহার জীবনের সর্ব্বগ্রাসী লক্ষ্য। তাঁহার স্বজাতি নাই, স্বদেশ নাই, আত্মীয় স্বজন নাই, জ্ঞাতি নাই, কুটুম্ব নাই—আত্মাই তাঁহার সর্ব্বস্ব। 'স্বদেশ রসাতলে যাউক; স্বজাতির ধ্বংস হউক, আত্মীয় স্বজন, জ্ঞাতি, কুটুম্ব অনাহারে মরুক—সে সকল ভাবনা ভাবিয়া মাথা ঘুরাইতে পারি না। যাহারা পাগল, তাহারা ও সকল ভাবনা ভাবুক'—তাঁহার স্বার্থসর্ব্বস্ব মন এই বলিয়া কথঞ্চিৎ আত্মগ্লানির হস্ত এড়াইয়া থাকে। 'ড্যাম খুড়া 'জেঠা মামা খুড়ী জেঠী মাসী—তাঁহারা বসিয়া থাকিবেন, আর আমরা কপালের ঘাম পায় ফেলিয়া নিজের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহা-

দিগকে খাওয়াইব—আলস্যের ভরা পূর্ণ করিব—এ'ত পারি না' এই বলিয়া তিনি নিজের স্বার্থ-অন্ধ চরিত্রের সমর্থন করিয়া থাকেন। যখন তিনি অসংখ্য ডিস্-শোভিত টেবিলের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার চামচ-কণ্টকীর সঞ্চালনে ব্যতিব্যস্ত হয়েন, তখন স্বর্গ যেন তাঁহার করতলস্থ হয়! 'সে সুখ ছাড়িয়া কে স্বজাতি-গৌরব ও স্বদেশানুরাগ লইয়া বৃথা সময় কাটাইবে? যে সকল উন্মত্ত যুবকের খাইয়া দাইয়া আর কাজ নাই, তাহারা ঐ সকল পাগলামী লইয়া থাকুক'—বিলাতী লোহিত জলে যখন মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হয়, মহম্মদী ডিসের সর্ব্বসঞ্চারী-রসে যখন রসনা গলিয়া যায়, তখন বঙ্গীয় যুবকের মুখে এই সব মর্ম্মভেদী কথা শুনিতে পাওয়া যায়। যে সকল যুবক বিদ্যামন্দিরের উচ্চতম সোপানে উঠিয়াও আজ কাল কর্ম্মাভাবে অন্ন বিনা মারা যাইতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিতেছি না। তাঁহাদিগের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। তাঁহাদিগের শুষ্ক রসনায় এরূপ তেজের কথা বাহির হইতে পারে না। যাঁহারা বিদ্যার জোরে বা মুরুব্বি-বলে হাকিমি পাইয়াছেন, বা ওকালতীতে সাইন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মুখেই এইরূপ কথা শুনিতে পাই। অদৃষ্টের কথা কি বলিব? যাঁহারা জনক জননীর চক্ষু অন্ধ করিয়া, প্রিয়তমাকে পাগলিনী করিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিলাতে গমন করেন, সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা বিলাতী তেজ, বিলাতী স্বাধীনতা-স্পৃহা লইয়া আসিয়া নিস্তেজ ভারতের শিরায় শিরায় সেই সকল সংক্রামিত করিবেন—পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানালোকে আঁধার ভারতের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিবেন; কিন্তু হায়! কি পাপে আমরা তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ ভিন্ন-ভাবে দেখিতে পাই? তাঁহারা দেশকে তুলিবেন কি? বিলাত হইতে দেশে পদার্পণ করিয়াই তাঁহাদিগের মনে যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। হোম্ (Home) ছাড়িয়া আসিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাদিগের মন হু হু করিতে থাকে! বাঙ্গালীর অর্দ্ধাচ্ছাদিত দেহ দেখিয়া তাঁহারা লজ্জায় অধোবদন হয়েন! ভাই বন্ধুর গায় জামা নাই, পায় মোজা নাই, পেণ্টুলেন্ কোট পরা নাই দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগের সহিত

একত্রে বাস করিতে, তাঁহাদিগের সহিত মেশামিশি করিতে, অধিক কি ভাই বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতেও, লজ্জা বোধ করেন। 'আমি জজ, আমি মাজিষ্ট্রেট্, আমি সিবিল্ সার্জ্জন, আমি বারিষ্টার্—আমার বাপ, আমার ভাই, আমার বন্ধু অর্দ্ধাবৃত দেহে বাড়িতে থাকে, আসনে বসিয়া আঙ্গুল চাটিয়া অসভ্যের মত ভাত খায়, অসজ্জিত ঘরে সামান্য শয্যায় শয়ন করে, এ'ত প্রাণে সহে না—কেমন করিয়া ইহাঁদিগকে বাপ, ভাই, বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিব? কেমন করিয়া এ লজ্জার কথা সাহেবের কাছে বলিব? সাহেব ইহা টের পাইলে যে আর দলে মিশিতে দিবে না?' এই সকল চিন্তায় বিলাতফেরৎ বাঙ্গালী আকুল। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া অনন্যোপায় হইয়া শেষে তফাৎ থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করেন।

এ দিকে জমিদার-শ্রেণী বিলাসিতার ক্রোড়ে চিরলালিত! পরের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদে না। কেন না, অভাব কি পদার্থ, তিনি জানেন না। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি তোষামোদকারি-গণেই পরিবেষ্টিত। তাহাদিগের মুখনিঃসৃত যশঃ-সৌরভে তাঁহার চিত্ত সতত আমোদিত! তাহাদিগের মুখে তিনি ধর্ম্মে যুধিষ্ঠির, বিক্রমে ভীম, দানশৌণ্ড্যে দাতাকর্ণ, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, বিদ্যায় তর্কপঞ্চানন! তিনি সর্ব্বগুণের আধার। তাঁহার এমন বন্ধু নাই যে, তাঁহার দোষ দেখা-ইয়া দেয়, অথবা বন্ধু থাকিলেও, তাহার সাহস হয় না যে, তাঁহাকে তাঁহার দোষ দেখাইতে পারেন। কারণ, তাহা হইলে বন্ধু তৎক্ষণাৎ তাঁহার দরবার হইতে নিষ্কাশিত হইবেন। তিনি হাই তুলিলেন, সকলে এক সঙ্গে তুড়ি দিতে লাগিল। তাঁহার মাথা ধরিলে সকলে এক-বাক্যে আহা করিয়া উঠিল। এইরূপে তিনি ক্রমে ক্রমে একটী জড়পিণ্ডবৎ হইয়া উঠেন। তাঁহার নিজের ভাবনা ভাবিতে হয় না। কারণ, তাঁহার পর্য্যাপ্ত ধন আছে। পরের জন্য কিরূপে ভাবিতে হয়, সে শিক্ষাও তিনি পান না। তিনি ক্রমে স্বার্থ-পরার্থ-বিহীন এক মুক্ত পুরুষ হইয়া উঠেন, কিন্তু পূর্ণ মুক্তি তাঁহার অদৃষ্টে নাই। তিনি সকল বিষয়ে নিঃস্পৃহ হইয়াও, এক বিষয়ে স্পৃহাবান্। তিনি উপাধি-ভিখারী —এই জন্য তিনি শ্বেতাননের উপাসক। তাঁহার যথা-সর্ব্বস্ব দিয়াও

যদি একটী উপাধি কিনিতে পারেন, তিনি তাহাতেও কুণ্ঠিত নহেন। পরের দুঃখে তাঁহার হৃদয় কাঁদে না, আপনা হইতে সুতরাং পরের দুঃখ-মোচনে তিনি এক পয়সা দিতে প্রস্তুত নহেন। তবে শ্বেতাননের ইঙ্গিতে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত। কি বিষয়ে অর্থব্যয় হইবে, তাহা তিনি জানিতে চান না, শ্বেত দেবতার তুষ্টি-বিধানই তাঁহার জীবনের এক-মাত্র লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য সিদ্ধ হইলেই তিনি চরিতার্থ। কলেজ কর, দুর্ভিক্ষে ব্যয় কর, খাল কাটাও, রাস্তা কর, অথবা আপনারা খাও—কিছুতেই তাঁহার আপত্তি নাই। তাঁহার পক্ষে সবই সমান। শ্বেতানন! তবে তিনি কেবল তোমার নিকট এক বিষয়ের ভিখারী। তিনি তোমার নেক-নজর-প্রার্থী। তুমি কৃপা করিয়া তাঁহাকে একটী উপাধি দেও। পতনোন্মুখ রোম সাম্রাজ্যের ন্যায় তুমিও উপাধি-দান-বিষয়ে মুক্তহস্ত। তোমার কটাক্ষপাতে যখন দীন দুঃখীও রাজা হইতেছে, তখন যাহাদের কিঞ্চিৎ আছে, তাহারা কেন বঞ্চিত হইবে?

এইরূপ অন্তঃসার-শূন্য, নির্লক্ষ্য, আপাত-ভোগ-তুষ্ট, ভাবিদর্শন-বিরহিত, স্বার্থমোক্ষ জড়পিণ্ডসকল লইয়া আমাদের সমাজ গঠিত। তাহার জন্যই বৈদেশিকেরা আমাদিগকে ক্রীড়া পুত্তলীর ন্যায় যে দিকে ইচ্ছা, ও যে প্রকারে ইচ্ছা সঞ্চালিত করিয়া থাকেন। এই জন্য আমাদের জাতীয় জীবন নাই, জাতীয় গৌরব নাই, জাতীয় মমতা নাই। বৈদেশিকেরা আমাদিগকে কুক্কুরের ন্যায় ঘৃণা করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন—আজ জুতা লাথি খাইলেও, কাল আসিয়া তাহারা হাজির হইবে। যাহারা স্বার্থপর, তাহারা স্বার্থের জন্য সমস্ত সহিতে পারে। তাহাদিগের মান অপমান বোধ নাই, স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ নাই, লজ্জা নাই, ঘৃণা নাই, আত্মগ্লানি নাই। তাহারা কিঞ্চিৎ বেতন-বৃদ্ধির জন্য—একটী উপাধি পাইবার জন্য, কখন কখন শুদ্ধ ভবিষ্য স্বার্থ-সিদ্ধির আশায়—বৈদেশিকের চরণে জাতীয় স্বার্থ বলি দিতে পারে। তাহাদিগের উপযাচক হইয়া স্বদেশীয় ভ্রাতার ভুল ধরিয়া, কার্য্যের ত্রুটি দেখাইয়া, তাহার নিন্দা করিয়া বৈদেশিকের প্রীতিভাজন হইতে লজ্জা বোধ হয় না। তাহাদিগের প্রভুর ফটোগ্রাফ্ মাথায়

করিয়া দাসীকে (পত্নীকে) দেখাইবার জন্য গৃহে লইয়া যাইবার অনুমতি ভিক্ষা করিতে ঘৃণা বোধ হয় না। তাহাদিগের—আমি তোমার গোলামের গোলাম, আমার চৌদ্দপুরুষ তোমার গোলাম—ইত্যাদি লজ্জাকর স্তুতি-বাক্যে প্রভুর মনতুষ্টি-বিধানে আত্ম-গ্লানি উপস্থিত হয় না।

আর কত বলিব ? এ মর্ম্মভেদী কাহিনী যে আর গাইতে পারি না ! এ আত্ম-গ্লানি-কর জাতীয় দুর্গতির কথা লেখনীতে আর যে লিখিতে পারি না ! এই সকল জাতীয় অগৌরবের ইতিহাস আর যে প্রচার করিতে পারি না ! বুক যে ফাটিয়া যাইতেছে ! চক্ষু দিয়া যে রক্ত বাহির হইতেছে ! কাহার নিন্দা করিতেছি ? যাহার নিন্দা করিতেছি, সে যে আমার প্রাণ ! আমি যে পৃথিবীতে আর কিছু জানি না ! ভারতবাসি ! তুমিই যে আমার জীবন-সর্ব্বস্ব ! আমার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ —সবই যে তুমি। তবে কেন নিন্দা করিতেছি ? ভাই ! প্রাণাধিক ! তোমার নিন্দা সহিতে পারি না বলিয়াই তোমার দোষ দেখাইয়া দিতেছি। ক্ষমা কর। আমার তিরস্কারের উদ্দেশ্য বুঝিয়া আত্মদোষ সংশোধন কর। তুমি যে চিরদিন বৈদেশিকের চরণে দলিত হইবে, ইহা আমি দেখিতে পারিব না, এই জন্য ক্ষত-স্থান দেখাইয়া দিতেছি। ক্ষত স্থান বাড়িতে দিও না। সঞ্জীবনী ঔষধ প্রয়োগ কর। আবার জাতীয় জীবন পাইবে ! এখন আমোদের সময় নয়। উন্মত্তের ন্যায় নির্লক্ষ্য হাসি হাসিয়া দিন কাটাইও না। জাতীয় তরী ডুবু ডুবু হইয়াছে, এখন নৃত্য রাখ। একার কাজ নয়। আইস—আমরা বিংশতি কোটী মিলে জল ছেঁচিতে আরম্ভ করি। যে জল ঢুকিয়াছে, কত দিনে তাহা ছেঁচিয়া উঠিতে পারিব, বলিতে পারি না ; তবে ‘কালস্য কুটিলা গতিঃ।’ কে বলিতে পারে যে, আমরা একদিন ছেঁচিয়া উঠিতে পারিব না ? ঐ দেখ, প্রাচ্যে নগণ্য জাপান ঠেলিয়া উঠিতেছে ! ঐ দেখ প্রতীচ্যে পতিত ইতালী আবার উঠিয়াছে ! তবে কেন ভয় ! মিলে সব ভাই এক মনে এক প্রাণে সাধি স্বদেশের কাঁজ ! ভাই ভাই গানে এস মাতাই ভারত !

হিন্দুসমাজসংস্কার।

প্রথম প্রস্তাব।

'হিন্দু সমাজ'—এই শব্দ শুনিলে মনে নানা প্রকার ভাবের আবির্ভাব হয়। আত্মাভিমান, আনন্দ, শোক, দুঃখ ও বিষাদ যুগপৎ উপস্থিত হইয়া মনকে বিক্ষোভিত করে। যখন 'কি ছিলাম' এই ভাব মনে উদিত হয়, তখন আত্মাভিমান ও তজ্জনিত আনন্দোচ্ছ্বাসে মন আপ্লুত হয়। কিন্তু পরক্ষণেই 'কি হইয়াছি' যখন এই ভাব মনে উদিত হয়, তখনই প্রতিক্রিয়াবলে শোক, দুঃখ ও বিষাদ আসিয়া মনতটিনীর সে উচ্ছ্বাস শুষ্ক করিয়া ফেলে। কেন ভাবি, কেন কাঁদি, জানি না। কারণ যাহার জন্য ভাবি—সে ত তার জন্য ভাবে না। তবে কেন নির্জ্জনে বসিয়া এ অশ্রুপাত? তবে কেন রজনীর অন্ধকারে শয্যা ছাড়িয়া করতলে কপোল রাখিয়া শুষ্ক ভাবনায় দেহ মন জর্জ্জরিত করি? আমি কে? এই প্রকাণ্ড হিন্দু সমাজের একটি পরমাণু মাত্র। আমি ভাবিয়া কি করিতে পারি? নগণ্য আমি—আমার কথাই বা অগণ্য হিন্দুসন্তান কেন শুনিবে? সব বুঝি, কিন্তু অবোধ মন, বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না—তাই আজ ভ্রাতৃবৃন্দসকাশে হৃদয়ের ক্রন্দন লিপিবদ্ধ করিয়া জানাইতে উদ্যত হইলাম।

কেন আমরা আজ এমন হইলাম? কেন আজ এই অসংখ্য কোটী মানব কতিপয়মাত্র শ্বেত পুরুষের ক্রীড়নকস্বরূপ হইয়া রহিয়াছি? যে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ একদিন অসংখ্য মানবকে সুশীতল ছায়াদানে স্নিগ্ধ করিত, আজ কেন সে গলিতপত্র ও শুষ্কদেহ? যে মহীরুহ দিগন্তপ্রসারী শাখাবাহু দ্বারা একদিন সমস্ত জগৎকে আলিঙ্গন করিত, আজ সেই মহীরুহ এরূপ বিশাখ ও শুষ্ক কেন? সে জগদ্ব্যাপী প্রেমভাব আজ আকুঞ্চিত কেন? কবে ইহার এ দশা ঘটিল? কে করিল? কোন্ পাপে ঘটিল?

অথবা জন্ম, পরিপাক ও মৃত্যু—জড় ও অজড় সকলেরই ধর্ম্ম। জন্মের পর পরিপাক, পরিপাকের পর মৃত্যু—আবার মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্ম, আবার পরিপাক, আবার মৃত্যু—জগতের চরম পরিস্ফুটনের জন্য এরূপ পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজনীয়। হিন্দুসমাজের জন্ম, পরিপাক ও মৃত্যু হইয়া গিয়াছে—আবার সেই চিতাভস্মের মধ্য হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল দেখা যাইতেছে।

এ সময় স্থির থাকা যায় না। স্থির থাকাও উচিত নহে। আবার আমাদিগকে উঠিতে হইবে। আবার আমাদিগকে একটী প্রকাণ্ড জাতিরূপে পরিণত হইতে হইবে। আমরা কি ছিলাম, কি উপায়ে আমরা তত বড় হইয়াছিলাম, কি কি কারণেই বা আমাদের পতন হইয়াছিল, সেই গুলি তন্ন তন্ন করিয়া ভাবিয়া আবার কি উপায়ে আমরা উঠিতে পারি, তাহার চেষ্টা দেখিতে হইবে। এস ভাই! আমরা প্রত্যেকেই ভাবি—প্রত্যেকে ভাবিয়া পরস্পরের চিন্তা পরস্পরকে জানাই এবং পরস্পর-বিদ্বেষ-শূন্য হইয়া পরস্পরের নিকট হইতে সাহায্য লই। আমি ক্ষুদ্র হইতে পারি, কিন্তু তাই বলিয়া আমার কথা শুনিবে না কেন? সত্য বলিবার অধিকার সকলেরই আছে। আমার কথায় সত্য না থাকে পরিত্যাগ করিও। কিন্তু পরিত্যাগ করার পূর্ব্বে একবার শুন। আমরা রাজনৈতিক অধীনতার জন্য দুঃখ করিয়া থাকি, এবং অপহৃত স্বাধীনতা অপহারকের নিকট ভিক্ষা করিয়া চাহিয়া লইতে সর্ব্বদা উন্মুখ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভিক্ষালব্ধ ধনে কে কবে ধনী হইয়াছে? আর অপহৃতসর্ব্বস্ব ব্যক্তির ক্রন্দনে অপহারকের হৃদয় কবে বিগলিত হইয়াছে? যাহারা আত্মাবলম্বন জানে না, স্বাধীনতা পাইলেই বা তাহারা সে অমূল্য ধন রাখিবে কিরূপে? একজন অপহারক ছাড়িয়া দিলে যে আর একজন আসিয়া ধরিবে না কে বলিতে পারে? আমরা বৈদেশিকের নিকট এখানে ভিক্ষা চাহিয়া ক্ষান্ত নহি, আগ্রহ ভিক্ষা করিবার জন্য জাতীয় ভিক্ষার ঝুলি প্রস্তুত করিয়া বৈদেশিকের নিজ দেশে গিয়াও দ্বারে দ্বারে অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে লজ্জিত নহি। কিন্তু ভিক্ষুকের আদর কুত্রাপি

নাই। স্বদেশে বিদেশে ভিক্ষুক সর্ব্বত্র ঘৃণার পাত্র। God helps them who help themselves, যাঁহারা আত্মাবলম্বী, ঈশ্বর কেবল তাঁহাদিগকেই সাহায্য করিয়া থাকেন। যিনি পরসাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া আপনার যত্নে আপনি বড় হইতে চেষ্টা করেন, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে বড় হইতে পারেন। Papa I am bigger than you—বাবা আমি তোমা অপেক্ষা মাথায় উঁচু—পিতৃ-স্কন্ধে চড়িয়া বালক এই কথা বলিলেই যে সে বড় হইল তাহা নহে। ইংরাজ যদি আদর করিয়া আমায় রাজ-সিংহাসনে বসান, আমি কখনই রাজ-সিংহাসনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিব না। যে বিনা শ্রমে, বিনা বুদ্ধিবলে অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর হয়, সে কখন সে সম্পত্তি বহুদিন রাখিতে পারে না। আমরা বহু যত্নে অর্জ্জিত ভারত সাম্রাজ্য রাখিতে পারিলাম না—কারণ আমরা বিনা পরিশ্রমে ইহা হাতে পাইয়াছিলাম। যে অনন্ত সংঘর্ষের বলে পূর্ব্বপুরুষগণ এই দেবদুর্লভ সাম্রাজ্য অধিগত করিয়াছিলেন, সে সংঘর্ষকাল অতীত হইলে, আমরা নিদ্রালু হইয়া উঠিলাম। কতিপয়মাত্র ক্ষত্রিয়ের হস্তে এই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া আমরা জাতিসাধারণ নিদ্রা যাইতে লাগিলাম। শ্রম-বিভাগের জন্য যে জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল—ক্রমে তাহাই আমাদিগের পতনের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এত বড় সাম্রাজ্যরক্ষা অঙ্গুলিমাত্রে গণনীয় কতিপয়মাত্র ক্ষত্রিয়ে কয়দিন করিয়া উঠিতে পারে? জার্ম্মাণীরও এই কারণে অধঃপতন হইয়াছিল। জার্ম্মাণী সে ভ্রম বুঝিতে পারিয়া এক্ষণে জাতিসাধারণ সাম্রাজ্যরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাই সে দিন ফ্র্যাঙ্কো-প্রসীয় সমরে বীরভূমি ফ্রান্সকেও পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পাণিপথ সমরের পূর্ব্বে যদি আমরা সে ভ্রম বুঝিতে পারিতাম, অথবা সে দিন পলাশীযুদ্ধের পূর্ব্বেও যদি জাতিসাধারণ নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে আজ আমাদের দুর্দ্দশা ঘটিত না। 'গতস্য সূচনা নাস্তি'—যাহা অতীত হইয়াছে তাহার জন্য আর দুঃখ করা বৃথা। এক্ষণে কিরূপে আমাদের ভবিষ্য সঞ্জীবনকার্য্য সিদ্ধ হইতে পারিবে—আমরা সেই সম্বন্ধে কেবল দুই চারিটী কথা বলিব।

পরাধীন জাতির রাজনৈতিক অস্তিত্ব নাই। আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন—অরণ্যে রোদনমাত্র। তাহার জন্য সমস্ত জাতীয় শক্তি বিনষ্ট করা উচিত নহে। রোদনের ফল একেবারে নাই—একথা আমরা বলি না। তবে যাহারা কেবল রোদনের উপর জাতীয় উন্নতি রাখিতে চাহে—তাহাদিগকে বাতুল বলি। রোদন জাতিসাধারণ-সংক্রামক হইলে বিশ্বজনীন সহানুভূতি উৎপন্ন হয় সত্য, কিন্তু নিরন্তর ক্রন্দনে জাতীয় শক্তির ক্ষয় হয়। কুকুর আমরা ঘৃণা করি কেন? —কুকুর সকল বিষয়েই প্রভুর অনুগ্রহ-ভিখারী বলিয়া। বৈদেশিকের অনুগ্রহ-ভিখারী বলিয়া আমরাও জগতের ঘৃণার পাত্র। তবে কেন আর আবেদন করিয়া মরি? ইলবর্ট বিলে দেখা গিয়াছে যে আমাদের কপালগুণে সকলই সমান। লঙ্কায় যে আসে সেই রাক্ষস। বাস্তবিক-কই শ্বেতপুরুষগণের সহিত আমাদের খাদ্য খাদকের সম্বন্ধ। তাঁহারা যে আত্মস্বার্থ নষ্ট করিয়া আমাদের উন্নতি সাধন করিবেন—সে আশা বৃথা। বৃথা আশা করিয়া আশাভঙ্গ-জনিত মনস্তাপ আর কেন সহ্য করি? আমাদের কপাল যখন ভাঙ্গিয়াছে—তখন আবেদন করা, চীৎকার করা কিছুদিন বন্ধ করিলেই ভাল হয়।

আমরা যাহাতে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক আসনে স্বাধীনভাবে বসিবার যোগ্য হই, আইস আমরা এক্ষণে তাহার চেষ্টা করি। সামাজিক অধঃপতনেব ফল—বাজনৈতিক অধঃপতন। কারণ বর্ত্তমান থাকিতে কার্য্যের নাশ হইবে কিরূপে? সামাজিক অধঃপতন পূরামাত্রায় থাকিতে রাজনৈতিক অভ্যুদয় হইবে কিরূপে? অতএব আইস—আমরা সামাজিক সংস্কারে প্রবৃত্ত হই। সামাজিক উন্নতি হইলে রাজনৈতিক উন্নতি আপনিই আসিবে। হিন্দুসমাজ একদিন প্রচণ্ড স্রোতস্বিনী ছিল। উন্নতির স্রোত ইহাতে প্রচণ্ডবেগে বহিয়াছিল। কিন্তু ভাগ্যদোষে সে স্রোত এখন একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আবার স্রোত বহাইতে হইবে। মরা নদীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া আবার তাহাকে প্রবল স্রোতস্বিনীতে পরিণত করিতে হইবে। স্রোত বন্ধ হওয়ায় যে সকল শৈবালদাম জন্মিয়াছে তাহা উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। শৈবালদাম ও

পঙ্করাশি উঠাইয়া ফেলিলেই নদী আবার সাগরাভিমুখিনী হইবে—আবার তটবর্ত্তী প্রদেশসকলে জীবন ও সমৃদ্ধি বিস্তার করিবে। ইহা সম্পূর্ণরূপে নিজায়ত্ত। যাহা নিজায়ত্ত তাহা ফেলিয়া, যাহা পরায়ত্ত, তাহার জন্ত চীৎকার করিয়া মরি কেন?

রাজনৈতিক উন্নতির ভিত্তিভূমি সমাজ-সংস্কার। ভারতের অধঃপতনের মূল সামাজিক বৈষম্য ও স্ত্রীজাতির অবনতি। সামাজিক বৈষম্যে পঞ্চবিংশকোটী মানব পরস্পর-মমতাশূন্য। কি উপায়ে এই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন মমতাশূন্য দূর-বিক্ষিপ্ত মানবপরমাণুপুঞ্জ আবার ঘনীভূত হইতে পারে, কিরূপে আবার স্ত্রীজাতি অন্দরের অন্ধতমসাচ্ছন্ন প্রদেশ হইতে বাহির হইয়া প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিয়া শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে—কিরূপে আবার তাহারা অপহৃত স্বত্বসকল পুনরধিকার করিতে পারে—কিরূপে ভারতের নারীজাতি ও জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যাজ্যোতিঃ বিকীরিত হইতে পারে—কিরূপে দৃঢ়বদ্ধ প্রাদেশিক ভাবসকল জাতীয় ভাবে পরিণত হইতে পারে—আমাদের এক্ষণে সেইসকল আন্দোলনেই সমস্ত জাতীয় শক্তি ব্যয়িত করা কর্ত্তব্য। হিন্দুসমাজ এই আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধনে নিতান্ত উদাসীন। শিক্ষিত সমাজ যাহাতে আত্মোৎসর্গ আছে এরূপ কার্য্যে সহসা হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নহেন। বক্তৃতা করিতে বা আবেদন করিতে বিশেষ 'আত্মোৎসর্গ' নাই বলিয়া তাঁহারা সেই বিষয়েই মনোনিবেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? এক্ষণে কার্য্য চাই! যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিব, তাহা কার্য্যে পরিণত করা চাই। শুদ্ধ কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে জাতীয় উন্নতি হইবে না। আমাদিগকে অনেক সংস্কার সাধন করিতে হইবে। একটী একটী করিয়া ধরিলে কতদিনে সম্পন্ন হইবে জানি না। তথাপি একটী একটী করিয়া সাধন করিয়া উঠিতে পারিলেও ভবিষ্যতে সর্ব্বাঙ্গীন সংস্কার হইবে বলিয়া আশা হয়। আমরা ভারতের জাতীয় অনবতির মূলীভূত যাবতীয় সমাজদূষণের ক্রমে ক্রমে উল্লেখ করিব। অদ্য কেবল বিধবাবিবাহের উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব। মহাত্মা বিদ্যাসাগর

মহাশয় বহুদিন হইল এই অত্যাবশ্যকীয় সংস্কারের সূচনা করিয়াছেন। সূচনা হওয়ার পর দুই একটী করিয়া মধ্যে মধ্যে বিধবাবিবাহ হইতেছে বটে—কিন্তু হিন্দুসমাজমধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রবেশ করিয়াছে একথা বলিতে পারি না। কারণ যাঁহারা বিধবা-বিবাহ করিতেছেন হিন্দুসমাজ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন। তাঁহাদিগের কষ্টের সীমা নাই। তাঁহারা আত্মোৎসর্গের জলন্ত দৃষ্টান্ত। উৎপীড়িত ও অবহেলিত হইয়াও তাঁহারা কর্ত্তব্যের অনুরোধে অম্লানবদনে সমস্ত সহিতেছেন। যাঁহারা সুশিক্ষিত বলিয়া আত্মপরিচয় দেন—তাঁহারাও প্রকাশ্যরূপে ইহাঁদিগের সহিত সামাজিক ব্যবহারে মিশেন না। বিধবাবিবাহের রজনীতে ভোজমন্দিরে মধুলোলুপ ভ্রমরবৃন্দের ন্যায় সন্দেশলোলুপ অসংখ্য যুবাপুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পরদিন আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। আজ ২৫।২৬ বৎসর এই রূপেই চলিতেছে—ইহার কোন পরিবর্ত্তন হইল না। হিন্দুসমাজ লুকাচুরিতে দক্ষ, লুকাচুরিতে হিন্দুসমাজের কোন আপত্তি নাই, লুকাচুরি করিয়া তুমি যাহা কর, হিন্দুসমাজের তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু প্রকাশ্যে করিলে হিন্দুসমাজ তোমাকে পরিত্যাগ করিবে। তুমি মদ খাও, গরু খাও, উইলসনের হোটেলের খানা খাও, লুকাইয়া যাহা ইচ্ছা কর—তোমার জাতি যাইবে না, কিন্তু তুমি কর্ত্তব্যের অনুরোধে প্রকাশ্যরূপে কোন অপ্রচলিত শাস্ত্রসম্মত কার্য্য কর—তুমি জাতিচ্যুত হইবে।

হিন্দুসমাজের ইহা অপেক্ষা অধিকতর কলঙ্কের কথা আর কি হইতে পারে? বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত, ইহা এক্ষণে সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। ইহা যে যুক্তিসঙ্গত, সে বিষয়েও কাহাকে কোন আপত্তি তুলিতে দেখি না। ইহার বিরুদ্ধে একমাত্র আপত্তি এই যে, ইহা ব্যবহার-বিরুদ্ধ। হিন্দুসমাজে ব্যবহার-বিরুদ্ধ কত কাজ চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু বিধবাবিবাহ অদ্যাপি হিন্দুসমাজে চলিত হইতেছে না। ইহার কারণ কি? ইহার দুইটী গূঢ় কারণ আছে। একটী কারণ এই যে হিন্দুসমাজ স্ত্রী জাতিকে খাদ্যসামগ্রীস্বরূপ মনে করেন।

অন্যের পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট খাদ্য যেমন ঘৃণা, ইহাঁরা বিধবাগণকে সেই ভাবে দেখেন। কিন্তু ইহা বিজ্ঞান-সম্মত নহে। সবিশেষ খুলিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ বালবিধবা সম্বন্ধে এ কথার উল্লেখই হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদিগের মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে স্ত্রীলোকে পতিপরায়ণা হইবে না। সকলেই বর্ত্তমান পতির মৃত্যুর পর পত্যন্তর প্রাপ্তির আশায় তাঁহার প্রতি উদাসীন হইবে, এবং কথন কথন তাঁহার প্রাণবিনাশেরও চেষ্টা করিবে। ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত সংস্কার আর নাই। লোকে উপস্থিত অবহেলা করিয়া কথন অনুপস্থিতের আশায় দিনযাপন করে না। ইহা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্যও ঘটে বটে—কিন্তু তাহা নিয়ম নহে, ব্যভিচার। এই ভ্রান্ত সংস্কার যে শুদ্ধ অশিক্ষিত সমাজে বদ্ধমূল আছে এরূপ নহে— সুশিক্ষিত-মণ্ডলীর মধ্যেও কোন কোন স্থলে এরূপ সংস্কার দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহাদের কিছুতে এ সংস্কার অপনীত হইবে না—আমাদিগের তাঁহাদিগের সহিত বিতণ্ডা করিয়া সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে যাঁহারা বিধবাবিবাহকে শাস্ত্রসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিশ্বাস করেন—আমরা তাঁহাদিগকে লইয়া একটি সমিতি সংগঠিত করিতে চাহি। এই সমিতিকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। বিধবাবিবাহ-প্রচারের জন্য স্বতঃ ও পরতঃ অবিরাম চেষ্টা করিতে হইবে। যাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী থাকিতে চান—তাঁহাদিগের মন ফিরাইবার চেষ্টা করা সমিতির লক্ষ্য হইবে না। সমিতি কেবল বিবাহার্থিনী বিধবাগণের বিবাহ দিয়া দিবেন; এবং যাহারা বিধবাবিবাহ করিবেন; তাঁহাদিগের সহিত সামাজিক সংস্রব পরিত্যাগ করিবেন না, এরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইবেন। যাঁহারা এই সমিতির সভ্য হইতে চাহেন, তাঁহারা আপনাদিগের নাম ধাম লিখিয়া আর্য্যদর্শন সম্পাদকের নিকট * * * পত্র লিখিবেন। সভ্য-সংখ্যা অধিক হইলে সভার নিয়মাবলী প্রচারিত হইবে। সভ্যসংখ্যা পূর্ণ হইলে পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই সভার সভাপতি করিতে অনুরোধ করা হইবে। যিনি বিধবাবিবাহ প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—তিনি জীবিত থাকিতে

সভাপতির আসন আর কেহ গ্রহণ করিতে পারেন না। সহযোগী সম্পাদক-মণ্ডলীকে এ বিষয়ে আন্দোলন করিবার জন্য আমরা অনুরোধ করি, এবং তাঁহাদিগের মতামত জানিবার জন্য আমরা ইচ্ছা করি। এ বিষয়ে আরও বক্তব্য রহিল, আমরা পরে বলিব। এই সমিতি যে শুদ্ধ বিধবাবিবাহ লইয়াই থাকিবেন তাহা নহে। একে একে সমস্ত সামাজিক সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিবেন। ইহার লক্ষ্য পরে বিবৃত করা যাইবে। আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে নলডাঙ্গাধিপতি রাজা প্রমথভূষণ দেব রায় বিধবাবিবাহ প্রচারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি যে শুদ্ধ অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেছেন, এরূপ নহে। স্বয়ং বিধবাবিবাহকারীগণের সহিত সমসমাজিকতা করিতেছেন*। সম্ভ্রান্তশ্রেণী তাঁহার উদার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিলে বিধবাবিবাহ প্রচার হইতে কয়দিন লাগিবে? ৺ রাজা রাধাকান্ত দেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিকূলতা না করিলে এতদিন বিধবাবিবাহ কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত গৃহে প্রচলিত হইয়া যাইত। যে রাজা রাধাকান্ত দেব বিধবাবিবাহ প্রচলিত না হওযার জন্য এত চেষ্টা করিয়াছিলেন—কালের অদ্ভুত গতিতে সেই গৃহেই বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইল। কালের স্রোত রোধ করা মনুষ্যের অসাধ্য। সম্ভ্রান্তশ্রেণী এ কার্য্যে যোগ না দিলে ইহা প্রচলিত হইতে অনেক বিলম্ব হইবে। সেই জন্য আমরা সানুনয়ে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা রাজা প্রমথভূষণের ন্যায় এই কার্য্যে যোগ দিয়া আপনাদের পদের গৌরব বর্দ্ধন করুন। আমরা তাঁহাদিগের সহকারিতা-বিরহিত হইয়া সহজে সিদ্ধকাম হইতে পারি না। কারণ সামাজিক শক্তি অনেক পরিমাণে

---

* আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে তিনি ইহাদিগের সহিত সামাজিক মিশ্রণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার রাজা উপাধি ফেরৎ দেওয়া উচিত। কারণ তিনি বিধবাবিবাহের প্রচারক বলিয়া এই উপাধি পাইয়াছেন। আশা করি, এ সংবাদ অমূলক।

তাহাদিগের হস্তে রহিয়াছে। অর্থবলে অনেক কার্য্য সম্পন্ন হয়। আমাদের টোলের পণ্ডিতমণ্ডলীও অনেক পরিমাণে সম্ভ্রান্তশ্রেণীর মুখাপেক্ষী। সম্ভ্রান্তশ্রেণী ইহাতে যোগ দিলে—পণ্ডিতমণ্ডলী আর প্রতিকূলতা করিবেন না। অনেক বিখ্যাতনামা পণ্ডিতের সঙ্গে এ বিষয়ে আমাদের কথা হইয়াছে—তাঁহারা কেবল বিদায় বন্ধ হওয়ার ভয়ে ইহাতে যোগ দিতে সাহস করেন নাই। সম্ভ্রান্তশ্রেণী যোগ দিলে তাঁহাদের আর সে আপত্তি থাকিবে না। লক্ষ্মী ও সরস্বতী মিলিত হইলে কোন্ কাজ অসিদ্ধ থাকে? ভারতের ভাগ্যে তাহা কি ঘটিবে না? কে বলিতে পারে ঘটিবে না?

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি হিন্দুসমাজের সর্ব্বাগ্রকর্ত্তব্য সংস্কার বিধবা-বিবাহের পুনঃপ্রচলন। পুনঃপ্রচলন বলিলাম, তাহার কারণ এই যে, শাস্ত্রের ব্যবস্থায় ও রামায়ণ মহাভারতাদি ঐতিহাসিক মহাকাব্যে বিধবাবিবাহ পূর্ব্বপ্রচলিত থাকার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেদীপ্যমান আছে। যাহা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল ও শাস্ত্রানুমোদিত, তাহার পুনঃপ্রচলন দুরূহ কার্য্য নহে। আমাদের দুরূহ বোধ হয়, তাহার কারণ আমাদের কার্য্য-করী শক্তি আজও উৎপন্ন হয় নাই। ইহার প্রচলন আরও দুরূহ নহে এই জন্য যে, বৈষ্ণব-সমাজে ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ইহার বহুল প্রচার আছে। আমরা এতদিন নিদ্রিত ছিলাম, নিদ্রাভঙ্গের পর উঠিয়া কেবল ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছি মাত্র। এখনও আমাদের হস্তপদাদি শিথিল হইয়া রহিয়াছে। কার্য্যের নাম শুনিলে এখনও আমাদের ভয় হয়। লিখিয়া বা বক্তৃতা করিয়া যদি অব্যাহতি পাই, তাহা হইলে আমরা সহজে কার্য্যে হাত দিতে চাই না। আমাদের ইচ্ছা যে যতদিন সন্তরণ ভাল করিয়া না শিখিব, ততদিন আর কার্য্যসাগরে নামিব না। কিন্তু অবোধ লোক! তোমার এ দুরাকাঙ্ক্ষা কেন? জলে না নামিয়াই সাঁতার শিখিবার দুরাশা

কেন? তুমি জাতীয়তা লইয়া মুখে আকাশ পাতাল আন্দোলন করিয়া বেড়াইতেছ, কিন্তু এখনও কার্য্যসাগরে পা দিতে সাহস করিতেছ না কেন? শুদ্ধ মৌখিক আন্দোলনে কোন্ দেশ কবে বড় হইয়াছে? যদি জাতীয় স্নায়ু দৃঢ় করিতে চাও, তবে কার্য্য করিতে হইবে। রাজনীতি-ক্ষেত্রে আমাদের কার্য্য করিবার অধিকার নাই—কেবল চীৎকার বা রোদন করিবার অধিকার আছে। কিন্তু নিষ্ফল আরণ্য রোদনে আর অমূল্য জাতীয় জীবন নষ্ট করা সঙ্গত হইতেছেনা। কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া জাতীয় শক্তি ধ্বংস করা কিছুতেই উচিত বোধ হইতেছে না। যখন আমরা পঞ্চবিংশতি কোটী লোক একমনে এক-প্রাণে কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে শিখিব, তখন যাহা আজ আমরা অনুগ্রহ বলিয়া চাহিতেছি, তাহা না চাহিলেও অধিকার-স্বরূপ পাইব।

রাজনৈতিক মঞ্চে উঠিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে সমাজের জীর্ণসংস্কার করিয়া লইতে হইবেক। হিন্দুসমাজ-সৌধ বহুদিন সংস্কারাভাবে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সেই জীর্ণসংস্কার করিয়া লইলে, আবার ইহা কত-কাল চলিবে। যদি জীর্ণসংস্কার করিতে অসম্মত হই, তাহা হইলে ইহার পতন অনিবার্য্য। সমাজসংস্কার না করিলেই সমাজবিপ্লব উপস্থিত হয়। প্রবল স্রোতস্বিনীও কালে পঙ্করাশিতে ও দামদলে জড়িত হইয়া পড়ে। দামদল পরিষ্কার ও পঙ্কোদ্ধার করিয়া দিলে, সেই নদী আবার পূর্ব্বাবস্থা ধারণ করে। যদি তাহা না কর, সেই প্রবল স্রোতস্বিনী কালে মরা নদীতে পরিণত হইবে। প্রকাণ্ড সৌধ-রাজির মধ্যে মধ্যে জীর্ণসংস্কার করিলে তাহা অনন্তকালস্থায়িনী হইতে পারে। কিন্তু জীর্ণসংস্কার না করিলে তাহা অধিক দিন থাকিতে পারে না। হিন্দুসমাজেরও ঠিক সেই অবস্থা।

কোন বিজ্ঞ সম্পাদক লিখিয়াছেন যে সমাজের অধিকাংশ লোকের অভিমত না লইয়া কোন সমাজসংস্কার হইতে পারে না। ভারতের পঞ্চবিংশতি কোটী অধিবাসীর মধ্যে অন্ততঃ ত্রয়োদশ কোটীর অভিমত না হইলে তুমি যদি সমাজসংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত না হও, তাহা হইলে তুমি অসামাজিক লোক, সমাজ তোমার মত লোককে অনায়াসে পরিত্যাগ

করিতে প্রস্তুত আছে। তিনি ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, অধিকাংশ সভ্যের মত না হইলে কোন বিধি তথায় ব্যবস্থাপিত হয় না। তিনি দেখাইয়াছেন যে, মৃতাপত্নীর ভগিনীকে বিবাহ করার পদ্ধতি অবতারিত করিবার জন্য অনেক বিজ্ঞ সভ্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সংখ্যা বিপক্ষগণের সংখ্যা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন থাকায় তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইতেছে না। এ তুলনা সঙ্গত হয় নাই। কারণ পার্লেমেণ্টের সভ্য-সংখ্যা ছয় সাত শতের অধিক নহে। সেই ছয় সাত শত লোক সমস্ত ব্রিটনবাসীর প্রতিনিধি হইলেও, সেই ছয় সাত শত লোকের মতের সহিত যে ব্রিটনের অধিবাসিসাধারণের মতসাম্য আছে, তাহা কখনই নহে। প্রতি লক্ষে দুই একজন করিয়া প্রতিনিধি। সেই দুই এক জন লোক যে এক লক্ষ লোকের মনের মত কথা বলিতে পারিবে, তাহা কখনই সম্ভব নহে। সেই এক লক্ষ লোকের মনস্তুষ্টি বিধান করিয়া কথা বলা দেবতারও অসাধ্য। তাহার মধ্যে কত বিভিন্নমতাবলম্বী লোক আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই জন্য বলিতেছি যে, জনসাধারণের মত লইয়া ইংলণ্ডেরও কার্য্য চলিতে পারে না। জনসাধারণ যাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে, তাহাদিগের মতামতেই সমাজ চলিয়া থাকে। জনসাধারণ তাঁহাদিগের মত শিরোধার্য্য করিয়া লয় বলিয়াই, সমাজ চলিতেছে—নতুবা এতদিনে রসাতলে যাইত।

আমাদের দেশে কোন কালেই দেশব্যাপী প্রতিনিধিপ্রণালী প্রচলিত ছিল না। তবে যে সকল ঋষি নিজ গুণগরিমায় দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতেন, লোকে তাঁহাদিগের মত শিরোধার্য্য করিত। সমাজ তাহাদিগের মতামতেই চলিত। সেই জন্যই শাস্ত্রের এত আদর। শাস্ত্র জ্ঞানী জনের উক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। হিন্দুসমাজ আজও কিয়ৎ পরিমাণে সেই শাস্ত্র দ্বারা পরিচালিত।

এই শাস্ত্র আমাদের দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধিস্বরূপ পরিগৃহীত হইত। তখন জ্ঞানিগণ জনসাধারণ দ্বারা পরিচালিত হইতেন না, জনসাধারণ জ্ঞানিগণ দ্বারা পরিচালিত হইত। বর্ত্তমান-

সময়ে পণ্ডিতমণ্ডলী বিদায়ের জন্য সাধারণের বা ব্যক্তি-বিশেষের তুষ্টি-কর শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সে ব্যাখায় শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। প্রাচীন শাস্ত্রকর্ত্তারা পরমুখনিরপেক্ষ নিষ্কাম যোগী ছিলেন। তাঁহারা কাহারও মুখের দিকে তাকাইয়া শাস্ত্র লিখিতেন না। যাহা প্রকৃত লোকহিতকর তাহাই ব্যবস্থা করিতেন।

সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় যে সংখ্যা-বাহুল্যের আধিপত্য সংস্থাপন করিতে চান, তাহাতে শাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করা হইবে। তাহাতে জ্ঞানের অবমাননা ও অজ্ঞানের পূজা আরম্ভ হইবে। জনসাধারণের রীতনীতি বা অভিমত যে সমাজের আদর্শ হয়, সে সমাজের অধঃ-পতন অনিবার্য্য। দেশাচার শাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করিলে যে বিষময় ফল হয়, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বর্ত্তমান। দেশাচারের মূল, নিরক্ষর জনসাধারণের খাম খেয়ালী; শাস্ত্রের মূল-যুক্তি, বিজ্ঞান ও ভূয়োদর্শন। সুতরাং আমরা দেশাচারকে আদর্শ করিয়া আর চলিতে চাহি না। পতিত জাতির তাহা আদর্শ হইতে পারে। কিন্তু উত্থানশীল নব্য ভারতের তাহা আদর্শ হইতে পারেনা। উত্থানশীল হিন্দুসমাজ যুক্তি-মূলক শাস্ত্রকে আদর্শ করিয়া উঠিবে। যে শাস্ত্র সদ্-যুক্তির উপর সন্ন্যস্ত তাহাই আমরা গ্রহণ করিব। অনক্ষর জনসাধারণ যে দিকে যাইতে বলে, আমরা সে দিকে যাইব না। কিন্তু মহাজন যে মার্গানুসরণ করিয়াছিলেন, সেই মার্গানুসারী হইব। কারণ "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"—মহাজন যে পথ অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই সুপথ, অন্য পথ কুপথ। সে পথে যাইলে নিশ্চয়ই বিপদ্ ঘটিবে।

মানসিক দুর্ব্বলতার সময় যখন পতিত জাতি বিপথগামিনী হইতে চায়, তখন যাঁহারা তাহাতে উৎসাহ দেন, তাঁহারা জাতীয় শত্রু। যাঁহারা বন্ধুভাবে সুপথ দেখাইয়া দেন, ও বিপথে যাইতে নিষেধ করেন—তাঁহারাই প্রকৃত বন্ধু। ঔষধ যেরূপ তিক্ত, অনেক সময় বন্ধুর উপদেশও সেইরূপ তিক্ত লাগে বটে, কিন্তু ঔষধের ন্যায় ইহা পরিণাম-হিত-কর। অধিক কি, অনেক সময় শত্রুর নিন্দাবাদও বন্ধুর স্তোত্রবাদ অপেক্ষা অধিকতর হিতকারী হইয়া দাঁড়ায়। কোন ব্রাহ্ম সংবাদপত্র হিন্দু-

সমাজের দোষোদ্ঘোষণ করায় কয়জন সংবাদপত্রের সম্পাদক তাহার উপর খড়্গাহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু দোষ দেখাইয়া দিলে যে চটিয়া উঠে, তাহার দোষ কখন সংশোধন হয় না।

হিন্দুসমাজের স্কন্ধে ব্রাহ্ম পত্রিকা যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা অমূলক নহে। হিন্দুসমাজ যখন তেজস্বী ছিলেন, যখন সত্যকে দেবতা-ভাবে পূজা করিতেন, যখন সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেন, তখন ইহাঁর ঔজ্জ্বল্যে জগৎ ঝলসিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ হিন্দুসমাজ পতিত, আজ হিন্দুসমাজে সে সত্যপ্রিয়তা নাই, সত্যের জন্য সে আত্মোৎসর্গ নাই,—তাই হিন্দুসমাজে এত কপটাচার প্রবেশ করিয়াছে। সত্য গিয়াছে, সত্যের আবরণ পড়িয়া আছে মাত্র। আত্মা গিয়াছে, দেহ পড়িয়া আছে মাত্র।

হিন্দুসমাজ এখন স্পষ্ট বলিয়া দেয় যে, তুমি যাহা কর না কেন, গোপনে করিও, তাহা হইলে আর তোমার কোন ভয় নাই। যদি তুমি সত্য বল, তোমায় জাতিচ্যুত করিব। আজ বিলাতফেরৎগণ এই জন্যই হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন। বিলাতযাত্রিগণ যে অপরাধে অপরাধী, আজ কাল সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশই প্রায় সেই অপ-রাধে অপরাধী। তবে একদলকে রাখিয়া আর একদলকে কেন পরি-ত্যাগ কর? সত্যের এত অনাদর কেন? উইলসনের হোটেলে খাইলে যদি সমাজচ্যুত না কর, তবে বিলাতের হোটেলে খাইলে জাতিচ্যুত কর কেন? একজন গোপন করে, আর একজন গোপন করিতে চায় না বলিয়া? একজনের অপরাধ যে, সে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য বিদেশে গিয়া গত্যন্তর নাই বলিয়া বৈদেশিকের অন্ন গ্রহণ করে, আর একজন গৃহের অন্ন থাকিতেও শুদ্ধ রুচিপরিবর্ত্তনের জন্য যবনান্ন গ্রহণ করে। যদি যবনান্ন গ্রহণ করা বাস্তবিকই দোষ হয়, তাহাহইলে কার দোষ গুরু-তর? একজনের লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইল, আর একজনের গুরুপাপে লঘুদণ্ড, এই দণ্ডের তারতম্য কেন? একজনের অপরাধ ইচ্ছাকৃত, অপ-রের অপরাধ কার্য্যবশতঃ। তবে লঘুপাপীর উপর অধিকতর নির্যাতন কেন? পূর্ব্বোল্লিখিত সম্পাদক লিখিয়াছেন যে, বিলাতফেরৎগণ সংখ্যায়

অতি অল্প, সুতরাং হিন্দুসমাজ তাঁহাদিগকে অনায়াসেই পরিত্যাগ করিতে পারেন'। এ যুক্তি 'তেজীয়ান্ ন দোষায়' বা Might is right এর যুক্তি। দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের নির্যাতন চিরপ্রসিদ্ধ। আমি প্রবল, তুমি হীনবল—তোমায় আমি প্রহার করিব, তাহাতে আবার যুক্তি কি? পাঁচজনের বাটী, চারিজনের ইচ্ছা হইল, পঞ্চম জনকে তাড়াইব, চারিজনে জোট বাঁধিয়া পঞ্চমজনকে তাড়াইলাম, তাহাতে আবার যুক্তির প্রয়োজন কি? এ কথা বলিলে নাচার। যাঁহারা যুক্তি-পথ ছাড়িনেন, তাঁহাদিগকে আঁটিবে কাহার সাধ্য? কিন্তু আপাততঃ 'জোর যার মুল্লুক তার' হইতে পারে—কিন্তু কালে যুক্তিই প্রবল থাকিবে। পাশব বলকে একদিন যুক্তির অধীন হইতেই হইবে। সুতরাং আমরা যাহা যুক্তিসিদ্ধ তাহাই বলিয়া যাইব। আজ তাহাতে জনসাধারণ কর্ণপাত করিতে না পারে, কাল কিম্বা পরশ্ব করিতেই হইবে।

মহাজনে বলিয়া গিয়াছেন—Union is strength.—একতাই প্রকৃত সামাজিক শক্তি। হিন্দুসমাজে একতা নাই বলিয়াই ইহা সামাজিক-শক্তি-শূন্য। হিন্দুসমাজ বলিলে ইহাতে ঘনীভূত এক-লক্ষ্য-সঞ্চালিত কোন শক্তিকেন্দ্র বুঝায় না। ইহা দ্বারা পরস্পর-মমতা-শূন্য, দূর-বিক্ষিপ্ত, নির্লক্ষ্য বা বিভিন্নলক্ষ্য অসংখ্য সম্প্রদায়ের সমষ্টি-মাত্র বুঝায়। যতদিন না আমরা হিন্দুসমাজকে একটী ঘনীভূত, একলক্ষ্য শক্তিকেন্দ্র করিয়া তুলিতে পারিতেছি, ততদিন আমাদিগের একটী রাজনৈতিক জাতিরূপে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নাই।

হিন্দুসমাজ যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিতে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে, এক্ষণে কিরূপে সেইগুলির ক্রমিক সমন্বয় হইতে পারে, আমাদিগকে তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই অতি কঠোর সাধনা। ইহার উপর যদি আমরা হিন্দুসমাজকে আরও অবান্তর ভাগে বিভক্ত করিতে থাকি, তাহা হইলে হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরীণ ক্ষত আর কখন শুকা-ইবে না। সামাজিক একতার সহিত রাজনৈতিক একতার এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যে একের অভাবে, আর একটী কখন পরিপুষ্ট হইতে

পারে না। যদি তোমার সহিত আমার সামাজিক সহানুভূতি না রহিল, তবে তোমার রাজনৈতিক উন্নতিতে আমার আনন্দ পূর্ণমাত্রায় হইবে কেন? যদি নিম্নজাতিসাধারণ উচ্চজাতির সহিত সহানুভূতি করিত, তাহা হইলে যবনেরা কখন ভারতে লব্ধপ্রবেশ হইতে পারিত না। উচ্চজাতি নিম্নজাতির প্রতি যেরূপ সামাজিক ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাতে উচ্চজাতির প্রতি নিম্নজাতির মমতা থাকিতে পারে না। এই জন্য তাহারা কোন প্রকার রাজনৈতিক আবর্ত্তনে কোন প্রকার ইচ্ছা প্রকাশ করে না। তাহারা জানে, রাজা যিনিই হউন না কেন, রাজপরিবর্ত্তনে তাহাদিগের অবস্থাপরিবর্ত্তনের কোনও আশা নাই। সুতরাং রাজপরিবর্ত্তনে তাহাদিগের কোনও স্বার্থ নাই। এদিকে উচ্চজাতি সংখ্যায় অতি হীনবল। নিম্নজাতি-নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহারা বহিশ্চর ও অন্তশ্চর শত্রু নিবারণে অক্ষম হইয়া পড়েন।

এরূপ স্থলে রাজনৈতিক উন্নতির প্রধান অন্তরায় জাতিবৈষম্য যাহাতে আর পরিবর্দ্ধিত না হয়, ররং ক্রমে ক্রমে কমিতে থাকে, আমাদিগকে প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। সামান্য সামান্য কারণে ব্যক্তিপুঞ্জকে সমাজচ্যুত করিয়া খণ্ডশঃ বিভক্ত হিন্দুসমাজকে আরও বিভক্ত করা আত্মঘাত ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব আমরা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই অনুরোধ করি, তাঁহারা আর সামান্য সামান্য কারণে লোককে জাতিচ্যুত করিয়া হিন্দুসমাজকে আরও হীনবল না করেন। যখন দেখিতেছি, ইউরোপ ও আমেরিকা—পার্থিব সভ্যতা-বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে, তখন স্বদেশের উন্নতি সাধনের জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় যাত্রা করা একান্ত আবশ্যক। কারণ তুলনায় সমালোচনা দ্বারা আত্মদোষ-পরিবর্জ্জন ও পরোৎকর্ষের অনুকরণ ব্যতীত কখন দ্রুত উন্নতি সাধন হয় না। যদি কোন দেশ জাতীয় কুসংস্কার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক জগতের উৎকর্ষরাশির অনুকরণে জাতীয় উৎকর্ষ বিধান করিতে পারে, তাহা হইলে সে দেশ অচিরকাল-মধ্যে স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইতে পারে। মনুষ্যজাতি আজ পর্য্যন্ত যত কিছু উন্নতি সাধন করিয়াছে, আমরা

বিনা পরিশ্রমে বা অল্প পরিশ্রমে স্বদেশে আনয়ন করিতে পারি। মধুকর যেমন নানা পুষ্প হইতে মধু আহরণ করিয়া মধুচক্র প্রস্তুত করে, আমরাও ইচ্ছা করিলে নানা দেশের রত্নরাজি আহরণ করিয়া স্বদেশের মুখ উজ্জল করিতে পারি। জাপানের দ্রুত উন্নতির মূল, এই পরোৎকর্ষের অনুকরণ। উন্নতিশীল জাপান দেখিতে দেখিতে ব্রিটনের সমকক্ষ হইয়া উঠিল। এদিকে প্রাচীন ভারত, প্রাচীন চীন—স্থিতিশীলতা-দোষে প্রায় পূর্ব্বাবস্থায় রহিয়া গেল। এখনও সময় আছে—এখনও আমরা স্থিতিশীলতা-দোষ পরিহার করিলে দেশের অনেক মঙ্গল সাধন করিতে পারি। জাপান যেমন প্রতি বৎসর দলে দলে যুবকবৃন্দকে ইউরোপ ও আমেরিকায় পাঠাইতেছে—আমরাও যদি প্রতি বৎসর সেইরূপ শিল্প, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান শিখিবার জন্য দলে দলে ভারতীয় যুবকমণ্ডলীকে ইউরোপ ও আমেরিকায় পাঠাইতে পারি, তাহাহইলে অল্প দিনের মধ্যে ভারতের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। যে যে গুণে ইউরোপ ও আমেরিকা জগৎকে পরাজিত করিয়াছে, উক্ত যুবকমণ্ডলী দ্বারা আমাদিগের দেশে সেই সকল গুণরাশি আনীত হইবে! উভয় দেশের উৎকর্ষ-তারতম্য এইরূপে ক্রমেই কমিতে থাকিবে। যখন এই জাতীয় সংমিশ্রণে এত মঙ্গল সাধিত হইবার সম্ভাবনা, তখন ইহার পথে কণ্টক রোপণ করা স্বদেশানুরাগী ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। ইউরোপ-প্রত্যাগত যুবকমণ্ডলীকে সমাজচ্যুত করিয়া ভবিষ্য বিলাতগমনের পথে বাধা দেওয়া উচিত নহে। যে কার্য্য ভাল বলিয়া জানি, যে তাহা করিবে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে পুনঃপ্রবেশ করিতে বলা উচিত নহে। মূর্খ লোকের ভয়ে যুক্তি ও শাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করা উচিত নহে। শাস্ত্রে জ্ঞানশিক্ষার জন্য দেশান্তরে গমন করা নিষিদ্ধ হয় নাই। বাণিজ্যব্যপদেশে অর্ণবযানে দেশ দেশান্তরে গমনের প্রথাও পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। তবে কেন আমরা স্থিতিশীলতার দাস হইয়া সমাজের শীর্ষভূত যুবকমণ্ডলীকে প্রত্যাখ্যাত করিয়া সমাজকে হীনবল করি? সময় আসিয়াছে—যখন উন্নতিশীল হিন্দুসমাজ ইচ্ছা করিলে দলবদ্ধ হইতে পারেন। আধিপত্য, ধন, সম্পত্তিতে তাঁহারা স্থিতিশীল হিন্দুসমাজ অপেক্ষা ন্যূন নহেন।

তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইলে স্থিতিশীল হিন্দুসমাজ অধিক দিন তাঁহাদিগকে চাপিয়া রাখিতে পারিবেন না। তাঁহারা দলবদ্ধ হইলে হিন্দুসমাজে সংস্কার ভিন্ন বিপ্লব উপস্থিত হইবে না। তাঁহারা দলবদ্ধ হইলে, তাঁহাদিগের দ্বারা সমাজের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। যে সকল শীর্ষভূত নব্যসম্প্রদায় প্রত্যাখ্যাত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া উন্নতিশীল দলকে হীনবল করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আবার সমাজভুক্ত করিয়া হিন্দু-সমাজ নিজ বল বৃদ্ধি ও ভারতের ভবিষ্য রাজনৈতিক একতার সূত্রপাত করিতে পারেন।

বিধবা-বিবাহ।

তৃতীয় প্রস্তাব।

'ভিন্নরুচির্হিলোকঃ'—যখন প্রায় সমস্ত শিক্ষিত সমাজ বিধবা-বিবাহের অনুকূলে ঘোরতর আন্দোলন তুলিয়াছেন, তখন কাহাকেও তাহার প্রতিকূলে আন্দোলন তুলিতে দেখিলে আমাদের মনে কালিদাসের এই উক্তি স্বতঃই উদিত হয়। বিধাতা যখন সকলকেই ভিন্নরুচিসম্পন্ন করিয়াছেন, তখন যে সকলেরই রুচি সমান হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। সহযোগিনী সাধারণী প্রাপ্তিস্তম্ভে বিধবাবিবাহকে, স্পষ্ট মন্দ না বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে এই কয়েকটী আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। (১) 'বিধবা-বিবাহ যখন অনেক দিন হইতে অপ্রচলিত রহিয়াছে, তখন সহসা এই প্রথার উচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। (২) পুরাকালে এই প্রথা ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল কি না, তাহা নিরূপণ করা দুরূহ। (৩) শাস্ত্রে যেরূপ লিখিত আছে, তাহাতে ইহাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া বোধ হয় না। (৪) দুই একটী মাত্র ঋষি এ বিষয়ে সম্মতি, যুক্তি ও বিধান দিয়া গিয়াছেন মাত্র। (৫) বৈধব্য পুরুষের দোষেই ঘটিয়া থাকে, সুতরাং বিধবা-বিবাহ দেওয়া অপেক্ষা পুরুষের দোষ সংশোধন করাই বৈধব্য-নিবারণের প্রধান

উপায়। (৬) ঈশ্বর-আরাধনা ব্যতীত দেবত্ব-প্রাপ্তি হয় না। সেই ঈশ্বর-আরাধনার প্রধান সহায় বৈরাগ্য। সেই জন্যই শাস্ত্রকারেরা বিধবার পক্ষে বৈরাগ্যমূলক ব্রহ্মচর্য্যের অতি কঠোর ব্রতমালা বিহিত করিয়া গিয়াছেন এবং সেই কারণেই আত্মসংযমকে বিধবাগণের সর্ব্ব-প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৭) বিধবার বয়-সের নির্ব্বাচন না করিয়া বিধবামাত্রকেই বিধাতার রাজ্যে স্বেচ্ছাচারে বাস করিতে সম্মতি দিলে, পরিণামে ধর্ম্ম ও আচারব্যবহারের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। (৮) পরিণতবয়স্ক বিধবাগণের বিবাহ দিলে ধর্ম্মবিভাগের কার্য্য চলিতে পারে না। (৯) আর ধান চালের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে লোকসংখ্যার আরও বৃদ্ধি করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

আমরা এক একটী করিয়া এই পূর্ব্ব পক্ষ কয়েকটীর মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব। (১) যাঁহা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা সহসা পরিবর্ত্তিত হয় না—এ সিদ্ধান্তের ব্যভিচার আমরা গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে অসংখ্য দেখিয়াছি। আজ অর্দ্ধ শতাব্দী মাত্র হইল, ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। ইহারই মধ্যে হিন্দুসমাজে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। সমস্ত হিন্দুসমাজ একেবারে ওতপ্রোত হইয়া গিয়াছে। পিতামহের আমলের সামাজিক অবস্থা হইতে বর্ত্ত-মান সামাজিক অবস্থা অনেক পরিমাণে বিভিন্ন। কোন্ পরিবর্ত্তনটী ভাল হইয়াছে তাহার বিচার এখানে করিব না। শুদ্ধ এই মাত্র দেখাইব যে সে হিন্দুসমাজ আর নাই। প্রত্যূষে উঠিয়া রজনীতে নিদ্রা যাওয়া পর্য্যন্ত একজন হিন্দু পূর্ব্বে যাহা করিতেন, তাহার একতৃতীয়াংশ করেন কি না সন্দেহ। যে সকল স্থিতিশীল নব্যসম্প্রদায়ের লোক এক্ষণে বিপরীত আন্দোলনের রোল তুলিয়াছেন, তাঁহারাও হিন্দু-সমাজকে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে লইয়া যাইতে চাহেন না। যে সকল পরিবর্ত্তন তাঁহাদিগের নিজের সুবিধা-জনক, সেই পরিবর্ত্তনের স্রোতও তাঁহারা রোধ করিতে চাহেন না। কেবল যাহাতে স্বার্থের সংঘর্ষ আছে, এরূপ পরিবর্ত্তনের গতি রোধ করিতে চাহেন। দুই একটী উদাহরণ দিলেই আমাদের উক্তি স্পষ্ট হইবে। নব্যসম্প্রদায় এতদিন জাতিভেদের

বিরুদ্ধে ক্রমাগত আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। এই আন্দোলনের ফলে উচ্চ শ্রেণীস্থ শূদ্রের সহিত ব্রাহ্মণ শ্রেণীর সামাজিক দূরত্ব কিছু কিছু কমিতেছে। অগ্রে যে কায়স্থাদি ব্রাহ্মণের বিছানায় বসিতে পাইতেন না, তাঁহারা নির্জ্জনে ভোজনে ব্রাহ্মণগণের সহিত এক পংক্তিতেও ভোজন করিয়া থাকেন। যাঁহারা এই অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা নিম্নতম শ্রেণীকে সে অধিকার দিতে প্রস্তুত নহেন। কায়স্থ ব্রাহ্মণকে নামাইবার জন্য জাতিভেদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, এখন নিম্নশ্রেণী যখন তাঁহাদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন তাঁহারা স্কোটনবাদী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। পিতৃপৈতামহিক দেবদেবীকে পদদলিত করিব, গুরু ব্রাহ্মণকে অপমানিত করিব, সামাজিক কর্ত্তৃত্ব চির-নেতা ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে নিজের হস্তে লইব, বাবুর্চ্চির হস্তে পচিত খানা খাইব, সাহেবী চালে চলিব—এ সমস্ত সময়ে আমি পরিবর্ত্তনশীল। আর যখন আমাকে কোন স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে হইবে তখনই আমি স্থিতিশীল। বিধবার বিবাহ সম্বন্ধেও এই কারণে উক্ত সম্প্রদায় স্থিতিশীল হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বিধবা ভগ্নি বা কন্যার বিবাহ দিতে গেলে আপাততঃ তাঁহাদিগকে বিবিধ প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। বিধবা কন্যা বা ভগিনী তাঁহার গৃহে অবৈতনিক পরিচারিকার কার্য্য করিয়া থাকেন, বৈতনিক পরিচারিকার দ্বারা যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইবার নহে, তাঁহাদিগের দ্বারা সে সকল কার্য্যও সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের সেবা হইতে বঞ্চিত হওয়া ভিন্নও তাঁহাদিগের আর একটী গুরুতর অনিষ্ট এই হয় যে, সমাজ তাঁহাদিগকে আপাততঃ পরিত্যাগ করিবে। আবার বিধবা-বিবাহ যুক্তি ও শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্বীকার করিয়া কার্য্যতঃ তাহার অনুষ্ঠান না করিলেও লোকে কপটী বলিয়া ঘৃণা করিবে, সুতরাং ইহার প্রতিপক্ষ অবলম্বন করাই তাঁহাদিগের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। এই সকল কারণেই এই বিপরীত আন্দোলনের চেষ্টা। এই জন্যই এখন এ কথা উঠিতেছে—যে যাহা বহুদিন হইতে অপ্রচলিত রহিয়াছে, তাহাকে সহসা প্রচলিত করা যায় না।

যাঁহাদিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতি মতামত বিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারাই এক্ষণে অপ্রচলিত বিধবা-বিবাহ সহসা প্রচলিত করা অসাধ্যসাধন বলিয়া খ্যাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যদি বিধবা-বিবাহ যুক্তি ও শাস্ত্রের অনুমোদিত বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, আর যদি আমরা কপটী না হই এবং একাগ্রচিত্তে এই প্রথার পুনঃ প্রবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হই, তাহাহইলে ইহা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতে কয় দিন লাগে? ইহা প্রচলিত করিতে বিশেষ কোন আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। যেমন কুমারী কন্যা বা ভগিনী যোগ্যা হইলে পিতা বা ভ্রাতা তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হন, সেইরূপ ব্যস্ততা যদি তাঁহারা অপরিণতবয়স্কা বিধবার বিবাহের জন্য দেখান, ও সৎপাত্র পাইলেই যদি তাহাদিগের বিবাহ দেন, তাহাহইলেই অতর্কিত ভাবে ইহা সমাজমধ্যে চলিয়া যাইবে। যদি সুশিক্ষিত সমাজ, যে বিধবা-বিবাহ দিল বা করিল, তাহার সহিত পূর্ব্ববৎ সম-সামাজিকতা রাখেন, তাহাহইলে বিধবা-বিবাহ দিতে বা করিতে লোকের অপ্রতুল হইবেনা। সুতরাং যাহা আপাততঃ প্রচলিত করা সুকঠিন বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা বিনা কষ্টে প্রচলিত হইয়া যাইবে।

২য় পূর্ব্ব পক্ষের মীমাংসায় আমরা অধিক বলিবার আবশ্যকতা দেখি না। যাঁহারা রামায়ণ মহাভারত আনুপূর্ব্বিক পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে বিধবা-বিবাহ তৎকালে প্রচলিত না থাকিলে বড় বড় লোকে বিধবা-বিবাহ করিতেন না বা বিবাহ করিবার উদ্যোগ করিতেন না। একটা আধটা দৃষ্টান্ত দিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। বালীর মৃত্যুর পর সুগ্রীব বালীর বিধবা পত্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন বিধবা-বিবাহ করিয়াছিলেন। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকিলে দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বরে সমস্ত নৃপতি ও দেবমণ্ডলী উপস্থিত হইতেন না। নলের অদর্শনে ব্যাকুলা হইয়া দময়ন্তী নলের সন্ধান পাইবার আশায় ঘোষণা করিলেন যে, নল রাজার মৃত্যু হওয়ায় তিনি আবার বিবাহ করিবেন। সেই স্বয়ম্বর-সভায় দেব, নর, যক্ষ, কিন্নর সকলেই দময়ন্তীর পাণিগ্রহণ আশায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। যদি বিধবা-বিবাহ সর্ব্ববাদী-

সম্মত ও সর্ব্বত্র প্রচলিত না থাকিত তাহাহইলে দময়ন্তীকে বিধবা জানিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য এত বড় বড় লোকের সমাগম হইত না। তদ্ভিন্ন বিধবা-বিবাহের সার্ব্বজনিকতার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ—শাস্ত্রের ব্যবস্থা। যদি বিধবা-বিবাহ সর্ব্ববাদী-সম্মত না হইত, তাহাহইলে মনু পরাশর প্রভৃতি প্রধান প্রধান শাস্ত্রকারেরা কখন বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা দিতেন না। যাঁহারা বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তায় সন্ধিহান, তাঁহারা যেন বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখেন।

৩য়। শাস্ত্রে যেরূপ লিখিত আছে, তাহাতে ইহাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া বোধ হয়না। —এই পূর্ব্ব পক্ষের মীমাংসায় এই মাত্র বক্তব্য যে কোন্ শাস্ত্রে বিধবা-বিবাহকে সদোষ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার নির্দ্দেশ করা হয় নাই। তবে প্রতিপক্ষের অভিপ্রায় যদি এই হয়—যে শাস্ত্রে সহমরণকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিকল্প বলিয়া তদক্ষম পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য, ও তদক্ষম পক্ষে বিবাহ, এই পর পর ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—তাহা-হইলে তদুত্তরে এইমাত্র বক্তব্য যে, সহমরণের নিরাকরণে বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য ও বিবাহ এই দুই বিকল্প মাত্র অধুনা বর্ত্তমান আছে। এই দুই বিকল্পের মধ্যে সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, যে প্রকৃত সন্ন্যাসিনী, তাহার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যই শ্রেয়ঃকল্প। যিনি স্বামীকে এতদূর ভাল বাসি-তেন, যে স্বামীর মৃত্যুতেও জগৎ স্বামীময় দেখিয়া থাকেন, ধ্যানে জ্ঞানে, শয়নে স্বপনে যিনি মৃত স্বামী ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না, সেই পতিদেবতা বিধবা জগতের আরাধ্যা। কোন্ প্রাণে কে তাঁহাকে আবার বিবাহ করিতে বলিবে? বিধবা-বিবাহ-প্রবর্ত্তকগণের হৃদয় এ দেবীগণের জন্য কাঁদে না। কারণ ইহাঁরা দুঃখিনী নহেন—মর্ত্তে থাকিয়াও স্বর্গ-সুখের অধিকারিণী। কিন্তু কয়জনের অদৃষ্টে এই পতি-আরাধনা ঘটিয়া থাকে? কয়জন বিধবা মৃত পতিকে জগন্ময় দেখেন? কয়জন তাঁহাকে দেবতাভাবে পূজা করেন? আমরা সর্ব্বপ্রকার ভান বা কপটাচারের বিদ্বেষী, সুতরাং আমরা সতীত্বের ভান বা কপটাচার চাহি না! তাই বলিতেছি, কয়জন এই আদর্শ-সতী হইতে পারেন? লোকের নিকট প্রতিপত্তি পাইবার জন্য বা বাহাদুরি দেখাইবার জন্য অনেক বিধবা

পতিসহ সহমরণে গিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কয়জন বিধবা সেই পরলোক-গত স্বামীকে ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া চিতানলে দেহ ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন? ববং ইতিহাসে রুধিরাক্ষরে লিখিত আছে যে, অধিকাংশ সতীকে বলপূর্ব্বক অগ্নিতে প্রক্ষেপ করা বা চাপিয়া ধরা হইত। সে নৃশংস কাণ্ড রাজশাসনে উঠিয়া গিয়াছে; এক্ষণে যাহা বর্ত্তমান আছে তাহা তদপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর। অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দেওয়া হইল। বৎসর না যাইতে সে বিধবা হইল। হিন্দুসমাজ সেই দুগ্ধপোষ্যা বালিকাকে ব্রহ্মচারিণী সাজাইবেন। তাহাকে আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী থাকিতে বলিবেন। হিন্দুসমাজ নীলোৎপল-পত্র দ্বারা শাল্মলী বৃক্ষ ছেদন করিতে চেষ্টা করিবেন। অসম্ভবকে সম্ভব করিতে চেষ্টা করিবেন। যে চির-কঠোর চির-কৌমারব্রত ভীষ্মাদির পক্ষেও কষ্টসাধ্য, অজ্ঞানা বালিকা দ্বারা সেই কঠোর ব্রতের সাধন করাইয়া লইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত, সুতরাং এ চেষ্টার পরিণাম বিষময়। নরহত্যার স্রোতে ভারত ভাসিয়া যাইতেছে, অন্ধ হিন্দুসমাজ দেখিয়াও দেখিতেছে না! বর্ত্তমান সেন্‌সস্ দেখিলে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় না বিগলিত হয়! এই সেন্‌সসে জানাগিয়াছে যে, আজকাল ভারতবর্ষে ২ কোটী ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৬ শত ২৬ জন হিন্দুবিধবারমণী আছে। ইহাদিগের মধ্যে ৭৮ হাজার বাল-বিধবার বয়স নয় বৎসরের মধ্যে; দুই লক্ষ সাত হাজার বালবিধবার বয়স নয় ও চৌদ্দের মধ্যে; এবং তিন লক্ষ ৮২ হাজার বালবিধবার বয়স চৌদ্দ ও উনিশের মধ্যে। ইহাতে দেখা যায়, প্রায় ছয় লক্ষ বাল-বিধবার বয়স উনিশের কম। কোন্ পাষাণ-হৃদয় না বলিবেন যে এই ছয় লক্ষ বাল-বিধবার বিবাহ দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য? কোন্ চিন্তাশীল ব্যক্তি না বলিবেন যে, ইহাদিগকে চির-বৈধব্য-যন্ত্রণায় দগ্ধ করা অপেক্ষা পতিসহ ভস্মসাৎ করা সহস্র গুণে অধিক দয়ার কার্য্য? এরূপ বিধবার বিবাহ দেওয়াকে যে সদোষ বলে, তাহার মত কঠিন-হৃদয় ব্যক্তি আর দেখা যায় না। শাস্ত্রকারেরা যে অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহকে প্রশস্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সে এই বাল-বিধবা-

গণকে লক্ষ্য করিয়াই। কিন্তু আমরা পাষণ্ড, তাই শাস্ত্রের মস্তক্যে পদাঘাত করিয়া, দয়াবৃত্তিকে উন্মূলিত করিয়া, ন্যায়পরতার উচ্ছেদ-সাধন করিয়া, এরূপ সুকুমারমতি বালিকাগণকে অতি কঠোর ব্রহ্মচর্যে নিয়োগ করিয়া থাকি। যাহা নিজে পারি না, তাহা এই বালিকাগণ দ্বারা সম্পন্ন করিয়া লইতে চাই।

৪র্থ পূর্ব্ব পক্ষের উত্তরে এই মাত্র বক্তব্য যে, মনু ও পরাশর যে ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, যদি অন্যান্য ঋষিরা তাহা শিরোধার্য্য করিয়া না লইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা যুক্তি দ্বারা তাঁহাদিগের মত খণ্ডন করিয়া যাইতেন। কিন্তু কোন ঋষিই তাহা করেন নাই, সুতরাং ইহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, বিধবা-বিবাহ তৎকালে সর্ব্ববাদীসম্মত ছিল, সেই জন্যই ঋষিশ্রেষ্ঠ পরাশর ও মনু ইহার ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, এবং অন্যান্য ঋষিরা বিনা প্রতিবাদে তাঁহাদিগের মত শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছিলেন। বিশেষতঃ "কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ—কলিতে পরাশরের মতই প্রবল।

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধিয়তে॥"

সুতরাং পরাশর যখন এই শ্লোক দ্বারা বিধবার বিবাহ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তখন হিন্দু মাত্রেরই অপ্রতিবাদে সেই মত শিরোধার্য্য করিয়া লওয়া উচিত।

৫ম পূর্ব্ব পক্ষের অর্থ সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় না। বৈধব্য পুরুষের দোষে ঘটিয়া থাকে, সুতরাং পুরুষের দোষ সংশোধন করিলেই বৈধব্য নিবারিত হইতে পারে। বিধবা-বিবাহ অপেক্ষা বৈধব্য মোচনের ইহাই প্রধান উপায়। পুরুষের কোন্ দোষে বৈধব্য ঘটে, তাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না। শারীরিক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফলে পুরুষের অকাল-মৃত্যু ঘটে; পুরুষের অকাল-মৃত্যুই স্ত্রীজাতির বৈধব্যের মূল, সুতরাং পুরুষ যদি শারীরিক নিয়ম সকল প্রতিপালন করেন তাহা-হইলে বৈধব্য মূলতঃ বিদূরিত হইতে পারে;—পূর্ব্বপক্ষকারের যদি এই

অর্থ হয়, তদুত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা, দারিদ্র্য ও অন্যান্য কারণে অকাল-মৃত্যু পৃথিবী হইতে কখনই একেবারে তিরোহিত হইবে না। অকাল-মৃত্যু শুদ্ধ যে পুরুষজাতিতে আবদ্ধ এরূপ নহে, নারী জাতিতেও অকাল-মৃত্যু বিরাজমান। তবে শ্রমের অবথা বিভাগের জন্য চিরদিনই অকাল-মৃত্যু পুরুষজাতিতে প্রবলতর থাকিবে। পুরুষকে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অনবরত অর্থোপার্জ্জনে ঘুরিতে হয়, সুতরাং পুরুষের দীর্ঘায়ু হওয়া দুরূহ। যতদিন শ্রমবিভাগের এই অসম বিতরণ নিবারিত না হইবে, ততদিন পুরুষজাতির এই অকাল মৃত্যুর প্রবলতা নিবারিত হইবার কোন আশা নাই। সুতরাং বিধবার সংখ্যা মোটামুটী এইরূপই থাকিবে। যদি কখন বিজ্ঞানের ভূয়সী আলোচনায় ও অন্যান্য কারণে অকাল-মৃত্যু নিবারিত হয়, তখন বিধবাই থাকিবে না, সুতরাং বিধবা-বিবাহ দিবার জন্যও কোন সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় বিগলিত হইবে না। কিন্তু এক্ষণে যে দুই কোটী দশ লক্ষ হিন্দুবিধবার অশ্রুজলে ভারতবক্ষ প্লাবিত হইতেছে, তাহাদিগের উপায় কি হইবে? এই দুই কোটী দশ লক্ষের মধ্যে প্রায় সাত লক্ষ বালবিধবা আছে। কোন্ প্রাণে আমরা তাহাদিগের দুর্ব্বিবহ যন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া আত্মসুখে নিমগ্ন থাকিব? স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া কত দিন আর আমরা ইহাদিগকে চিরবৈধব্যানলে দগ্ধ করিব? পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে বালবিধবা ভগিনী বা কন্যা কণ্টকশয্যায় ছটফট করিতেছে, আর তৎপার্শ্ববর্ত্তী গৃহে ভ্রাতা বা পিতা পত্নী লইয়া রঙ্গরস করিতেছেন—এ মর্ম্মঘাতী পাপদৃশ্য আর আমাদিগকে কতদিন দেখিতে হইবে?

৬ষ্ঠ পূর্ব্ব পক্ষের উত্তর অতি সহজ। বৈরাগ্য ঈশ্বর-আরাধনার অনুকূল। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা বিধবার পক্ষে বৈরাগ্যমূলক ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রকৃত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীকে আমরা পূজা করিয়া থাকি। সক্ষম পক্ষে শাস্ত্রকারেরা ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, কেহই তাহা অস্বীকার করিবে না। তবে সেই শাস্ত্রকারেরা অক্ষম পক্ষে বিধবার বিবাহেরও

ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। যাহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যপালনে অক্ষম ও অনিচ্ছুক, তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক তাহাতে নিয়োগ করিবার তোমার কি অধিকার আছে? যে ভারবাহক, সে ভারবহনে অপারগ; তাহার মস্তকে সেই ভার অর্পণ করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলার তোমার কি অধিকার আছে? ইহার বিষময় ফল তুমি কি প্রতিগৃহে প্রত্যক্ষ করিতেছ না? প্রতিগৃহ যে ভ্রূণহত্যামহাপাপে দগ্ধ হইতেছে, তাহা কি তুমি দেখিয়াও দেখিবে না? প্রকারান্তরে সেই মহাপাপের সহায়তা করিয়া তুমি কি সেই মহাপাপের অংশভাগী হইতেছ না? তোমার স্ত্রীবিয়োগ হইলে, তুমি শতবার বিবাহ করিবে, আর তোমার বালিকা কন্যা বা ভগিনীর কপাল একবার ফাটিলে আর তাহা জুড়িয়া দিবে না—এ নীতিশাস্ত্র তোমরা কোথায় পাইলে? শাস্ত্রকারেরা যে ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা একশ্রেণীনিষ্ঠ বা বলপ্রযুক্ত নহে। স্ত্রী বা পুরুষ যেই সক্ষম হইবে, তাহারই পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য শ্রেষ্ঠকল্প বলিয়া ঋষিরা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা স্বয়ং আদর্শ ব্রহ্মচারী হইয়া এই উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তনে অনেকেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিত। অধিকাংশ বিধবা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিত বলিয়াই, বিধবাবিবাহ ক্রমে অগৌরবের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। যখন সহমরণ-প্রথা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন যে বিধবা সহমরণে না যাইত, তাহাকে সকলেই অসতী বলিয়া ঘৃণা করিত। এই জন্য ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক কিছুকাল বিধবামাত্রই সহমরণে যাইত। চিতায় আরোহণ করিলে পর যখন অগ্নি প্রজ্বলিত হইত, তখন অর্দ্ধদগ্ধ অনেক বিধবা প্রাণভয়ে অভিভূতা হইয়া লাফাইয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু কঠোরহৃদয় আত্মীয় স্বজন ধরিয়া আনিয়া আবার তাহাদিগকে চিতায় আরোপিত করিয়া যতক্ষণ না পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইত, ততক্ষণ বাঁশ দিয়া চাপিয়া রাখিত। সে নৃশংস প্রথা মহাত্মা রামমোহন রায়ের যত্নে বিদূরিত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে যে প্রথা রহিয়াছে, তাহা সহমরণ অপেক্ষাও অধিকতর নৃশংস। যে পুড়িয়া মরিতে অনিচ্ছুক, তাহাকে বলপূর্ব্বক পুড়াইয়া মারিয়া তাহার

অনন্ত যাতনার অবসান করা হইত। কিন্তু এই নৃশংস প্রথা বাল-বিধবাগণকে প্রতিদিন দগ্ধ করিতেছে। বিন্দু বিন্দু করিয়া তাহাদিগের শোণিতপাত করিয়া ক্রমে তাহাদিগের জীবন অবসান করিতেছে। সহ্য করিতে পারিতেছে না, তথাপি তাহাদিগকে চিরবৈধব্যানলে দগ্ধ করা হইতেছে। শাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করিয়া আমরা জঘন্য দেশাচারের দাস হইয়া প্রতিদিন প্রতিগৃহে এই নৃশংস দৃশ্যের অবতারণা করিতেছি। ধিক্ আমাদের শিক্ষায়! শতধিক্ আমাদের জীবনে! আমরা ধর্ম্মের ভান করিয়া ঘোরতর অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিতেছি। শাস্ত্রকর্ত্তাগণের দোহাই দিয়া তাঁহাদিগের ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ করিতেছি। অসংখ্য প্রাণিবধের নিমিত্ত কারণ হইয়া ঘোরতর নারকী হইতেছি। প্রকৃতি আমাদের এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে যে, আমরা আর এই পাপদৃশ্যে ব্যথিত হই না। আমাদের হৃদয়ের দয়াবৃত্তি একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। আমরা এরূপ নিষ্ঠুর হইয়া গিয়াছি যে, এই শোচনীয় দৃশ্যে শুদ্ধ যে আপনারা ব্যথিত হইব না এরূপ নহে, যদি আর কেহ ব্যথিত হন, তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিব। আপনারা তাহাদিগের উদ্ধারের কোন পন্থা করিব না—তাহাতেই সন্তুষ্ট নহি—আর যদি কেহ সে পন্থা করিয়া দেয়, তাহাকে খাইয়া ফেলিতে উদ্যত হইব। এই নিষ্ঠুরতায় পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী সকলেই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। মহীয়ান্ সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কি আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছে? দেবোপম ঋষিবৃন্দ কি আমাদিগকে এই ঘাতকবৃত্তি অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন? কখনই নহে!—শাস্ত্রের দোষ নাই—শাস্ত্রকর্ত্তাগণের দোষ নাই—আমাদের অদৃষ্টের দোষ। তাই আজ আমরা সেই দেবগণের বংশধর হইয়া শৌনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি!

সপ্তম ও অষ্টম পূর্ব্ব পক্ষের উত্তর একই। যদি পুরুষের সন্তানাদি থাকিতে বিবাহ প্রতিসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে স্ত্রীজাতির সন্তানাদি থাকিতে দ্বিতীয়বার বিবাহের নিষেধ সাম্যনীতি ও ন্যায়পরতার বিরোধী। এরূপ স্থলে বিবাহ না করিলে ভাল হয়, তাহা সকলেই

মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। কিন্তু যেখানে অনিবার্য্য কারণে বিবাহ আবশ্যক হইয়া উঠে, সেখানে নিষেধ করার ফল প্রায় বিষময় হইয়া উঠে। এমন অনেক স্থলে ঘটে যে, কোন বিধবা-রমণী দুই একটী শিশু সন্তান লইয়া বিধবা হইয়াছেন—অভিভাবক কেহই নাই—ধনসম্পত্তিও নাই, সুতরাং অনেক সময়ে গত্যন্তর না থাকায় তাঁহাকে হয়ত কাহারও নিকট আত্ম-বিক্রয় করিতে হইল। এরূপ স্থলে বিবাহ কি শ্রেয়ঃ নহে? যিনি বিবাহ করিবেন, তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া শিশুসন্তানগুলির ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে জগতের কি অধিকতর মঙ্গল হইল না? কাহারও নিকট দাস্যবৃত্তি করিয়া উদর পূরণ করা অপেক্ষা ইহা কি সহস্রগুণে অধিকতর গৌরবের বিষয় নহে? যুবতী পরিচারিকা বা পাচিকার পরগৃহে সচরাচর যেরূপ দুর্গতি ঘটিয়া থাকে, তাহা কাহার অবিদিত আছে? যে বিধবার যৌবনকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে, বা যিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছেন, তাঁহাদের বিবাহের জন্য কেহই চেষ্টা করিতেছে না। যে অসংখ্য বাল-বিধবার অশ্রুজলে ভারতবক্ষ প্লাবিত হইতেছে, হৃদয়বান লোকে তাহাদিগের দুঃখ-মোচনের চেষ্টা করিতেছেন মাত্র! কিন্তু এরূপ বিশাল কার্য্যক্ষেত্রে অতি অল্প লোকই নামিয়াছেন। তাঁহাদিগের চেষ্টায় এরূপ সুবৃহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার নহে। এই জন্য সহৃদয়মাত্রকেই আমরা অনুরোধ করি, তাহারা দীর্ঘসূত্রিতার বশীভূত হইয়া যেন কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে আর কাল-বিলম্ব না করেন।

নবম পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে অল্পই বক্তব্য আছে। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার পরিমাণ ইউরোপ অপেক্ষা অধিক হইয়াছে, সেন্‌সেস্ দ্বারা এরূপ প্রমাণীকৃত হয় নাই। প্রত্যক্ষ আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে, আমরা অধিকতর জ্ঞানবান্ ও অধিকতর শ্রমশীল হইলে বিবিধ প্রকারে জাতীয় ধনবৃদ্ধি করিতে পারি। আহারের অভাব হইলেই লোকের অধিকতর শ্রম করিতে, ও অধিকতর বুদ্ধির উদ্ভাবনা করিতে হইবে। সেন্‌সস্‌দ্বয়ের তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হিন্দুজাতি অপেক্ষা মুসলমান-

জাতি সংখ্যায় অধিকতর বৃদ্ধি পাইতেছে। মুসলমানের যেরূপ সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে ভারতবর্ষ অচিরকালমধ্যে মুসলমানে পূরিয়া যাইবে। একদিকে হিন্দুজাতি নিরন্তর আত্মধ্বংস করিতেছেন, লোক-সংখ্যা-বৃদ্ধির অন্তরায়-স্বরূপ বিবিধ সামাজিক নীতি পোষণ করিতে ছেন, অন্যদিকে দূরদর্শী মহম্মদের ব্যবস্থাবলে মুসলমানেরা পতঙ্গপালের ন্যায় ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিতেছে। এরূপ চলিতে দিলে অল্প-কাল-মধ্যে হিন্দুস্থান মুসলমানস্থানে পরিণত হইবে। যাঁহারা হিন্দুজাতির ধ্বংসকামী নহেন, তাঁহারা বিধবা-বিবাহের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিবেন না। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে, হিন্দুজাতি হিন্দুস্থানে আপনার আধিপত্য রাখিতে সক্ষম হইবে। আড়াই কোটী হিন্দু-বিধবার সন্ততি হইলে, হিন্দুজাতির কতদূর সংখ্যাবল বাড়িতে পারে, যাঁহারা একবার ইহা ভাবিবেন, তাঁহারা হিন্দু-বিধবা-বিবাহের কখন প্রতিপক্ষ হইবেন না। ম্যাল্থসের মত চালাইবার সময় আমাদের এখনও আসে নাই। যাঁহারা একান্তই সে মতের পক্ষপাতী, তাঁহারা যেন আপনারা লোকবৃদ্ধিকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন। আপনাদিগের মত, অনাথিনী বিধবা-গণের উপর দিয়া চালাইবার চেষ্টা করা নৃশংসতা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

জাতীয় চরিত্র।

কোন সমাজসংস্কার করিতে গেলে আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য জাতীয় চরিত্রসংগঠন। চরিত্রই সর্ব্বসংস্কারের ভিত্তিভূমি। আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের 'জাতীয়-চরিত্র-বিহীনতাই' সেই মূল কারণ। জাতীয় চরিত্র সংগঠিত না হইলে আমাদের অভ্যুত্থানের আর কোন আশা নাই। যে কারণে আমাদের অধঃপতন হইয়াছে সে কারণ থাকিতে আমাদের উঠিবার আশা কোথায়? আত্মোৎসর্গ, সৎসাহস, অধ্যবসায়, সত্য-প্রিয়তা, বিশ্বাসানুবর্ত্তিতা, পরস্পর মমতা ও পরস্পর বিশ্বাস—জাতীয় চরিত্রের এই কয়েকটীই প্রধান উপকরণ-সামগ্রী। আমি যখন আত্ম

ভুলিয়া স্বজাতির জন্য ও স্বদেশের জন্য প্রাণোৎসর্গ করিতে শিখিব, তখনই আমার জাতি—আমার দেশ—জগতের শ্রদ্ধাভাজন হইবে। তখনই আমার জাতি ও আমার দেশ পৃথিবীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সমরে অবতীর্ণ হইতে পারিবে। যখন নিরন্তর বাধাবিপত্তিতেও আমার অধ্যবসায় বিচলিত হইবে না, তখনই আমি মহীয়ান্ হইব, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমি—সমষ্টি-জড়িত আমার জাতি ও আমার দেশও মহীয়ান্ হইয়া উঠিবে। যখন আমি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করিব, প্রাণাত্যয়েও তাহা হইতে বিচলিত হইব না, তখনই আমার এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার দেশের প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হইবে। যদি আমি নির্যাতন-ভয়ে আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান হইতে বিচলিত হই, তাহা হইলে আমার নৈতিক বল চলিয়া যাইবে। আমি ক্রমশঃ ভীরু ও কাপুরুষ হইয়া যাইব। আর আমি তুমি সকলেই যদি ভীরু ও কাপুরুষ হইয়া যাই, তাহা হইলে আমি-তুমি-সংগঠিত সমাজও সেই সঙ্গে সঙ্গে ভীরু ও কাপুরুষ হইতে থাকিবে। যে জাতির অধিকাংশ লোক ভীরু ও কাপুরুষ, সে জাতি কখন দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে না। যে সামান্য নির্যাতন-ভয়ে কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসের অনুবর্ত্তন হইতে বিমুখ হয়, সে যে গুরুতর নির্যাতন সহ্য করিতে পারিবে, তাহার আশা কোথায়? স্বাধীনতা রক্ষা করিতে বা অপহৃত স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হইতে যে পরিমাণ আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন, যাহারা ক্ষুদ্র সামাজিক নির্যাতনে ভীত হয়, সেই কাপুরুষগণের পক্ষে সে আত্মোৎসর্গ আকাশ-কুসুমবৎ প্রতীত হইবে। যাহারা প্রতিবাসীর অরুণ নয়ন একবার দেখিলে ভয়ে অভিভূত হয়, তাহারা যে স্বদেশের জন্য—স্বজাতির জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইবে, তাহা দুরাশা মাত্র। এইজন্য বলিতেছি, যদি জাতীয় গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে অগ্রে চরিত্র গঠন করিতে হইবে।

জাতীয় উন্নতির প্রধান কারণ যদি চরিত্র-সংগঠন হয়, তাহা হইলে দেখিতে হইবে, আমাদের জাতীয় চরিত্রে কি কি অভাব আছে। যাঁহারা বলেন যে, আমাদের জাতীয় চরিত্রে কোন অভাব নাই, তাঁহারা চরিত্র-

বিশ্লেষণে নিতান্ত অসমর্থ। লক্ষ্যের অবিচলিতত্তা ও একতা, দুর্দ্দমনীয় সাহস, অবিচলিত অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগ—জাতীয় চরিত্রের এই কয়টী প্রধান উপাদান আমাদের চরিত্রে অতি অল্পমাত্রায় বিদ্যমান আছে। বৎসর বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনেক উপাধিধারী সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন, কিন্তু তাহার মধ্যে কয়জনের চরিত্রে এইসকল উপাদান-সামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায়? অনেককেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদিগের জীবনের কোনই লক্ষ্য নাই—অথবা যদি লক্ষ্য থাকে, তাহা সতত পরিবর্ত্তনশীল। তাঁহারা বায়ুতাড়িত তুলার ন্যায় এক লক্ষ্য হইতে আর এক লক্ষ্যে সতত বিক্ষিপ্যমান। তাঁহারা লক্ষ্যের অনুসরণ করেন না, লক্ষ্য তাঁহাদিগের অনুসরণ করে। তাঁহারা সর্ব্বথা চলৎলক্ষ্য, একথা বলিতে পারি না। তাঁহাদিগের একটী লক্ষ্যের স্থিরতা আছে—যে কোনরকমে অর্থসংগ্রহ করা। নিজের হৃদয়কে শুষ্ক করিয়া, দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজনের দুঃখে কর্ণপাত না করিয়া কেবল অর্থসংগ্রহ করা—এ লক্ষ্যের অবিচলিতত্তা অনেক স্থলেই পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহাতে জাতীয় উন্নতি কিরূপে হইবে? নিজের স্বার্থসাধনেও জাতীয় উন্নতি প্রকারান্তরে হয় বটে, কিন্তু তাহাতে মানসিক তেজ জন্মে না। ব্যক্তিগত মানসিক তেজের সমবায়ই সামাজিক বা জাতীয় তেজ। সেই ব্যক্তিগত তেজের অভাবই আমাদের জাতীয় নির্ব্বীর্য্যতার কারণ।

এক্ষণে কিরূপে সেই ব্যক্তিগত তেজের উৎপত্তি হইতে পারে, আমরা তাহার আলোচনা করিব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, (১) লক্ষ্যের অবিচলিতত্তা ও একতা, (২) দুর্দ্দমনীয় সাহস, (৩) অবিচলিত অধ্যবসায়, ও (৪) আত্মত্যাগ, মহৎ-চরিত্রের এই কয়টী প্রধান লক্ষণ। যদি আমরা একটী লক্ষ্য ধরিয়া আজীবন অবিচলিতভাবে একপথে চলিতে পারি, তাহাহইলে প্রতিপদে আমাদের মনের তেজোবৃদ্ধি হইতে থাকিবে। যেমন মাধ্যাকর্ষণশক্তিবলে ক্ষুদ্রতর জড়ের বৃহত্তর জড়াভিমুখে গতির পরিমাণ ক্রমেই বাড়িতে থাকে, সেইরূপে অনবরত এক লক্ষ্যাভিমুখে ধাবিত হইলে আমাদের মনের তেজ ক্রমশঃই বাড়িতে থাকিবে। প্রতি মন এক-লক্ষ্য-নিষ্ঠ হইলে জাতীয়

শক্তি ক্রমশঃই উপচীয়মান হইতে থাকিবে। যাহা জাতীয় মঙ্গলের নিদান, তৎসাধনে যদি আমরা অবিচলিত অধ্যবসায়, দুর্দ্দমনীয় সাহস ও আত্মত্যাগ করিতে শিখি, তাহা হইলে ব্যক্তিগত মানসিক বলোপচয়ের সহিত জাতীয় বলোপচয় আপনিই ঘটিতে থাকিবে।

কিন্তু আমরা তাহার কি করিতেছি? যাহাতে সেই ব্যক্তিগত তেজ উৎপন্ন হয়, তাহার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতেছি? অভ্যাস ব্যতীত কোন গুণ স্বতঃই উৎপন্ন বা পরিপুষ্ট হয় না। আমরা সেই ব্যক্তিগত গুণের উৎপত্তি বা পরিপুষ্টি সাধনের জন্য কি অভ্যাস বা সাধনা আরম্ভ করিয়াছি? আমরা শুদ্ধ কলিকাতার আন্দোলন দেখিয়া মুগ্ধ হইব না। কলিকাতায় এক্ষণে অনেক বিষয়ের আন্দোলন হইতেছে বটে, কিন্তু আজও কোন বিষয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যারম্ভ হয় নাই। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে মৌখিক ও লিখিত আন্দোলন একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহারা চিরদিনই আন্দোলন করিয়া বেড়ায়, কখন কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে সাহস করে না, তাহাদের চরিত্র কখন স্ফূর্ত্তি পায় না। নিরন্তর অপরকে যে কার্য্য করিতে উপদেশ দিতেছি, যদি নিজে কখন সে কার্য্য না করি, তাহা হইলে আমার উপদেশ লোকে শুনিবে কেন? সুতরাং লোককে যে কার্য্যে উত্তেজিত করিতে হইবে, অগ্রে স্বয়ং দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা দেখাইতে হইবে। ৺ কেশবচন্দ্র সেনের মাহাত্ম্য বোধ হয় অতি অল্প লোকেই অস্বীকার করেন। যাঁহারা তাঁহার মাহাত্ম্য স্বীকার করেন, তাঁহারাও যে তাঁহার কন্যার বিবাহে চটিয়াছিলেন, তাহার কারণ—তাঁহারা কেশব বাবুকে এ বিষয়ে কপটী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। উক্তির সঙ্গে কার্য্যের সামঞ্জস্য না দেখিলে লোকের মনে শ্রদ্ধার উদয় হয় না। পূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্রের বিধবাবিবাহ হওয়ার পুর্ব্বে লোকে তাঁহাকেও কপটী বলিয়া সন্দেহ করিত। এমন কি, আমার সম্মুখে কোন বড় লোক বলিয়াছিলেন যে, তিনি আপনার ঘর ঠিক রাখিয়া পরের ঘর মজাইতেছেন। কিন্তু এখন আর তাঁহাকে সে কথা কেহ বলে না—বলিতে ও পারে না।

কিন্তু আমাদের নব্য-সম্প্রদায়ে আমরা কি দেখিতে পাই? অধিকাংশই কেবল মুখসর্ব্বস্ব—আজ্ঞা দানে উদ্যত, আজ্ঞা পালনে পরাঙ্‌মুখ। বাক্য ও কার্য্যের সামঞ্জস্য অতি অল্পস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। কি সমাজসংস্কার, কি রাজনৈতিক আন্দোলন—সকল বিষয়েই মুখে যতদূর সম্ভব, তাহাতে কেহই পশ্চাৎপদ নহেন। কিন্তু কার্য্য উপস্থিত হইলেই বিষম বিপৎ। যাঁহারা সভাস্থলে দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতায় সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, গৃহে আসিলে তাঁহাদিগের আর সে মূর্ত্তি দেখিতে পাই না। তখন এক এক জন দলপতি। সভায় যাঁহারা সংস্কারের একান্ত আবশ্যকতা ও সবিশেষ উপযোগিতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাই কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া বলিতে আরম্ভ করেন যে "সময় আসিলে আপনিই হইবে"—"রোম এক দিনে নির্ম্মিত হয় নাই (Rome was not built in a day)," "বলপূর্ব্বক সংস্কার করিতে গেলে উন্নতির স্রোত প্রতিহত হইবে।" সত্য, রোম এক দিনে নির্ম্মিত হয় নাই, কিন্তু প্রতিদিনই রোমের কার্য্য না চলিলে, কালের গতিতে রোম কিছু একদিনেই একেবারে অনন্তসৌর্য্যশালিনী হইত না। যাহারা ভাবে যে রোমের অল্প অল্প কার্য্য আরম্ভ না হইয়াই রোম এক দিনে গগনস্পর্শিনী সৌধমালায় সুশোভিত হইয়াছিল, তাহারা মূর্খ, তাহাদিগের সহিত আমাদের কোন কথা নাই। রোমের ন্যায় সমাজসৌধও প্রতিদিনের একটু একটু কার্য্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। আবার প্রতিদিনের একটু একটু কার্য্যে সেই সমাজসৌধের জীর্ণসংস্কার হইয়া থাকে। যে অলস ব্যক্তিরা জীর্ণসংস্কার করিতে না চায়, তাহাদিগের অট্টালিকা অচিরকালমধ্যে নিশ্চয় ভূমিসাৎ হইবে।

যেখানকার লোকে এতদূর স্থিতিশীল যে, যাহা আছে তাহাতেই পরিতৃপ্ত, কোন প্রকার জীর্ণসংস্কার করিতে চাহে না, সেখানে বিপ্লব অনিবার্য্য। হিন্দুসমাজের ঠিক সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। একদিন যখন ব্রাহ্মণেরা অতিশয় স্থিতিশীল হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন বৌদ্ধ-বিপ্লব উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু উদারমতি শঙ্করাচার্য্যের বুদ্ধিবলে ও অদ্বৈতবাদের

মোহিনী-শক্তিতে সে প্রকাণ্ড বিপ্লবও প্রতিহত হইল। গুরুগোবিন্দ ও চৈতন্য আর দুইবার এই অচল সাগরে তরঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে তরঙ্গ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।

এক্ষণে প্রকৃতের অনুসরণ করি। সমাজ-সংস্কার বা সমাজ-বিপ্লব এই দুইএরই ভিত্তি-ভূমি চরিত্র। জাতীয় চরিত্র সুদৃঢ় না হইলে সংস্কারে বা বিপ্লবে প্রবৃত্তিই জন্মিতে পারে না। শুদ্ধ নেতার মনে সে প্রবৃত্তি জন্মিলে সংস্কার বা বিপ্লব সাধিত হইতে পারে না। জাতীয় মন সংস্কার বা বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত না হইলে, শুদ্ধ নেতা একাকী কি করিতে পারেন? সমস্ত জাতি যখন গমনোদ্যত হইবে, নেতা তখন পথদর্শক হইয়া তাহাদিগকে লইয়া যাইতে পারেন। সেই জাতীয় প্রবৃত্তি—জাতীয় চরিত্রের ফলমাত্র।

যখন জাতিসাধারণ সৎ ও অসৎ বুঝিতে শিখিবে, এবং বুঝিয়া সতের অনুসরণ করিতে শিখিবে, তখনই প্রকৃত জাতীয় উন্নতি আরম্ভ হইবে। যে ব্যক্তি জগতে আসিয়া কিছুই করিতে চাহে না—পশুদিগের ন্যায় ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি করিয়াই পরিতৃপ্ত, তাহার ভাল মন্দ বিচারে শক্তি থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে জগতের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। যাহার সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি নাই, তাহার কোন্‌টী সৎকার্য্য জানিয়া বিশেষ লাভ কি? সেইরূপ যে জাতি বা যে সমাজ জড়বৎ থাকিতে চাহে, সে সমাজের বা জাতির সদসৎজ্ঞানে বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। যে অবিরাম চক্ষু বুজিয়া থাকিতে চাহে, তাহার চক্ষুষ্মত্তা বিড়ম্বনা মাত্র। সেইরূপ যে সমাজ বা জাতি চক্ষু থাকিতেও দেখিতে চাহে না, তাহার চক্ষু থাকা বিড়ম্বনা মাত্র।

হিন্দুসমাজের অবস্থা ঠিক এইরূপ। হিন্দুসমাজ চক্ষু থাকিতে অন্ধ। সদসৎবিবেক-বিহীন না হইয়াও সতের অনুসরণে প্রবৃত্তি-বিহীন। যে সকল সুশিক্ষিত লোক সংস্কারের একান্ত আবশ্যকতা স্বীকার করেন, তাঁহারা সেই সংস্কারকার্য্যে শুদ্ধ যে প্রবৃত্তিবিহীন এরূপ নহে, কেহ প্রবৃত্তিমান্ হইলে তাহাকে সবিশেষ নির্যাতন করিয়া থাকেন। আপনারা যে সকল কার্য্য করিতে ইচ্ছুক কিন্তু অক্ষম, অন্যে যদি তাহা করে, তাহাকে সমাজবহিষ্কৃত করিয়া দিবেন, তাহাকে

কুক্কুরের ন্যায় ঘৃণা করিবেন। আমরা এক একটী করিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া পাঠকগণকে বুঝাইয়া দিব। প্রথমতঃ, সুশিক্ষিত যুবকমাত্রই স্বীকার করেন যে, সাহেবেরা যে সকল অধিকার একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন, যদি বিলাতী পরীক্ষাদি উত্তীর্ণ হইয়া ভারতযুবক সেই সকল অধিকার সাহেবদিগের মুখ হইতে ক্রমে ক্রমে কাড়িয়া লইতে পারেন, তাহা-হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করা হইবে। এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু যে হিন্দু যুবক এই অসাধ্য-সাধন করিয়া দেশে প্রত্যাগত হইবেন, শিক্ষিতম্মন্য নব্য সম্প্রদায় তাঁহাকে সমাজগণ্ডীবহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। তাঁহারা একজন সাহেবকেও যে ভাবে গ্রহণ করিবেন, এক-জন বিলাত-প্রত্যাগত যুবককেও প্রায় সেই ভাবে গ্রহণ করিবেন। ইহার পরিণাম—অন্তর্ব্বিপ্লব ও অন্তর্জাতীয় বিদ্বেষ। তুমি যখন একজনকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে, তখন তোমার সমাজের উপর তাঁহার পূর্ণ মমতা হওয়ার সম্ভাবনা কি? তোমার সহিত আহার ব্যব-হার ও আদান প্রদান করার যখন তাঁহার অধিকার রহিল না, তখন তাঁহার পক্ষে সামাজিক সম্বন্ধে তুমিও যাহা, একজন বৈদেশিকও তাহা। তুমি বলিয়া থাক যে, হিন্দুসমাজ দুই দশ হাজার লোককে সমাজ-বহি-ষ্কৃত করিতে ভীত হয় না। কারণ, অনন্ত সাগর হইতে কতিপয়-কুম্ভ-পরিমিত জল লইলে যেমন সাগরের কোন ক্ষতি হয় না, সেইরূপ পঞ্চ-দশকোটী হিন্দুসমাজ হইতে দুই দশ হাজার হিন্দুকে সমাজবহিষ্কৃত করিলে হিন্দুসমাজের কোনও ক্ষতি হইবে না। এরূপ ভ্রমাত্মক কথা—অনেক সুশিক্ষিত লোকের মুখেই শুনিয়াছি। কিন্তু তাঁহাদিগের বিবে-চনা করা উচিত—যে যাহা সসীম, সীমা কমিলেই, তাহা সঙ্কীর্ণতর ও দুর্ব্বলতর হইবে। বিশেষতঃ বিদ্যা বুদ্ধি ধন মান ও পদে যাঁহারা শীর্ষ-স্থানীয়, তাঁহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে—হিন্দুসমাজ মস্তক-হীন হইয়া পড়িবে।

দ্বিতীয়তঃ, বহুদিন হইতে শিক্ষিতমণ্ডলী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্র ও যুক্তির অনুমোদিত। এ বিষয়ে বক্তৃতা বা রচনা করিতেও তাঁহারা ত্রুটি করেন নাই এবং করিতে-

ছেনও না। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কয়জন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যুক্ত আছেন? কার্য্যে পরিণত করা দূরে থাকুক, যাঁহারা ইহার ঐকান্তিক আবশ্যকতা স্বীকার করেন, যিনি ইহা কার্য্যে পরিণত করিবেন—তাঁহারা তাঁহাকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদানপূর্ব্বক সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। তাঁহারা বিধবা ভগিনী বা বিধবা কন্যার ভ্রূণহত্যা-বিষয়ে সহায়তা করিবেন, তথাপি তাহাদিগের বিবাহ দিবেন না। বেশী চাপিয়া ধরিলে উত্তর দিবেন—'সময় আসিলে আপনিই হইবে, চেষ্টা করিয়া সময় আনা যায় না ইত্যাদি।' অলস বা কপটীর ইহা অপেক্ষা সুখকর ও সুবিধাজনক উত্তর আর নাই।

তৃতীয়তঃ, সাম্যবাদীরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, অকারণ বিষাক্ত শ্রেণীবিভাগ জগতের সমূহ ক্ষতিকারক। এক সময়ে ব্রাহ্মণেরা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে ভারতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সেইরূপ রণবিষয়িণী প্রতিভায় ক্ষত্রিয়েরা, বাণিজ্যবিষয়িণী প্রতিভায় বৈশ্যগণ শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং নিম্নতর শ্রেণী হইতে উচ্চতর শ্রেণীর প্রাধান্য বিনা আপত্তিতে স্বীকৃত হইত। কিন্তু এক্ষণে কালবশে সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রেণীগত উৎকর্ষ বিলুপ্তপ্রায়, অথচ শ্রেণীবিভাগ পূর্ব্বের ন্যায়ই কঠোর রহিয়াছে। সুশিক্ষিত সম্প্রদায় ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং বুঝিতে পারিয়া এই শ্রেণী-বৈষম্যের বিরুদ্ধে বক্তৃতাদি করিতেছেন। অনেকেই বলিয়া থাকেন, যতদিন ভিন্ন শ্রেণীর উপযুক্তগণের মধ্যে অন্তর্জাতীয় বিবাহাদি প্রচলিত না হইবে, ততদিন ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির আশা নাই। অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি গুপ্তভাবে বিভিন্ন বর্ণের সঙ্গে একত্র আহারাদি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কয়জন প্রকাশ্যরূপে তাহা করিতে প্রস্তুত আছেন? অধিক কি, কয়জন এক বর্ণের ভিতর সমভাবে ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন? যিনি কুলীন-বংশ-জাত, তিনি নবগুণযুত বংশজকে কন্যাদানে কিছুতেই সম্মত হইবেন না। রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক প্রভৃতি যেন এক একটী স্বতন্ত্র বর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন পার্থক্য নাই—কোন উৎকর্ষভেদ নাই. অথচ যেন পরস্পর পরস্পরের

অস্পৃশ্য—পরস্পর পরস্পর হইতে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর দ্বারা পৃথক-কৃত। আমরা চতুর্দ্দিকে রাজনৈতিক আন্দোলনের ধ্বজা উড়াইতেছি; বৈদেশিক শাসনকর্ত্তাগণের যশোগানে গগন প্রতিধ্বনিত করিতেছি, কিন্তু ভারতের একতার মূলীভূত অন্তরায়নিচয়ের দিকে একবারও তাকাইতেছি না। বক্তৃতার সময় বলিতেছি, ভারতের একতা চাই, কিন্তু কার্য্যের সময় ঘোরতর বৈষম্যবাদী।

এইরূপ প্রতি বিষয়েই আমরা কপটাচারী। বাক্যের সহিত আমাদের কার্য্যের কোন সামঞ্জস্য নাই। সামঞ্জস্য রাখিবার আমরা চেষ্টাও করি না। যাহা ভাল বলিয়া স্বীকার করি ও মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করি, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সৎসাহস আমাদের নাই। সামান্য নির্যাতন-ভয়ে আমরা গুরুতর কর্ত্তব্য হইতে স্খলিত হই। আমরা যাহা পারি না, অপরে যদি তাহা করিতে সাহস করে, আমরা তাহাকে নির্যাতন করিতেও লজ্জা বোধ করি না। কপটাচার যে চরিত্রের ঘোর কলঙ্ক, তাহা জানিয়াও আমরা তাহাকে সযত্নে পোষিত করি। যে যে পরিমাণে কপটাচারী, সমাজে সে সেই পরিমাণে আদৃত। যে সত্যের অনুরোধে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে স্বীকৃত মত কার্য্যে পরিণত করিবে, সমাজ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে। যে সমাজে সত্যের এরূপ অনাদর—চরিত্রের উচ্চ আদর্শের এরূপ অবমাননা—সে সমাজের প্রকৃত উন্নতি এখনও অনেক দূরে রহিয়াছে। যাঁহারা স্বার্থসাধনোদ্দেশে সমাজের কেবল তোষামোদ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সমাজের প্রকৃত বন্ধু নহেন। যাঁহারা সমাজের ক্ষতস্থান দেখাইয়া দেন, এবং সেই ক্ষতের শোষক ঔষধি বলিয়া দেন, তাঁহারাই সমাজের প্রকৃত বন্ধু। ঔষধের ন্যায় তাঁহাদিগের বাক্য আপাততঃ তিক্ত লাগিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা পরিণামে নিশ্চয়ই মিষ্ট লাগিবে; এই জন্য বলিতেছি যে, যদি জাতীয় উন্নতি চাহ, তাহা হইলে অগ্রে জাতীয় চরিত্র উন্নত করিতে চেষ্টা কর। চরিত্রগত কপটতা, ও নীচতা থাকিতে, জাতীয় উন্নতি হইবে না। অন্তঃসারশূন্য বাহ্য আড়ম্বরে কখন কোন জাতির উন্নতি হয় নাই—হইবেও না।

স্বায়ত্ব-শাসন-প্রণালী।

—*০০০০০*—

'স্বায়ত্ব-শাসন' এই কথা শুনিলে, বোধ হয়, অনেকের মনেই এক অভুতপূর্ব্ব আনন্দ উদিত হইবে। আজ একশত বৎসরের কিঞ্চিদধিক হইল, আমরা ইংরাজ-জাতির অধীনে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মশাসনে বঞ্চিত হইয়াছি। অনেকের সংস্কার আছে যে, আমরা মুষলমান রাজত্বের কাল হইতে আত্মশাসনাধিকার-চ্যুত হইয়াছি; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। মুষলমানের রাজত্ব ভারতের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হয় নাই। দিল্লীতে মুষলমান সম্রাট্ ছিলেন সত্য, নানা প্রদেশে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগের তাদৃশী কেন্দ্রীকরণী শক্তি বা কেন্দ্রীকরণের তাদৃশ ইচ্ছাই ছিল না। যাহাকে ইংরাজীতে সেণ্ট্রালিজেশন বলে, তাহাকেই আমরা বাঙ্গালায় কেন্দ্রীকরণ বলিলাম। যাহাতে সমস্ত শাসনরজ্জু মধ্যস্থ এক পুরুষের হস্তে রক্ষিত হয়, তাহাকেই আমরা কেন্দ্রীকরণী শাসনপ্রণালী বলি। ভারতের এখনকার এই মধ্যস্থ পুরুষ ষ্টেট্ সেক্রেটারী। ইনি বিলাতে থাকিয়াও এই বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের শাসন-রজ্জু সকল স্বকরে সংযমিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না বটে, কিন্তু প্রণালীগত পরিবর্ত্তন ও যুদ্ধবিগ্রহাদি সমস্তই তাঁহার অনুমতিসাপেক্ষ। ভারতের গবর্ণর-জেনেরেল ভারতের মঙ্গলের জন্য কোন কর স্থাপনা করিতে গেলেন, তাহাতে ম্যানচেষ্টারের ক্ষতি হয় দেখিয়া ষ্টেট্সেক্রেটারী অমনি তাহাতে ভিটো দিয়া বসিলেন। যেখানেই ইংলণ্ডের স্বার্থের সহিত ভারতের স্বার্থসংঘর্ষ উপস্থিত হয়, সেই থানেই তিনি হস্তক্ষেপ করিয়া ইংলিশ-স্বার্থরক্ষা করেন। ভারতের আভ্যন্তরীণ সকল-বিষয়ের প্রভুশক্তির কেন্দ্র ভারতের গবর্ণর-জেনেরেল। তিনি একা সব কাজ করিয়া উঠিতে পারেন না বলিয়া গবর্ণর, লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণর, কমিশনর, জজ, মাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতি দ্বারা সেই সমস্ত কাজ করাইয়া লন। কিন্তু সেই সকল কার্য্যের দোষ-গুণাদি-বিচার ও

প্রণালীগুত পরিবর্ত্তনাদিরূপ প্রকৃত শাসনসূত্র নিজের হস্তে রাখেন। এই কেন্দ্রীকরণী শক্তি ইংরাজদিগের হস্তে যেরূপ পরিপুষ্ট হইয়াছে, আর কোন জাতির হস্তে সেরূপ হয় নাই।

মুষলমানদিগের সময়ে প্রত্যেক জমিদার এক একটী ক্ষুদ্র করদ রাজা ছিলেন। তাঁহার দেয় কর দিয়া অন্যান্য আভ্যন্তরীণ সমস্ত বিষয়েই পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। নিজ প্রজাগণের উপরে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা ছিল। তিনি তাহাদিগের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন। প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত দিবার তাঁহার অধিকার ছিল। ইংরেজদিগের রাজত্বকালের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, নাটোর, পুঁটিয়া, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণের এই অধিকার ছিল। এক এক জনের অধীনে দুই একটী করিয়া জেলা ছিল। সেই সমস্ত প্রদেশের দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্বসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে তাঁহাদিগের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। নবাব এই সকল কর আদায় করিয়া দিল্লীর দরবারে পাঠাইতেন মাত্র। জমিদারেরা শুদ্ধ কর দিতেন, এরূপ নহে; প্রয়োজন হইলে, নবাব ও সম্রাট্‌কে সৈন্য দিয়াও সাহায্য করিতেন। এই প্রণালীর সহিত ইউরোপীয় অতীত সামন্ততান্ত্রিক প্রণালীর (Feudal system) অনেক সাদৃশ্য আছে। সামন্ততন্ত্রে যেমন সামন্তেরা (Barons) দুর্গ-নির্ম্মাণ ও স্থায়ী সেনা রাখিতে পারিতেন, জমিদারগণও সেইরূপ পারিতেন। প্রাচীন জমিদারগণের পরিখা-প্রাকার-পরিবেষ্টিত পুরী সকল আজও কিয়ৎ পরিমাণে তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এই সময়ে শুদ্ধ যে জমিদারগণই আভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ে স্বাধীন ছিলেন, এরূপ নহে। প্রজারাও আপন আপন গ্রামে আভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ে স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। পঞ্চায়তপ্রণালী তাহার নিদর্শন। গ্রামের পঞ্চায়তগণ গ্রামের দেওয়ানী ও ফৌজদারী সমস্ত মকদ্দমাই নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন। কেবল যে সকল সাঙিন্ ফৌজদারী মকদ্দমায় তাঁহাদিগের অধিকার নাই, তাহাই রাজদরবারে যাইত, গ্রামের চৌকিদার পুলিশের কাজ করিত, এবং সতত পঞ্চায়-

তের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকিত। চৌকিদারের বেতন রাজাকে চৌকিদারী আইন জারী করিয়া প্রজাগণের নিকট হইতে আদায় করিয়া দিতে হইত না। প্রজারা পঞ্চায়তের হুকুমে আপন হইতে তাহা প্রদান করিত। রাজাকে গ্রামের রাস্তাঘাট-প্রস্তুত ও বিদ্যালয়াদির জন্য পথকর ও শিক্ষাকর প্রভৃতি নির্দ্ধারিত করিয়া রাস্তাঘাট-প্রস্তুত ও বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে হইত না। গ্রামের লোকেই আপনা হইতে আপন আপন অবস্থানুসারে এই সকল কার্য্যের জন্য কিছু কিছু করিয়া চাঁদা দিতেন। তাহাতেই এই সকল বিষয় সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। প্রকৃত প্রস্তাবে এক একটী পল্লীসমাজ এক একটী ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র-স্বরূপ ছিল। এক্ষণে লর্ড রিপণ যে যে বিষয় স্থানীয় বোর্ডের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন, পল্লীসমাজ তাহা অপেক্ষাও অনেক বিষয় আপনাদিগের আয়ত্ত রাখিয়াছিলেন। সকলে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, সমস্ত মুসলমানসাম্রাজ্যকালে অতি অল্প সংখ্যক দায়াধিকার-বিষয়ক মকদ্দমাই মুসলমান দেওয়ানী আদালতে রুজু হইয়াছিল! তাহার একমাত্র কারণ,—এই পল্লীসমাজ।

এই পল্লীসমাজ বিকেন্দ্রীকরণ-প্রণালীর চরম নিদর্শন। যাহাকে ইংরাজিতে ডিসেণ্ট্রালিজেশন্ বলে, তাহাকেই আমরা বিকেন্দ্রীকরণ-প্রণালী বলিলাম। রাজ্যের অংশ সকলকে কেন্দ্রস্থ প্রভুশক্তির অধীনতা হইতে বিচ্যুত করাকে বিকেন্দ্রীকরণ-প্রণালী কহে। ভারতের প্রতি পল্লী কেন্দ্র-চ্যুত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল।

ভারতীয় পল্লীসমাজের সহিত রুসীয় নাগরিক সমাজের উৎকৃষ্ট তুলনা হইতে পারে। রুস্যিার প্রত্যেক মিউনিসিপালিটীকে এক একটী নাগরিক সমাজ বলিয়া উল্লেখ করিলাম। প্রত্যেক রুসীয় মিউনিসিপালিটী আভ্যন্তরীণ সকল বিষয়েই সম্রাট হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সম্রাট দুর্দ্দান্ত হউন্, সাধু হউন্, মিউনিসিপালিটীর তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। মিউনিসিপালিটীর সঙ্গে সম্রাটের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তাঁহারা আপন আপন কর ধার্য্য ও আপন আপন-আইন প্রস্তুত করিয়া আপন আপন রাজত্ব চালাইয়া থাকেন। এই জন্যই

রুসীয় সম্রাটগণের দুর্ব্বিষহ অত্যাচার সত্ত্বেও রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে না। এই জন্যই ভারতের মুষলমান-সাম্রাজ্যকালে দুর্ব্বিষহ অত্যাচার সত্ত্বেও প্রজাবিপ্লব ঘটে নাই। অধীনতার মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা সহ্য করে নাই বলিয়াই, প্রজারা প্রশান্তভাবে ছিল। কিন্তু এক্ষণে সে পল্লীস্বাতন্ত্র্য কোথায়? প্রচণ্ড ইংরাজ কেন্দ্রীকরণ-শক্তির নিকটে সে বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এক্ষণে সে পঞ্চায়ত নাই, সে পল্লীসমাজ নাই। মুষলমান-রাজত্বের ছয় সাত শতাব্দীতে যাহা অটুট ছিল, ইংরাজ-রাজত্বের এক শত বৎসরে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। এখন নূতন পঞ্চায়ত গঠিত হইতেছে বটে, কিন্তু সে বিড়ম্বনা-মাত্র। ভাঙ্গা যত সহজ, গড়া তত সহজ নহে। যে প্রাচীন সুন্দর স্বায়ত্তশাসনপ্রণালীসৌধ ভাঙ্গিয়া ইংরাজ চুরমার করিয়াছেন, আজ তিনি তাহা গড়িতে বসিয়াছেন। মনুর সময়ের পূর্ব্ব হইতেও যে ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল, আজ কোন কোন ইংরাজ সেই ভারতের অধিবাসিবৃন্দকে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালীর সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। ইহার কারণ, তাঁহাদিগের ভারতের পুরাবৃত্তে পূর্ণ অনভিজ্ঞতা। ইংরাজ-রাজত্বের পূর্ব্বে কোন প্রভুশক্তি ভারতে সর্ব্বাঙ্গীন আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই। হিন্দু-রাজত্বকালেও কোন হিন্দু সম্রাট্ ভারতের সর্ব্বত্র চিরস্থায়িনী প্রভুতা সংস্থাপন করিতে পারেন নাই। তাঁহার লক্ষ্যও তাহা ছিল না। তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল—যশ। বলবীর্য্যে ভারতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই—সকল ক্ষুদ্র রাজার মুখ দিয়া এই কথা বাহির করিয়া লইবার জন্যই তিনি দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইতেন; পরাজিত রাজ্য সকলে চিরস্থায়িনী প্রভুতা সংস্থাপন করিবার জন্য নহে। যে যে ক্ষুদ্র রাজা বৈতসী বৃত্তি অবলম্বন করিতেন, দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ সেই সেই রাজাকে স্ব স্ব স্থানে অবিচলিত রাখিতেন। যাঁহারা প্রতিকূলাচরণ করিতেন, তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদিগের সিংহাসনে অপর লোককে বসাইতেন। সে রাজ্য অটুট থাকিত, রাজা পরিবর্ত্তিত হইতেন মাত্র। অনেক সময় সম্রাট্ অশ্বমেধীয় ঘোটক পাঠাইয়াই, নিজের প্রতাপ পরীক্ষা করিতেন। সেই ঘোটকের কপালে

জয়-পতাকা বাঁধা থাকিত। যদি কেহ সেই ঘোটক ধরিত, তাহা হইলেই তাহার সহিত যুদ্ধ হইত। ঘোটকের ললাটে এই স্পর্দ্ধার কথা লেখা থাকিত যে, অমুক সম্রাট্ এই দিগ্বিজয়ী ঘোটক ছাড়িয়া দিয়াছেন। যদি পৃথিবীতে কেহ সংগ্রামে তাঁহার সমকক্ষ থাকেন, ত এই অশ্ব ধরুন। যদি কেহ সাহস করিয়া সেই ঘোটক না ধরিত, তাহা হইলেই তিনি সম্রাট বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। যদি কেহ ধরিতেন, সংগ্রামে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিলেই, তিনি সম্রাট্ বলিয়া অভিহিত হইতেন। এইরূপে কত শত সম্রাট্ ভারতে আধিপত্য-স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সেই সঙ্গে কত কত রাজ্যের রাজা পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন, তথাপি পল্লীসমাজের স্বাতন্ত্র্যের কোন ব্যাঘাত সংঘটিত হয় নাই। সে সকল ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্রগুলি নিবিষ্ট-চিত্তে আপন আপন আভ্যন্তরীণ উন্নতিসাধনে নিমগ্ন থাকিত। মাথার উপর দিয়া কত মেঘ চলিয়া গিয়াছে, অথচ সে গুলির গাত্র-স্পর্শ করে নাই। যে পল্লী-সমাজ-রূপ স্তম্ভশ্রেণীর উপরে ভারত-সাম্রাজ্যের ছাদ সংন্যস্ত ছিল, হিন্দু মুষলমান উভয়-রাজত্বকালেই সে স্তম্ভ-শ্রেণীর উপরে হাত পড়ে নাই। সে পাকা গাঁথনী ভাঙ্গিবার কাহারও সাধও হয় নাই। এই জন্য এতবার ছাদ পরিবর্ত্তিত হওয়াতেও, ভারত-সাম্রাজ্য-সৌধের দৃঢ়তা বা সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হয় নাই। পরিবর্ত্তনে প্রজাবৃন্দের আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ, পালবংশ, পাঠানবংশ, মোগলবংশ প্রভৃতি কত রাজবংশ অভ্যুদিত হইয়া কালে অস্তমিত হইয়াছে। এইরূপে ভারত-সাম্রাজ্য-সৌধের কতবার ছাদ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু সে সৌধের পল্লীসমাজ-রূপ স্তম্ভশ্রেণী বরাবর একই ভাবে চলিয়া আসিতেছিল; এমন সময়ে প্রকাণ্ড সৌধ ইংরাজের হাতে পড়িল। প্রতাপান্বিত ইংরাজের চক্ষে পল্লীসমাজ শূল-স্বরূপ হইয়া উঠিল। তিনি সে সুন্দর ও সুদৃঢ় স্তম্ভরাজি একটী একটী করিয়া সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং পাছে সে প্রকাণ্ড ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়ে, এই ভয়ে চাড়া দিয়া তাহা রক্ষা করিতে লাগিলেন। আজ এক শত বৎসরের কিঞ্চিদধিক ভারত-সাম্রাজ্য-সৌধের প্রকাণ্ড ছাদ এই

চাড়ার উপরে রহিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, ইংরাজ সার্ভিস্‌ই সেই চাড়া। একশত বৎসরের পর, আজ বিজ্ঞ রিপণ বুঝিয়াছেন—এরূপ ক্ষীণ চাড়ার উপরে এরূপ প্রকাণ্ড ছাদ বেশী দিন থাকিতে পারে না। তাই আজ তিনি ভারতবাসীদিগকে স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণালী দিতে উদ্যত হইয়াছেন। যে আভ্যন্তরীণ পূর্ণ স্বাধীনতা ইংরাজজাতি ভারতবাসীর হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন, আজ মহামতি লর্ড রিপণ তাহার কিয়দংশ তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তাই আজ তিনি প্রতি জেলায় এক একটী প্রাদেশিক সমিতি নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। কিন্তু এই নগর-সমাজ-গুলিকে পল্লীসমাজের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করা আপাততঃ লর্ড রিপণের অভিপ্রায় নয়। পল্লীসমাজের যেমন সকল-বিষয়েই স্বাতন্ত্র্য ছিল, এই নগর-সমাজ-গুলির সেরূপ স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না। আপাততঃ এই নগর-সমাজের হস্তে অতি সামান্য ভারই অর্পিত হইতেছে। রথ্যাকর, পূর্ত্তকর লইয়া ইহাঁরা রাস্তা ঘাট ও অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করাইতে পারিবেন, এবং ডিস্‌পেন্‌সেরী, হাঁসপাতাল ও বিদ্যালয়াদির পরিদর্শন ও আয়-ব্যয়াদির সংযমন করিতে পারিবেন। পল্লীসমাজ যে সকল অধিকার ভোগ করিয়াছিল, তাহার সহিত তুলনায় ইহা যৎসামান্য মাত্র। তথাপি অনেক ইংরাজ বলিতেছেন, দেশীয়েরা অধিকারের সদ্ব্যবহার করিতে পারিবেনা। ইহার অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, যখন লর্ড রিপণ সে সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়া প্রাদেশিক সমাজ সকল সংস্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তখন কি উপায়ে তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতে হইবে।

এই সঙ্কল্প-সিদ্ধির প্রধান উপায়—উপযুক্ত সভ্য-নির্ব্বাচন। ইহা অতি দুরূহ ব্যাপার। পল্লীসমাজ যখন পূর্ণাবয়ব ছিল, তখন সভ্য-নির্ব্বাচন করা তত দুরূহ ব্যাপার ছিল না। তখন প্রতি গ্রামে গ্রামে আত্ম-ভার-বহন-ক্ষম অনেক লোক পাওয়া যাইত। তখন নিজের খাওয়া দাওয়া ও পরিবার প্রতিপালন করা ভিন্ন মানুষের জীবনের মহত্তর লক্ষ্য আছে, ইহা ভাবিবার লোক প্রতি গ্রামেই পাওয়া যাইত। তখন

গ্রামের মণ্ডলেরা নিজ নিজ পারিবারিক ও বৈষয়িক কার্য্য সম্পাদন করিয়া, দিবসের কিয়দংশ গ্রাম্য-বিষয়ে অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য মনে করিতেন। তখন পরহিত-ব্রতে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ লোক খুঁজিলে, প্রতি গ্রামেই দুই একটী করিয়া পাওয়া যাইত। তখন নিজ স্বার্থ পরস্বার্থের জন্য বলি দিতে পারেন, এরূপ লোক ভারতে অলীক ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইত না। কিন্তু সে সৌভাগ্যের দিন এখন চলিয়া গিয়াছে। ভারতের সুখসূর্য্যের সঙ্গে সে সকল শুভকমল নিমীলিত হইয়াছে। যাহা গিয়াছে, তাহার আন্দোলন ভাল, কিন্তু তাহার অনুশোচনা বৃথা। সুতরাং যাহা গিয়াছে, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিয়া কি হইতে পারে, আমরা তাহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলাম।

ইংরেজেরা আপনাদিগের ভুল বুঝিতে পারিয়া পূর্ব্ব হইতেই স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালীর সূত্রপাত করিয়াছিলেন। মিউনিসিপালিটী বা নাগরিক সমাজ ও আধুনিক গ্রাম্য পঞ্চায়ত তাহার নিদর্শন; কিন্তু এই দুইটীই পুরা-প্রচলিত স্বায়ত্ত শাসন-প্রণালীর ছায়ামাত্র। নাগরিক বিষয় ভিন্ন প্রাদেশিক-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার মিউনিসিপালিটীর নাই। তাহার উপরে আবার অতি অল্পস্থানেই ইহা প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা দ্বারা জাতি-গত অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে না। আবার প্রাচীন পঞ্চায়তস্থলে অধুনা যে নব পঞ্চায়ত প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, তাহা দ্বারাও এ অভাব পূরণ হইতে পারে না। প্রতি গ্রামে যে পঞ্চায়ত নব প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, তাহা গ্রামের মণ্ডল-বহুল নহে। যাঁহাদিগকে গ্রামের সকলেই প্রধান বলিয়া জানে, তাঁহাদের হাতে নির্ব্বাচন না থাকায়, সে সকল লোক ইহাতে বড় প্রবেশ লাভ করিতে পারেন না। পুলিশ সর্ব্বে-সর্ব্বা। পঞ্চায়ত নির্ব্বাচন-কার্য্য প্রায় পুলিশ দ্বারাই হইয়া থাকে। সুতরাং যে সকল অভিসন্ধি-বিশিষ্ট লোক স্বার্থসাধনের জন্য পুলিশের সঙ্গে হৃদ্যতা রাখে, তাহারাই প্রায় নির্ব্বাচিত হয়। সুতরাং বর্ত্তমান পঞ্চায়ত —প্রধানত্বের পরিচায়ক নহে। কোন কোন স্থানে এরূপও ঘটে যে, সম্ভ্রান্ত লোকের উপরে এই কাজের ভার দিতে চাহিলেও তাঁহারা লইতে চান না। ইহার দুইটী কারণ আছে। প্রথম কারণ এই যে,

ইহাদিগের উপরে যে কার্য্যভার ন্যস্ত হয়, তাহা অতি সামান্য, ও সামান্য লোকের সাধ্য; সুতরাং এ কাজে অর্থের আশাও নাই, মান সম্ভ্রমেরও আশা নাই। সুতরাং সম্ভ্রান্ত লোকে কিসের আশায় পঞ্চায়তের কার্য্যভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইবেন? তদ্ভিন্ন আর একটী প্রধান অসুবিধা এই যে, চৌকিদারেরা কথায় কথায় তাঁহাদিগকে আদালতে হাজির করিয়া থাকে। ইহা মানী লোকে অতিশয় অবমান মনে করিয়া থাকেন। এই জন্য ইঁহারা নিজে ইহাতে কিছুতেই প্রবিষ্ট হইতে চাহেন না। ঘটনাক্রমে যদি দুই একজন প্রবিষ্ট হন, তাঁহারা বাহির হইবার জন্য আকুলিত হন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান পঞ্চায়ত-গুলিকে আমরা অধুনা-প্রস্তাবিত স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালীর ভিত্তি-স্বরূপ করিয়া লইতে পারি না। এক্ষণে আমাদিগের কি কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে আমাদের মতামত নিম্নে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

সেন্সস্ সেডিউল বা লোক-গণনার তালিকা দেখিলে জানা যাইবে, কোন্ গ্রামে কত লোকের বসতি। লোক-সংখ্যা-অনুসারে প্রতি গ্রামের নির্ব্বাচকের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। গ্রামের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, লিখন-পঠন-সমর্থ অধিবাসীকেই এই নির্ব্বাচক মনোনীত করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে। প্রতিগ্রামে এক একটী ফুটো বাক্স চাবী দিয়া চৌকিদার হস্তে প্রেরণ করিতে হইবে। চৌকিদার ঢোল পিটাইয়া ঘোষণা করিবে যে অমুক২ দিনের মধ্যে গ্রামের প্রত্যেক প্রাপ্ত-বয়স্ক ও লিখন-পঠন সমর্থ অধিবাসীকে তাঁহার নাম ও তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধি নির্ব্বাচকের নাম লিখিয়া সেই বাক্সে ফেলিয়া দিতে হইবে। সেই সময়ের মধ্যে যাঁহারা নাম লিখিয়া না দিবেন, তাঁহারা সেবারকার মত নির্ব্বাচক মনোনীত করণের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইবেন। এইরূপে সংগৃহীত টিকিটের অধিকাংশে যাঁহার নাম পরিদৃষ্ট হইবে, তিনিই সেই গ্রামের নির্ব্বাচক বলিয়া গৃহীত হইবেন। যে গ্রামে অধিক লোকের বসতি, সে গ্রামের চৌকিদারের সংখ্যানুসারে নির্ব্বাচকের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিলেও চলিবে। ভোটের সংখ্যানুসারে পর পর ধরিয়া অতিরিক্ত নির্ব্বাচক মনোনীত করিলেই ঠিক হইবে।

অথবা যদি পল্লী-বিভাগ স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহা হইলে প্রতি পল্লীর লোক সংখ্যানুসারে এক এক বা ততোধিক ব্যক্তি নির্ব্বাচক মনোনীত হইতে পারেন।• নির্ব্বাচক-মনোনীত-করণে একমাত্র সম্পত্তির প্রভুতা থাকা উচিত নহে। তাহা হইলে যোগ্যতার অবমাননা করা হয়। কারণ গ্রামে এমন লোক থাকিতে পারেন, যিনি সম্পত্তিশালী নহেন, অথচ গ্রামের সকলেই তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যোগ্য বলিয়া মনে করেন। এরূপ লোক বাদ পড়িলে, ইষ্ট-নাশের বিশেষ সম্ভাবনা।

আপাততঃ প্রতি জেলার রাজধানীতে একটী করিয়া সাময়িক শাসন-সমিতি নিযুক্ত করিতে হইবে। এই সাময়িক-শাসন-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচনের ভার ম্যাজিষ্ট্রেট্ বা মিউনিসিপাল কমিশনরগণের হস্তে দিলে চলিবে। এই সাময়িক সমিতি স্থির করিবেন, কোন্ কোন্ থানা হইতে স্থানীয় শাসন-সমিতিতে কত গুলি করিয়া সভ্য লওয়া যাইবে। প্রত্যেক গ্রামে কয় জন করিয়া নির্ব্বাচক মনোনীত হইবে, এই সমিতি ইহাও স্থির করিয়া দিবেন।

প্রতি থানার এলাকার গ্রাম্য-নির্ব্বাচকগণের নামের একটী করিয়া তালিকা সেই সেই থানায় থাকিবে। থানার সব্ ইন্স্পেক্টর পত্র দ্বারা সেই নির্ব্বাচকগণকে জানাইবেন যে, তাহারা কোন নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে স্ব স্ব নাম ও তাঁহারা যাঁহাদিগকে জেলার শাসন-সমিতির সভ্য মনোনীত করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়া দেন। এইরূপে সংগৃহীত কাগজে যাঁহাদিগের অনুকূলে অধিক ভোট উঠিবে, তাঁহারাই জেলার শাসন-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন। নাগরিক-নির্ব্বাচন-প্রণালী টীও গ্রাম্য নির্ব্বাচন-প্রণালীর ন্যায় অনুষ্ঠিত হইবে। সমস্ত নগরবাসী যে সকল নাগরিককে নির্ব্বাচক নিযুক্ত করিবেন, তাঁহারাই আবার জেলার শাসন-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন। হাকিম, উকিল, মোক্তার, শিক্ষক, মিউনিসিপাল কমিশনর ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সকলকেই মনোনীত করার অধিকার নাগরিক নির্ব্বাচকদিগের হস্তে অনিয়ন্ত্রিত-ভাবে থাকিবে।

এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সমস্ত সভ্য-সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ মাত্র সভ্য জেলার শাসন-সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন। গবর্ণমেণ্ট দেশীয় কর্ম্মচারিগণের মধ্য হইতে সেই সকল প্রতিনিধি সভ্য মনোনীত করিবেন। এইরূপে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি সভ্যগণ মিলিত হইয়া জেলার শাসনসমিতির কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবেন। সভাপতি, সহকারী সভাপতি, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক প্রভৃতি সমস্তই তাঁহারা নির্ব্বাচিত করিবেন। তাঁহারা সাধারণতঃ আপনাদিগের মধ্য হইতেই সভাপতি প্রভৃতি মনোনীত করিবেন, কিন্তু ইচ্ছা হইলে, বাহির হইতেও উচ্চদরের লোক বাছিয়া লইতে পারিবেন। যখন ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে, ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়ার শক্তি সভ্যগণের হস্তে রহিল, তখন * * * উচ্চমনা দুই এক জন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে সভাপতির পদে অভিষিক্ত করায়, কোনও বিপদের সম্ভাবনা নাই, বরং বলোপচয়ের সম্ভাবনা। দেশের লোকের সহিত ইহাঁদিগের যেরূপ সহানুভূতি, তাহাতে যে ইহাঁরা প্রাণপণে ও একাগ্রচিত্তে দেশের মঙ্গল সাধন করিতে চেষ্টা করিবেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ইহাঁরা তাঁহাদিগের ক্ষমতার অপব্যবহার করিবেন, তাঁহাদিগের আনুপূর্ব্বিক চরিত্র দেখিয়া এরূপ অনুমান হয় না। ইহাঁরা এক এক জেলায় এইরূপে স্থানীয় শাসনসমিতি সংগঠিত করিয়া, তাহার কার্য্য সুচারুরূপে আরব্ধ করিয়া দিয়া, আবার অন্য জেলায় গিয়া সেই কাজ আরম্ভ করিতে পারেন। ২৪ পরগণা, হুগলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া, রাজসাহী, মুরশিদাবাদ, ঢাকা—এই সাতটী অগ্র-গত জেলায় এইরূপ বৈদেশিক সভাপতি মনোনীত করার আবশ্যকতা না থাকিতে পারে, কিন্তু অন্যান্য পশ্চাদ্বর্ত্তী জেলা সকলে লোকপ্রিয় ও লোকহিতৈষী ইউরোপীয় সভাপতি মনোনীত হইলে, ইহারা অগ্রগত জেলা গুলির সহিত শীঘ্রই সমকক্ষতা লাভ করিতে পারিবে। ইহাঁদিগের হস্তাবলম্বে স্থানীয় শাসনসমিতিসকল অচিরকাল-মধ্যে কার্য্যকরী প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে। পশ্চাদ্বর্ত্তী জেলা সকলে আজও জাতিগত ভাব তত পরিপুষ্ট হয় নাই। আজ সেই সকল স্থানের অধিবাসীরা যাহা অতি কষ্টে ও নিতান্ত অনিচ্ছায় করিবে, ক্রমে

অভ্যাস বশতঃ দুই এক বৎসরের মধ্যে তাহা তাহারা আপনা হইতে ও মনের স্ফূর্ত্তিতে করিতে শিখিবে। সেই অভ্যাসটী বদ্ধমূল হওয়া পর্য্যন্ত এক জন মজবুৎ চালক চাই। ইংরাজের মত মজবুৎ চালক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। দেশীয় চালক হইলে, কাজ হইবে না, একথা আমরা বলিনা। তবে দেশীয় চালক হইলে, ফল কিঞ্চিৎ বিলম্বিত হইবে মাত্র। কারণ, আমাদের দেশ এখনও সর্ব্বত্র দেশীয় শাসনকর্ত্তাকে সম্পূর্ণ মানিতে শিখে নাই। আমরা দুঃখের সহিত প্রত্যক্ষ জীবনে ইহা পদে পদে দেখিতেছি। যে পদে ইংরাজ অভিষিক্ত হইলে আমরা যেরূপ সম্মান করি, সেই পদে এক জন দেশীয় লোক অভিষিক্ত হইলে, আমরা আজও সেরূপ সম্মান দিতে শিখি নাই। বৈদেশিক শাসনকর্ত্তার হুকুম তামিল করিতে আমরা যেরূপ অগ্রপদ হই, দেশীয় শাসনকর্ত্তার হুকুম তামিল করিতে সেই পরিমাণ লজ্জা বোধ করি। এই ভাব পতিত জাতির প্রকৃতিসিদ্ধ লক্ষণ। যত আমাদের অধীনতায় ঘৃণা জন্মিবে, ততই এই ভাব সারিতে থাকিবে; এবং দিন দিন যে এ ভাব কিছু কিছু সারিতেছে, তাহাও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। কিন্তু পশ্চাদ্বর্ত্তী এমন অনেক জেলা আছে, যেখানে এ ঘৃণা এখনও অঙ্কুরিত হয় নাই। সেই সেই জেলায় আপাততঃ বৈদেশিক নেতার আবশ্যকতা আছে। সেই সেই জেলায় বৈদেশিক হস্তাবলম্ব ব্যতীত লোকে শীঘ্র উঠিতে পারিবে না। কিন্তু এরূপ সাহায্য যে বেশী দিন প্রয়োজন হইবে না, তাহা অখণ্ডনীয় সত্য। কিন্তু আপাততঃ বৈদেশিক নেতার আবশ্যকতা আছে বলিয়া, আমরা সেরূপ নেতা চাহি না—যিনি প্রভুশক্তি পাইয়া তাহার অযথা ব্যবহার করিবেন; যিনি নিজের ইচ্ছাই বিধি বলিয়া প্রচার করিবেন; যিনি প্রতিবাদ সহিতে নিতান্ত অক্ষম; অথবা যিনি প্রতিবাদ করিলে,প্রতিবাদীর সর্ব্বনাশ কবিতে কৃত-সঙ্কল্প,—না! আমরা মরিব সেও ভাল, তথাপি এরূপ নেতার অধীনে থাকিতে চাহি না;—যিনি অহর্নিশি মাথায় অঙ্কুশ মারিবেন,আমরা এমন মাহুত;—চাহি না;—যিনি লোকের হৃদয়ে কেবল পদাঘাত করিবেন, আমরা এমন কর্ত্তা চাহি না;—দেশীয়গণের প্রতি যাঁহারা নিরন্তর পাশব ব্যব-

হার করিবেন, তাঁহাদিগকে আমরা চাহি না ;—দেশীয় রক্তে পরিপোষিত হইয়াও যাঁহারা দেশীয় কল্যাণ ভাবিবেন না, আমরা এমন শাসনকর্ত্তা চাহি না ; যাহাদিগের শোণিতে পরিবর্দ্ধিত, যাঁহারা তাহাদিগের দুঃখে অশ্রুপাত করিতে জানেন না, আমরা তাঁহাদিগকে চাহি না ;—যাহাদিগকে শাসন করিতে আসিয়াছেন, যাঁহারা তাহাদিগের সহিত মিশিতে বা তাহাদিগের সুখ দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে সমর্থ নহেন, আমরা তাঁহাদিগকে চাহি না ;—যাঁহারা বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত হইয়া, প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য ভুলিয়া যান, আমরা তাঁহাদিগকে চাহি না :—যাঁহারা দেশীয়গণকে অসভ্য, নিগ্রো বা সেবাদাস বলিয়া ঘৃণা করেন, আমরা তাঁহাদিগকে চাহি না ;—আমরা সহস্র যুগ পড়িয়া থাকিব, বুকে হামাগুড়ি দিয়া সহস্র বৎসরে উঠিব, তবু এরূপ শাসনকর্ত্তা চাহি না ! কিন্তু যাঁহারা আমাদিগের হিতের জন্য স্বজাতিকে চটাইতেও ভীত নহেন, ও স্বজাতি-স্বার্থ বলি দিতেও পরাঙ্মুখ নহেন, যদি আমরা সেই বিশ্বপ্রেমিকগণের নিকটে মস্তক অবনত না করি, তাহা হইলে আমরা পামর ও কৃতঘ্ন। ইংলণ্ড রাজনীতি-বিষয়ে জগতের শিক্ষক। ইংলণ্ডের নিকটে প্রজাতন্ত্র-শাসন-প্রণালী সমস্ত ইউরোপ অবনত-মস্তকে শিখিতেছেন। ইংলণ্ড রাজনীতি-বিষয়ে এক দিন অগ্রগামিণী আমেরিকারও দীক্ষাগুরু ছিলেন। সেই জগদ্গুরু ইংলণ্ডের নিকটে রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষা লইব, তাহাতে আমাদের লজ্জা কি ?* আমরা যে স্বায়ত্তশাসন-প্রণালীর আজ আন্দোলন করিতেছি—ইংলণ্ডীয় সাহিত্যই আমাদিগকে তদ্বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছে। যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়ে দিন দিন অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইতেছে, সে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও ইংরাজী ইতিহাস আমাদের উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছে। সমস্ত ভারতের সমীকরণের ভাবও আমরা ইংরাজি সাহিত্য ও ইংরাজি শাসন-প্রণালী হইতে শিখিয়াছি। ভারত বহুদিনের

* ভারতীয় মহাসমিতি (Congress) মহামতি হিউম্, বাড্‌ল ও ওয়েডারবরণ প্রভৃতি ইংরাজগণকে ইহার নেতৃত্ব প্রদান করিয়া আমার এই উপদেশের সার্থকতা করিয়াছিলেন।

নেতৃত্বশ্রমে ক্লান্ত হইয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইংরাজ আসিয়া সেই ভারতকে জাগাইয়াছেন; জাগাইয়া সেই নিদ্রাভিভূতিকালে জগৎ যে যে বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা ভারতকে শিখাইতেছেন। নিদ্রার গভীরতায় ভারত পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানরাশি ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতিমাত্র অপরিস্ফুট ভাবে তাঁহার অন্তরে জাগরূক ছিল। ইংরাজ তাঁহাকে সে অপরিমিত জ্ঞানরাশির কথাও স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন; এবং যে সঞ্জীবন ঔষধে ইংরাজ নিজে এত বড় হইয়াছেন, সেই সঞ্জীবন ঔষধ আমাদিগের প্রতিও প্রযুক্ত করিয়া আমাদের অন্তরে আজ প্রকাণ্ড জাতীয় জীবনের ভাব অঙ্কুরিত করিয়াছেন। নিদ্রিত ভারত আজ একটী প্রকাণ্ড-জাতিরূপে পরিণত হইতে চলিল। রিপণ-প্রবর্ত্তিত স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালী সেই ভবিষ্য জাতীয় সৌধের ভিত্তিমাত্র। যে ইংরাজের কাছে এত শিখিয়াছি, এত উপকার পাইয়াছি—সে ইংরাজের কাছে আরও কিছু উপকার লইতে ও যাহা কিছু বাকি আছে, তাহা শিখিতে কেন লজ্জা বোধ করিব?

স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালী।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

প্রথম প্রবন্ধ লেখার পর, ভূতপূর্ব্ব লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে মন্তব্য আমাদের হাতে পড়িয়াছিল। সেই মন্তব্য সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ না করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করা অনুচিত বিবেচনায় তাহার সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

মাননীয় রিভার্স টম্‌সন্ নির্ব্বাচক ও সভ্য-নির্ব্বাচন-বিষয়ে সম্পত্তিকেই এক মাত্র নিয়ামক করিয়াছেন। আমরা যেমন প্রাপ্তবয়স্ক ও লিখনক্ষম ব্যক্তিমাত্রকেই নির্ব্বাচক মনোনীত করিবার অধিকার দিতে চাহি, তিনি সেরূপ না করিয়া যাঁহারা ১০৲ টাকা বা ততোধিক রোড্‌সেস্, অথবা ১০৲ টাকা বা ততোধিক লাইসেন্স ট্যাক্স দেন, অথবা যাঁহাদিগের আয় ৫০০৲ টাকার ন্যূন নহে, তাঁহাদিগকেই নির্ব্বাচক বলিয়া ধরিয়া লইতে চাহিয়াছেন। নির্ব্বাচক মনোনীত করণে জাতি-

সাধারণের অধিকার স্বীকার করেন নাই। ইহাতে তিনি যে জাতি-সাধারণের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছেন ও সম্পত্তির আদর করিয়া বিদ্যার ও বংশমর্য্যাদায় অবমাননা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তদ্ভিন্ন কার্য্যতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবে না। কারণ, সহরে যাহা হউক্, পল্লীগ্রামে অতি অল্পলোকেরই ৫০০৲ টাকা বা ততোধিক আয় আছে। এমন অনেক গ্রাম আছে, যেখানে ৫০০৲ টাকা বা ততোধিক আয়ের লোকের পূর্ণ অভাব বিদ্যমান। সুতরাং স্থানীয় সমিতির সভ্য মনোনীত করণে সে সকল গ্রামের মোটেই ভোট থাকিবে না। এইরূপে নির্ব্বাচকের সংখ্যা এত কম হইবে যে, তাঁহা-দিগের দ্বারা সভ্য-নির্ব্বাচন-কার্য্য সমীচীন-রূপে সম্পন্ন হইবে না। দ্বিতীয়তঃ তিনি স্থানীয় সভ্য মনোনীত হওয়ার যে নিয়ম করিয়াছেন তাহাতে সভ্য পাওয়াই কঠিন হইবে। তাঁহার মতে যিনি ২৫৲ টাকা বা ততোধিক রোড্‌সেস্ অথবা ২০৲ টাকা ট্যাক্স দেন, অথবা যাঁহার আয় ১০০৲ টাকার ন্যূন নহে, তিনিই স্থানীয় বোর্ডের সভ্য হইবার উপযুক্ত। আমরা পল্লীগ্রামবাসী; সুতরাং আমরা ভূয়োদর্শন-বলে মুক্ত-কণ্ঠে বলিতে পারি যে অনেক পল্লীগ্রামেই ১০০৲ টাকা বা ততোধিক আয়ের লোক নাই। গণ্ডগ্রামে এরূপ আয়ের লোক দুই চারি জন পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু গণ্ডগ্রামের সংখ্যা অতি অল্প। সুতরাং স্থানীয় সমিতিতে অধিকাংশ গ্রামেরই ভোট থাকিবেনা। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর লোকের অভাব হইবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই জন্যই বলিয়া-ছেন যে, সম্পত্তির পরিমাণানুসারে এক এক ব্যক্তিকে ছয় গুণ পর্য্যন্ত ভোট দেওয়া যাইবে। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ইহা সাধা-রণ লোকের নির্ব্বাচিত সমিতি নহে, নির্দ্দিষ্ট আয়ের ধনিগণের বা জমিদারগণের সমিতি-মাত্র। বলা বাহুল্য যে, এরূপ নির্ব্বাচনপ্রণালী ও এইরূপে নির্ব্বাচিত সভ্যগণ কখন জাতিসাধারণের সহানুভূতি পাইবে না। সুতরাং লর্ড রিপণের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিফল হইবে। জাতি-সাধারণকে আত্মশাসন শিখানই লর্ড রিপণের উদ্দেশ্য। দশ জন জমিদার বা মহাজন তাহা শিখিলে, কি হইবে? ইহা অখণ্ডনীয় সত্য

যে, সম্পত্তি নির্ব্বাচন-নিয়ামক হইলে অনেক বিদ্বান্, উপযুক্ত ও দেশহিতৈষী লোক বাদ পড়িয়া যাইবেন। কারণ, পল্লীগ্রামস্থ অনেক গৃহস্থের আয় ৫০০৲ টাকার ন্যূন হইবে, অথচ তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক যোগ্য লোক আছেন। এক জন জমিদার বা এক জন দোকানদারের আয় হয় ত বেশী হইতে পারে, কিন্তু অনেক সময়ে তাহাদিগকে বিদ্যাবুদ্ধি-শূন্য দেখিতে পাওয়া যায়। আপন আপন কার্য্য-নির্ব্বাহোপযোগিনী বুদ্ধি তাঁহাদিগের নাই, এ কথা বলি না। কিন্তু রাজনীতি, অর্থনীতি ও শাসনপ্রণালী প্রভৃতির জটিল প্রশ্ন সকলের মীমাংসা করিতে যে সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োজন, তাহা তাঁহাদের সাধারণতঃ নাই—ইহাই আমাদের বক্তব্য। মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ কায়স্থের আয় হয় ত ৫০০৲ টাকার কম হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদিগের বুদ্ধি সাধারণতঃ অতি সূক্ষ্ম। ইহাঁদের মধ্য হইতেই সাধারণতঃ জমিদারদের ও ব্যবসাদারগণের গোমস্তা, মুহুরী, নায়েব, দাওয়ান প্রভৃতি মনোনীত হইয়া থাকেন। ইহাঁদের হয় ত সম্পত্তি নাই, এবং বেতন হয় ত ১০০০৲ বা ৫০০৲ টাকার ন্যূন, কিন্তু বুদ্ধিবিদ্যায় ইহাঁরা মনিবদের প্রভু। মনিবগণ ইহাঁদিগের হস্তে কাষ্ঠপুত্তলীর ন্যায় নৃত্য করেন মাত্র। বর্ত্তমান নির্ব্বাচনপ্রণালীতে এ সকল লোকের অধিকাংশই বাদ পড়িবে। এতদ্ভিন্ন পল্লীগ্রামে এমন উচ্চবংশোদ্ভব বৃত্তিভোগী যজনোপজীবী বা দীক্ষাগুরু ব্রাহ্মণ সকল আছেন, যাঁহারা আজও কাহারও দাস্য স্বীকার করেন না, এবং তাঁহাদিগের আয়ও বেশী নহে অথচ সমাজে তাঁহাদিগের অসীম প্রতিপত্তি। তাঁহাদিগের এক কথায় যে কাজ হইবে, লক্ষপতি তেলি তামলী প্রভৃতির লক্ষ কথাতে সে কাজ হইবে না। বণিক্ রাজা এ কথার যাথার্থ্য হয় ত বুঝিতে পারিবেন না। কারণ, তাঁহাদের দেশে অর্থের গৌরব অধিক। এ দেশে তাঁহাদিগের অনুকরণে অর্থের গৌরব বাড়িতেছে বটে, কিন্তু এখনও বিদ্যাবুদ্ধির ও বংশমর্য্যাদার গৌরব লোপ হইতে অনেক দিন লাগিবে।

এখনও সামাজিক শাসনদণ্ড ব্রাহ্মণ কায়স্থের হস্তে রহিয়াছে, সুতরাং তাঁহাদিগকে দরিদ্র বলিয়া বাদ দিলে, লর্ড রিপণের উদ্দেশ্য বিফল

হইবে। প্রস্তাবিত প্রণালীতে নির্ব্বাচিত স্থানীয় সমিতি, জমিদার ও বণিক্ বহুল হইবে, সুতরাং সেখানে প্রজাসাধারণের স্বার্থ সমর্থিত হইবার কোন আশা থাকিবে না। সুতরাং এরূপ আংশিক স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণালীতে দেশের অনিষ্ট বই ইষ্টের সম্ভাবনা নাই।

অনেক গ্রামে দেখা যায়, গ্রামের বিদ্যালয়ের পণ্ডিত বা মাষ্টার বুদ্ধিবিদ্যায় গ্রামের মধ্যে প্রধান। অনেক বিষয়েই লোকে তাঁহার সহিত পরামর্শ করে, এবং তাঁহার পরামর্শানুসারে কাজ করে। কিন্তু তাঁহাদিগের সাধারণতঃ যেরূপ আয়, তাহাতে তাঁহারা যে কখনও নির্ব্বাচক-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন, তাহার কোন আশাই নাই। মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা গ্রাম্য পণ্ডিত, ও মাষ্টারকে বাদ দিলে, গ্রামে মানুষের মধ্যে থাকে কে? সুতরাং আমাদের মতে সম্পত্তি নির্ব্বাচন-নিয়ামক হওয়া কোনমতেই উচিত নহে। যদি নিতান্তই গবর্ণমেণ্টের তাহা ভাল লাগে, তাহা হইলে সম্পত্তির পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। নির্ব্বাচকের পক্ষে ২০০৲ টাকা ও সভ্যের পক্ষে ৫০০৲ টাকা আয় হইলেই, যথেষ্ট হইতে পারে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার গৌরবও করা চাই। মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণকে নির্ব্বাচক, এবং গ্রাজুয়েট্, অণ্ডার গ্রাজুয়েট্ ও সংস্কৃত উপাধি-পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি-গণকে সভ্য মনোনীত হওয়ার অধিকার দিলেই, বিদ্যার গৌরব করা হইবে।

ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর প্রতি সব্ ডিভিশন বা উপবিভাগকে এক একটী শাসনকেন্দ্র করিতে চাহিয়াছেন, এবং লোকবহুল স্থানে থানাকেও শাসনকেন্দ্র করিতে প্রস্তুত আছেন। এই প্রণালী প্রাচীন পল্লীসমাজের কাছাকাছি যাইতেছে। কিন্তু এরূপ বিকেন্দ্রীকরণপ্রথা ভারতের সমীকরণের প্রতিকূল। ইহা প্রাদেশিক বিদ্বেষ-ভাব উদ্দীপিত করার একটী প্রধান উপকরণ হইবে। ইহা বিশ্বজনীন সহানুভূতির উৎ-পত্তির প্রধান অন্তরায় হইবে। যদি রেল, টেলিগ্রাফ ও ভাল রাস্তা ঘাট না থাকিত, তাহা হইলে জেলাকে এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপবিভাগে বিভক্ত করার আবশ্যকতা হইত। কিন্তু এখন তাহার আবশ্যকতা দেখিতেছি

না। এক সময়ে যখন এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাওয়ার পথ অতি দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল ছিল, তখন পল্লীসমাজেরও আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু এখন চতুর্দ্দিকে রেল ও চতুর্দ্দিকে পথ। এখন কিঞ্চিৎ পাথেয় পাইলে, সভ্যমাত্রই অনায়াসে নগরে আসিয়া সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন। শাসনবৃত্ত যতই সঙ্কীর্ণ হইবে, ততই লোকের মন সঙ্কীর্ণ, প্রাদেশিক বিদ্বেষ ভাব অধিকতর পরিপুষ্ট, ও বিশ্ব-জনীন সহানুভূতির ভাব অধিকতর সঙ্কুচিত হইবে। এই জন্য আমরা জেলার নগরকে শাসনকেন্দ্র করিতে চাহি। যেমন গ্রহমণ্ডলী আপন আপন মেরুদণ্ডের উপরে দিন-রাত্রিতে এক বার করিয়া পরিভ্রমণ করিয়া, বৎসরে আপন বৃত্তে সূর্য্যমণ্ডলকে এক বার প্রদক্ষিণ করে, সেইরূপ এই নগর রূপ গ্রহমণ্ডলী আপন আপন প্রদেশে প্রতিদিন ঘুরিয়া, বৎসরে এক বার ভারতের রাজধানীকে প্রদক্ষিণ করিবে। এমন দিন নিশ্চয়ই আসিবে—এবং সে দিন বহুদূরবর্ত্তী নয়—যখন এই স্থানীয় সমিতিসকল হইতে দুই জন করিয়া প্রতিনিধি যাইয়া অন্ততঃ বৎসরে এক বার করিয়া প্রতি বিভাগীয় রাজধানীতে অধিবেশন করিবে। এক জন স্বরস্বতীর ও অন্যতর লক্ষ্মীর প্রতিনিধি। এই সামঞ্জস্য-রক্ষাতেই রাজ্যের স্থায়িত্ব। এই স্থানীয় সমিতি সেই ভবিষ্য মহতী জাতীয় সমিতির ভিত্তিভূমি ও অগ্রদূতী। * এই জন্যই বলিতেছিলাম, আমরা জেলার নগরকেই শাসন কেন্দ্র করিতে চাহি। শাসনবৃত্ত ইহা অপেক্ষা আরও সঙ্কীর্ণ করিতে চাহি না। ইহাতে কাহারও কিছু ক্ষতি হইবে না, অথচ জাতীয় শক্তি ক্রমেই ঘনীভূত হইবে। † কারণ যখন প্রতি থানা হইতে প্রতিনিধি সভ্য প্রেরিত হইবে, তখন প্রত্যেক থানার নির্ব্বাচকগণ আপন আপন গ্রামের স্বার্থ সেই সকল

* ইহাদ্বারা পাঠকগণ দেখিবেন যে বর্ত্তমান জাতীয় মহাসমিতির (Congress) উৎপত্তির বহুদিন পূর্ব্বে ইহার চিত্র আমার হৃদয়ফলকে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। কারণ এ প্রবন্ধটী ১২৮৮ সালের মাঘমাসের আর্য্যদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল।

† এমন দিন হয়তঃ এক সময় আসিবে, যখন এই জাতীয় ভাবও অতি সঙ্কীর্ণ বলিয়া বোধ হইবে। এখন যেমন প্রাদেশিক ভাব জাতীয় ভাবে বিলীন হইতেছে, তখন

প্রতিনিধি সভ্য দ্বারা অনায়াসেই জেলার শাসন-সমিতিতে ব্যক্ত করিতে পারিবেন। সুতরাং, থানা শাসনকেন্দ্র হইলে যে ফল, তাহা তাঁহারা পাইতেছেন; অথচ জেলার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া সহানুভূতির বেগ কমাইতে হইতেছে না। সুতরাং এ বিষয়ে আমরা লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের প্রস্তাবের অনুমোদন করিতে পারিলাম না।

সভাপতি-নির্ব্বাচনের ভাব আমাদিগের মতে সর্ব্বত্রই সভ্যগণের হাতে থাকা উচিত। শাসন-সমিতির গঠনকার্য্য সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচিত সভাপতি কার্য্য করিতে পারেন; কিন্তু গঠন-কার্য্য সমাপ্ত হইবামাত্র তাঁহাকে অবসৃত হইতে হইবে। হয়তঃ তিনিই সভ্যগণ কর্ত্তৃক সভাপতি নির্ব্বাচিত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে সভ্যগণের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি ইংরাজ হউন্, তাহাতেও আমাদের

আবার জাতীয় ভাব বিশ্ব ভাবে বিলীন হইবে। তখন সমস্ত পৃথিবী এক প্রকাণ্ড-সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইবে। তখন প্রত্যেক রাজ্য বা সাম্রাজ্য সেই সৌর-জগতের এক একটী গ্রহস্বরূপ হইয়া ইহার মাধ্যমিক কেন্দ্রের চতুর্দ্দিক ঘুরিবে। তখন নদীয়া যশোহর প্রভৃতি জেলা বিলুপ্ত হইয়া বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি জেলায় পরিণত হইবে। তখন বৈদ্যুতিক লৌহবর্ত্ম ও ব্যোমযান প্রভৃতির পর্য্যাপ্ত ব্যবহারে ও বেগবৃদ্ধিতে প্রাদেশিক দূরত্ব একবারে কমিয়া যাইবে। শাসনবৃত্তকে এইরূপে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইতে অতি প্রকাণ্ডে পরিণত করাই সভ্যতার চরম ফল। ইউরোপে এক্ষণে যে বড় বড় রাজ্যের প্রতিনিধি লইয়া মধ্যে মধ্যে এক একটী কঙ্গ্রেস্ বসে, ইহা সেই প্রকাণ্ড বিশ্ব সম্মিলনের সূত্রপাত-মাত্র। বিশ্ব সম্মিলনের আবশ্যকতা এখন সভ্যজাতি-মাত্রেই ক্রমে অনুভব করিতেছেন। সুতরাং, ইহা যে এক দিন ঘটিবে, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই। তখন জাতিগত বিদ্বেষ বিলুপ্ত হইয়া বিশ্বপ্রেমের রাজ্য আবির্ভূত হইবে। তখন আর যুদ্ধ বিগ্রহাদি দ্বারা মানুষে মানুষের রক্ত মাংস খাইবে না। তখন বীর বলিলে, নরহন্তা বুঝাইবে না। তখন দয়াবীর, ভক্তিবীর, প্রেমবীরে জগত প্লাবিত হইবে। সকলেই ভাই ভাই, সকলেই ভাই বোন্। কাহাকে দেখিলে, কাহারও হৃদয় বিদ্বেষ কিংবা প্রতিহিংসানলে উদ্দীপিত হইবে না। সকলেই পরস্পর-প্রেমে বিভোর। জগৎ তখন অনন্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে। ইহাই বৈকুণ্ঠ, ইহাই স্বর্গ। মা বিশ্বজননি! বলিয়া দেও, সে দিন কবে আসিবে?

আপত্তি নাই। কিন্তু তাঁহাকে মনোনীত করার ভার সভ্যগণের হস্তে, এবং পরে তিনি প্রতিকূলাচরণ বা শক্তির অপব্যবহার করিলে তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করার অধিকার, সভার হস্তে থাকা চাই।

গবর্ণমেণ্ট বোর্ড অব্ কন্ট্রোল্ নামক একটী স্বতন্ত্র শাসন-কেন্দ্র করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু ইহা যে সভার কার্য্যকারিতা নষ্ট করিবে না কে বলিল? ম্যাজিষ্ট্রেট সভাপতি হইলে যে পরিমাণ অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল, বোর্ডের অবিরাম হস্তক্ষেপে তাহা অপেক্ষাও যে অধিক অনিষ্টের সম্ভাবনা রহিল না, কে বলিল? পলিটিকেল্ এজেণ্টগণ যেরূপ স্বাধীন-রাজগণের বিশেষ যন্ত্রণার কারণ হইয়াছেন, বোর্ড যে স্থানীয় শাসন-সমিতির সেইরূপ যন্ত্রণার কারণ হইবেন না, কে বলিল? ম্যাজিষ্ট্রেটের নানা কাজ; সুতরা তাঁহার হয়তঃ খোঁচাখুঁচি করার অবসর হইত না। বিশেষতঃ তিনি সভাপতি হইয়া সভার বিরুদ্ধে বাহিরে কিছু বলিতে পারিতেন না, ভিতরে সভ্যগণের সঙ্গে যে কিছু সংঘর্ষ উপস্থিত হউক্ না কেন, সভ্যগণের বা সভার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে কিছু লিখিতে পারিতেন না। কারণ, প্রকারান্তরে তাহাতে তাঁহার নিজেরই অপটুতা প্রকাশ হইত।* কিন্তু বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের আর কিছু কাজ থাকিবে না, সুতরাং সভার ছিদ্রান্বেষণ করাই তাঁহার একমাত্র ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইবে। এইরূপে দুই বোর্ডের সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। যে সকল ভদ্রলোক দেশের হিতের জন্য 'ঘরে খাইয়া বনের মহিষ তাড়া-

---

* ১২৮৮ সালের মাঘ মাসের আর্য্যদর্শনে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, ভগবানের কৃপায় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের গঠন প্রায় তদনুরূপই হইয়াছে। তবে ইহাকে আমি জেলার ভিতর একমাত্র শাসনকেন্দ্র করিতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা না হইয়া ইহার অধীনে লোকাল্ বোর্ড বা স্থানীয় বোর্ড নামক ক্ষুদ্রতর শাসনকেন্দ্র-সকল সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল ক্ষুদ্রতর শাসনকেন্দ্র ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীন হওয়ায় তাহাদিগের অনিষ্টকারিতা কমিয়া গিয়াছে। বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল্ বা মাধ্যমিক বোর্ড আজও স্থাপিত হয় নাই। পরে কি হয়, বলা যায় না। আমাদিগের বিবেচনায় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে প্রতিনিধি গ্রহণ করিয়া এক একটী বিভাগীয় বোর্ড (Provincial Board) স্থাপিত হওয়া উচিত।

ইতে' আসিবেন, তাঁহারা গতিক দেখিয়া ক্রমেই সরিয়া পড়িবেন। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যদি দেশীয় লোককে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালীর সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, স্বাতন্ত্র্য না দিতে পারেন। কিন্তু যদি কথঞ্চিৎ উপযুক্ত বোধ করিয়া থাকেন ত উৎপত্তির সময়েই যেন এরূপ মৃত্যুর পথ করিয়া না রাখেন। যেন অগ্রসর হইতে দিয়া পশ্চাৎ দিক্ হইতে এরূপ চুল ধরিয়া টানিবার ব্যবস্থা না করিয়া রাখেন। প্রথম অবস্থায় একটু আধ টুকু বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে, গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্ব হইতেই এরূপ ধরিয়া রাখা উচিত। কোন গুরুতর বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে জানিতে পারিলে, ম্যাজিষ্ট্রেট্ সে বিষয় গবর্ণমেণ্টে লিখিতে পারিবেন, এবং সেই রিপোর্ট অনুসারে কমিশনর আসিয়া সে বিষয়ে তদন্ত করিতে পারিবেন। ইহার জন্য স্বতন্ত্র বোর্ডঅব্ কণ্ট্রোল রাখিবার আবশ্যকতা দেখি না।

সভাপতির বেতন ও সভ্যগণের পাথেয় এই দুইটীই প্রার্থনীয় বিষয়। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে সভার আয়ের উপরে নির্ভর করিতেছে। যাঁহারা প্রকৃত দেশ-হিতৈষী, তাঁহারা সভাব ক্ষমতানুসারে যে যৎকিঞ্চিৎ লইয়াই সন্তুষ্ট হইবেন, তদ্বিষয়ে আব সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে একটা সাধারণ নিয়ম করিবার প্রয়োজন নাই।

মিউনিসিপাল আইনের ১৬ ধারায় নির্ব্বাচন-প্রণালী-সম্বন্ধে যে নিয়ম আছে যে, করদাতৃগণের অন্ততঃ এক-তৃতীযাংশ আবেদন না করিলে, গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাচন-প্রণালী মঞ্জুব কবিবেন না, ইহা বোধ হয়, পল্লীগ্রামস্থ অনেকেই অবগত নহেন। গবর্ণমেণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই বিষয় সকলকে বিদিত করাইবার জন্য চেষ্টা করিতে বলিয়াছেন। আমাদের সকলেরই এ বিষয়ে প্রাণপণে ম্যাজিষ্ট্রেটের সহায়তা করা উচিত। যাহাতে সকলেই এই স্বায়ত্ত শাসনপ্রণালী ভাল করিয়া বুঝিতে পারে ও বুঝিয়া তদনুষ্ঠানে প্রাণপণ চেষ্টা করে, তদ্বিষয়ে ঐকান্তিকতার সহিত আমাদের কার্য্য করা উচিত। ভ্রাতৃগণ! আমাদের নিশ্চেষ্ট থাকিবার সময় নয়। মহামতি লর্ড রীপন্ ভারতের অধীনতা-শৃঙ্খল কিয়ৎ পরিমাণে শিথিলিত করিবার নিমিত্ত ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আসুন আমরা

আজ প্রাণপণ করিয়া তাঁহার সহায়তা করি। তিনি বিশ্বপ্রেমিক, ও ভারতবন্ধু। আক্‌বরের পর আর এরূপ নরপতি ভারত-সিংহাসন অধিকার করেন নাই। তাই আজ ভারতের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ের সর্ব্বোচ্চ আসনে দেশীয় প্রাড়্‌বিবাক * সমাসীন।
আজ যদি ইহাঁর পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয়, আজ আবার তোদরমল্ল, মানসিংহ ও বীরবল প্রভৃতিকে দেখিতে পাইতাম। আক্‌বর যেমন নিজ-জাতিসাধারণ হইতে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ভিন্নমতাবলম্বী হওয়ায়, স্বজাতি-পক্ষপাতিত্ব সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারিয়াছিলেন,—ইনিও সেইরূপ নিজ-জাতিসাধারণ হইতে ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী হওয়ায়, জাতিগত পক্ষপাতিত্বের শৃঙ্খল ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। †

আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, রিপন যেন দীর্ঘকাল ভারত-সিংহাসন অধিকার করিয়া থাকেন। তিনি অন্ততঃ দশ বৎসর কাল ভারতে থাকিলেও, ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালী বদ্ধমূল হইবে;—ইংরাজ বিধি-গ্রন্থ হইতে ইংরাজ-শাসনের কলঙ্ক-স্বরূপ অস্ত্রবিধি প্রক্ষালিত হইবে; এবং ফৌজদারী কার্য্যবিধির সপ্তম অধ্যায়ে শ্বেত-কৃষ্ণের বিচার-পার্থক্য করায় ইংরাজের নির্ম্মল আইনে যে কালিমা পতিত হইয়াছে, তাহাও বিধৌত হইবে। তিনি যাহাতে অল্প-কালস্থায়ি-রাজত্বেই অনেক কাজ করিয়া উঠিতে পারেন, আসুন্, আমরা সমস্ত ভারতবাসী মিলিয়া আজ তাহার বিধান করি। আসুন্, আমরা সকলে এক বাক্যে তাঁহার প্রতি ও তাঁহার কার্য্যের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করি। আসুন্, আমরা আজ সমস্বরে তাঁহার যশোগান করি। হিমালয় হইতে কুমারিকা ও সিন্ধু হইতে সুদূর ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনি তুলিয়া গাই—জয় রিপনের জয়। জয় ভারতের জয়! মিলি সবে গাই ভারতের জয়! রিপনের জয়! শুনুক্ জগৎ, স্তব্ধ হ'ক চরাচর!

---

* স্যার্ রমেশচন্দ্র মিত্র মহোদয় লর্ড রীপনের যত্নে কিছু দিনের জন্য হাইকোর্টের চীফ জষ্টিসের পদে অভিষিক্ত হন।

† লর্ড রীপন প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

নবজীবন ও প্রচার এবং নব হিন্দুধর্ম্ম।

আজকাল হিন্দুধর্ম্ম লইয়া যে গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে একবারে স্থির থাকা অসম্ভব। 'নবজীবন' পাইয়া সমস্ত বঙ্গদেশ যেন নিদ্রোত্থিত হইয়াছে, এবং 'প্রচারের' উদ্দীপনায় মৃত হিন্দুসমাজের অস্থিরাশিতে যেন নবজীবন সঞ্চারিত হইয়াছে। সকলেরই মুখে এখন 'নবজীবন' ও 'প্রচার' বই আর কিছুই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। সকলে ঘটিবাটী বেচিয়াও যেন 'নবজীবন' ও 'প্রচারের' মূল্য প্রাপ্তির স্তম্ভ পূরণ করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। এ নবজীবনের নূতন উৎসাহে বঙ্গসমাজ আজ উদ্বেল হইয়া উঠিযাছে। হারাণ ধন পুনঃপ্রাপ্ত হইলে কাঙ্গালের মন যেরূপ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, লুপ্তপ্রায় ও পদদলিত হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রচারে হিন্দুসমাজের আজ সেই আনন্দোচ্ছ্বাস!

'নবজীবন' ও 'প্রচার' সত্য সত্যই যে কোন নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতেছে, বা হিন্দুধর্ম্মের কোন নূতন ব্যাখ্যা দিতেছে, তাহা নহে। থিয়োসফি বা তত্ত্ববিদ্যা লুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্ম্মের যে জীবন-সঞ্চারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছে, 'নবজীবন' ও 'প্রচার' তাহার সহায়তা করিতেছে মাত্র। হিন্দুধর্ম্মের অভ্যন্তরে—রূপকজালের ভিতরে—যে রত্নরাজি নিহিত আছে, সেই সকল তুলিয়া 'নবজীবন' ও 'প্রচার' হিন্দুসমাজকে উপহার দিতেছে। এই জন্য উক্ত পত্রিকাদ্বয় সমস্ত হিন্দু সমাজের কৃতজ্ঞতা-পাত্র সন্দেহ নাই।

ইংরাজগণের রাজত্বকালের প্রারম্ভ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কেবল খ্রীষ্টান্ ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের স্বাপক্ষ্যে বলিবার তখন কেহ ছিল না। এই জন্য খ্রীষ্টীয় মিসনরিগণ অবাধে হিন্দু-ধর্ম্মের দোষোদ্ঘোষণ করিয়া বেড়াইতেন। তরলমতি হিন্দু-যুবকগণ সেই কুহকে পড়িয়া দলে দলে খ্রীষ্টান্ হইতে লাগিলেন। সেই স্বধর্ম্মভ্রষ্ট যুবকদলের জননীর ক্রন্দনে,ও জায়ার আর্ত্তনাদে কিছুকাল ভারতগগন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

এই সময় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে বাহ্যপূজামূলক সাকার হিন্দুধর্ম্ম দ্বারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন অসম্ভব। এই জন্য তিনি হিন্দুধর্ম্মের নিরাকারবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে একটী অবতার—হিন্দুধর্ম্মে তেত্রিশ কোটী অবতার। সুতরাং খ্রীষ্টীয় মিসনরিগণ খ্রীষ্টান্ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই জন্যই অনেক যুবক খ্রীষ্টান্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় নিরাকার একেশ্বর-বাদ প্রচার করিয়া এই স্রোত রোধ করিলেন, 'ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই অদ্বৈতবাদের নূতন ব্যাখ্যা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে খ্রীষ্টান্ ইউনিটেরিয়ান্ ধর্ম্মের সমান করিলেন। 'ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্'—ইহার অদ্বৈতবাদীয় অর্থ এই যে এই জগতে একমাত্র সত্তা আছে—সেই সত্তা ঈশ্বর। কিন্তু রামমোহন রায় ব্যাখ্যা করিলেন যে ঈশ্বর এক বই দ্বিতীয় নাই। রামমোহন রায়ের এই ব্যাখ্যায় মোহিত হইয়া হিন্দু-যুবকগণ দলে দলে ব্রাহ্ম হইতে লাগিলেন।

তৎকালে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বিবেচিত হইত না। ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের সারসংগ্রহ বলিয়া সকলেই বিবেচনা করিতেন। ব্রাহ্মেরাও তৎকালে 'আমরা হিন্দু নহি' এই জয়পতাকা মাথায় বাঁধেন নাই। সুতরাং প্রবীণ হিন্দুরাও ব্রাহ্মসমাজে গিয়া ব্রাহ্মোপসনায় যোগ দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠাপিত ব্রাহ্ম-সমাজ এখন আদি-ব্রাহ্মসমাজ নামে খ্যাত। এই আদিব্রাহ্মসমাজের সহিত হিন্দুসমাজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কারণ আদিব্রাহ্মসমাজ বেদাদি হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করায় হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন না। প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায় হিন্দু অদ্বৈত-বাদের নূতন ব্যাখ্যা করিয়া, ব্রাহ্মসমাজকে নূতন আকার দিলেন বটে, কিন্তু উভয় সমাজকে সূক্ষ্মসূত্রে আবদ্ধ রাখিলেন। দিন দিন ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত হিন্দুসমাজের ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেছিল—এমন সময়ে সেই মহাপুরুষের অকালে মৃত্যু হইল। ভারত-গগনে সহসা যেন অকাল মেঘ উদিত হইল! কিছু দিন সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

এমন সময় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। হিন্দুসমাজকে তুলিব, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের নব নব ব্যাখ্যা করিয়া ইহাকে সময়োপযোগী বেশভূষায় বিভূষিত করিব, কেশব বাবুর মনে তখন এ ইচ্ছা হইল না। তিনি সমস্ত ভারতবর্ষকে এবং শেষ সমস্ত পৃথিবীকে একধর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। তিনি সংস্কৃত তত জানিতেন না বলিয়া সংস্কৃত-শাস্ত্রের মূল্য বুঝিতেন না। সুতরাং আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা বাইবেল তখন তাঁহার অধিকতর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি ইউনিটেরিয়ান্ খ্রীষ্টান্‌ধর্ম্মকে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া ভারতে চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। খ্রীষ্টীয় আচার ব্যবহার, এবং বিবাহ ও উপাসনা পদ্ধতি পর্য্যন্ত তিনি ব্রাহ্মসমাজে চালাইবার চেষ্টা করিলেন, এবং তদ্বিষয়ে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মসমাজ ক্রমে ক্রমে অতর্কিতভাবে হিন্দু-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। অবশেষে তিন আইন * এই দুই সমাজকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিয়া ফেলিল। কেশববাবু সমস্ত ভারতবর্ষকে একধর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ করিতে গিয়া হিন্দুসমাজ হইতে মৌলিকদলকে † পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দু-সমাজ উভয়েরই সমূহ ক্ষতি হইল। স্থিতিশীলজনবহুল হিন্দুসমাজকে যাঁহারা সর্ব্বদা সংস্কারের জন্য উত্তেজিত করিতেন, তাঁহারা বাহিরে গিয়া পড়ায় হিন্দুসমাজ আবার নিমীলিতনেত্র হইলেন। যে কিছু আবশ্যকীয় সংস্কার তাঁহারা ব্রাহ্ম সমাজের স্কন্ধে চাপাইয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। অলসের যে সান্ত্বনা, তাঁহাদিগেরও সেই সান্ত্বনা। অল-সেরা যেমন পাছে নড়িতে হয় বলিয়া যে অবস্থায় থাকে, সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ স্থিতিশীল হিন্দুসমাজ কাজ করিবার ভয়ে যাহা

---

* Act III. or Indian Civil Marriage Act. ইহাতে আমরা হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি নহি বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে হয়।

† Radical party—যাঁহারা সমাজ ও ধর্ম্মের আমূল সংস্কারের আবশ্যকতা স্বীকার করেন।

আছে তাহাই ভাল বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।

এ দিকে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অনিয়ন্ত্রিত গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাহা পরিত্যাগ করা যায়, তাহার সৌন্দর্য্য দেখায় মানুষের আর প্রবৃত্তি হয় না। ভাল জিনিস্ ছাড়িয়া আসিয়াছি ভাবিতেও মনে কষ্ট হয় বলিয়া, লোকে অবশেষে পরিত্যক্ত দ্রব্যের কেবল দোষাংশ ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিতে আরম্ভ করে। ব্রাহ্মসমাজও তাহাই করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিত্যক্ত হিন্দুসমাজের ও হিন্দুধর্ম্মের কেবল দোষাংশ দেখাই তাঁহাদিগের প্রধান কর্ম্ম হইয়া উঠিল। যে সকল সমাজসংস্কার তাঁহাদিগের হৃদয়ের অতি প্রিয় বস্তু, হিন্দুমতে সে সকল সংস্কারকার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, তাঁহারা যোগ দিতে অসম্মত হইতে লাগিলেন। আমার একটী প্রিয় ব্রাহ্ম বন্ধু যে মতে হউক বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য একসময় প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন; কিন্তু হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর তাঁহার আর সে মতি গতি রহিল না। একবার হিন্দুমতে অনুষ্ঠানীয় একটী বিধবাবিবাহে আহূত হইয়া তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে বিবাহস্থলে শালগ্রাম উপস্থিত থাকিলে তিনি তথায় যাইতে পারিবেন না। হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দুসমাজে তাঁহারা আর কিছুই ভাল দেখিতে পাইলেন না। হিন্দু-নাম তাঁহাদিগের নিকট অপবিত্র বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। তাঁহারা সেই জন্য ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মকে খ্রীষ্টীয় সমাজ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের আদর্শে গঠিত করিয়া লইলেন। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুসমাজ ও হিন্দু-ধর্ম্ম হইতে ক্রমশঃ অধিকতর দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িল। ইহা উভয় সমা-জের পক্ষেই একটী শোচনীয় রাজনৈতিক দুর্ঘটনা। কোথায় শতধা-বিচ্ছিন্ন হিন্দুসমাজ ক্রমশঃ আভ্যন্তরীণ বিদ্বেষভাব ভুলিয়া পরস্পরের সহিত অধিকতর ঘনীভূত হইবে—না ক্রমশঃ আরও বিচ্ছিন্ন হইতে চলিল। কেশব বাবু শেষকালে এই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সংশোধন আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ কালবশে অকালে প্রাণ হারাইলেন। সুতরাং তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হইল না। উন্নতিশীল

ব্রাহ্মসমাজ স্থিতিশীল হিন্দু-সমাজের ভিতরে থাকিলে পরস্পর-সংঘর্ষে পরস্পরই উপকৃত ও উন্নীত হইতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে তাহার বিপরীত হইতে চলিল। উভয় সমাজের ভিতর অতর্কিত-ভাবে কি-যেন-এক শত্রুতা-ভাব দাঁড়াইয়া উঠিতেছে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বিশিষ্ট—পরস্পর পরস্পরের প্রতি মমতাশূন্য। যাহা কিছু হিন্দু, ব্রাহ্মের চক্ষে তাহাই যেন অপবিত্র বলিয়া প্রতীত হয়। আজ কাল দেখিতেছি হিন্দুসমাজের ভিতরও ব্রাহ্মগণের বিরুদ্ধে সেইরূপ কি-যেন এক ভাব উঠিতেছে। এই ভাব-তরঙ্গ যে শুদ্ধ প্রাচীন সম্প্রদায়ে আবদ্ধ তাহা নহে, নব্য সম্প্রদায়ের ভিতরও ইহার প্রবল উচ্ছ্বাস দেখা যাইতেছে। এই ভাব বহুদিন ধরিয়া ধূমায়মান হইতেছিল, এক্ষণে তাহার স্ফুলিঙ্গ 'নবজীবন' ও 'প্রচার' রূপে আবির্ভূত হইয়াছে। উক্ত পত্রিকাদ্বয় আর্য্যধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন উপলক্ষে ব্রাহ্মবিদ্বেষও প্রচার করিতেছে।

এ আন্দোলনের আগমনী থিয়োসফি পূর্ব্বেই গাইয়াছে। থিয়োসফিষ্ট সম্প্রদায় বা তত্ত্ববিদ্যাসমাজ পূর্ব্বেই ধুয়া ধরিয়াছেন, যে ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির গ্রন্থনিচয়ে যে সমুদায় অমূল্য রত্ন নিহিত আছে, পাশ্চাত্য রত্নরাজি তাহার সহিত তুলনায় কিছুই নহে। থিয়োসফি স্পষ্টাক্ষরে ও মুক্তকণ্ঠে জগতে উদ্বোষিত করিয়াছে, যে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে ভারত কখনই উঠিবে না, কখনই বড় হইবে না; আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণ যে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত তুলনায় পাশ্চাত্য আধ্যাত্মিক উন্নতি অতি সামান্য। উক্ত সমাজ শুদ্ধ এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই—'থিয়োসফি' মাসিকপত্রে প্রতিনিয়ত উহার প্রমাণ দিতেছেন। আর্য্যশাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া তাহা হইতে রত্নরাজি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন যে সে সমস্ত, ঔজ্জ্বল্যে ও প্রতিভায় পাশ্চাত্য রত্নরাজি অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট।

তত্ত্ববোধিনী, বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব ও ভারতী প্রভৃতি সাময়িক-পত্রিকাও সেই কার্য্যের অনেক সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু 'নবজীবন' ও 'প্রচার' প্রধানতঃ এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে। তবে দুঃখের

বিষয় এই যে 'নবজীবন' ও 'প্রচার' হিন্দুধর্ম্মের বিশ্বজনীন ভাব গ্রহণ না করিয়া পৌত্তলিকতার উপরই বিশেষ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। হিন্দুধর্ম্মে আস্তিক ও নাস্তিক, অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী, সাকারবাদী ও নিরাকার-বাদী, শাক্ত ও বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম ও অব্রাহ্ম—সকলেই অপরিত্যজ্য, সকলেই আদরণীয়। হিন্দু ধর্ম্মে বলে না যে সকলকেই ঈশ্বরের রূপকল্পনা করিয়া পূজা করিতে হইবে। আবার রূপ-কল্পনা করিলেই যে উপাসনা অসিদ্ধ হইবে এ কথাও ইহা বলে না। সাধকের বিকাশভেদে উপাসনা-ভেদ—হিন্দু ধর্ম্মের চরম উৎকর্ষের লক্ষণ। হিন্দুধর্ম্ম ব্যক্তিভেদে জড়ো-পাসনা হইতে অনন্তের উপাসনা ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছে। ইহা ব্যক্তিভেদে ইষ্টদেবতা স্বতন্ত্র করিয়া গিয়াছে। যে শালগ্রামশিলার উপাসক—সেও হিন্দু, এবং যে অনন্ত অজ্ঞাত অজ্ঞেয় ও অবাঙ্মনসোগোচর ব্রহ্মের উপা-সক সেও হিন্দু। যে ভক্তিবাদী সেও হিন্দু, যে জ্ঞানং-ব্রহ্ম বাদী সেও হিন্দু। যে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ববাদী সেও হিন্দু, যে ঈশ্বরের বিশ্বরূপত্ববাদী সেও হিন্দু। যে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়াছে, তাহার নিকট কোন প্রকার ভেদবুদ্ধি থাকিতে পারে না। প্রকৃত অদ্বৈতবাদী শঙ্করা-চার্য্য হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মহিমা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই চণ্ডালের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। প্রকৃত অদ্বৈতবাদীর নিকট সকলই বিশ্বরূপ ভগবানের প্রতিকৃতি বলিয়া প্রতীতি জন্মিবে। সুতরাং জাতিগত, ধর্ম্মগত, বর্ণগত ভেদ তাঁহার নিকট হইতে একেবারেই চলিয়া যাইবে। জাত্যাভিমান, বংশমর্য্যাদার অভিমান, বা কোন-প্রকার অভিমান তাঁহার থাকিতে পারে না। তাঁহার নিকট হিন্দু ও যবন, ব্রাহ্ম ও অব্রাহ্ম, শ্বেত ও কৃষ্ণ-ভেদ কিছুই রহিতে পারে না। এই প্রকাণ্ড বিশ্বজনীন ভাবে শঙ্করাচার্য্য বিশাল ও উদার বৌদ্ধ ধর্ম্মকেও হিন্দুধর্ম্মের কুক্ষিগত করিতে পারিয়াছিলেন। যে যেখানে হিন্দু হইতে চাহিয়াছিল, তাহাকেই তিনি হিন্দু করিয়া লইয়াছিলেন। ভারতে আবার হিন্দু ধর্ম্মের সেই বিশাল ও উদার ভাবের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছে। সঙ্কীর্ণভাবে ভারতের আর মঙ্গল নাই।

যে ধর্ম্ম সমস্ত ভারতকে অন্ততঃ ভারতের অধিকাংশ অধিবাসীকে

এক ধর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ করিতে পারে, সেই ধর্ম্মই আমাদের আরাধ্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে এক সময়ে আমরা এই আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণভাব ধারণ করায় সে আশা গিয়াছে। এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের বিশ্বজনীন ভাবে যে মহাপুরুষ আবার ভারতকে অনুপ্রাণিত ও ঘনীভুত করিতে পারিবেন, তিনিই আমাদের পূজার পাত্র সন্দেহ নাই। যিনি হিন্দুধর্ম্মের বিশ্বজনীন ভাবে ও বিশাল প্রেমোচ্ছ্বাসে—ব্রাহ্মসমাজ, এবং দেশীয় খ্রীষ্টীয় ও মুষলমানসমাজকে হিন্দুসমাজের কুক্ষিগত করিতে পারিবেন—তিনি ভারতবাসিমাত্রেরই উপাস্য দেবতা। সে মহাপুরুষের চরণে আমরা উদ্দেশে নমস্কার করি। কিন্তু যিনি তাহা না করিয়া ধর্ম্মের নামে—ঈশ্বরের নামে—সহস্রধা বিদীর্ণ ভারতবক্ষের আর একটীও ক্ষত বাড়াইবেন, তিনি ভারতের প্রকৃত শত্রু। যে ধর্ম্ম ভারতে আরও দলাদলি বাড়াইতে চাহে, যে ধর্ম্মধ্বজিগণ দগ্ধপ্রায় ভারতে আরও ধর্ম্ম-বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত করিতে চাহেন, আমরা তাদৃশ ধর্ম্ম বা ধর্ম্ম-প্রচারককে দূর হইতে নমস্কার করি। যে ভাবে বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, গুরুগোবিন্দ, চৈতন্য ও রামমোহন রায় প্রভৃতি ধর্ম্ম-সংস্কারকগণ ভারতের একীকরণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন সেই ভাবে আবার ভারতের একীকরণ আরম্ভ করিতে হইবে। ইহা সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ দ্বারা হইবে না। সর্ব্বগ্রাসিপ্রেম ব্যতীত—পূর্ণ অভেদজ্ঞান ব্যতীত—গভীর আত্মবিস্মৃতি ব্যতীত,—এ সাধনায় কেহ সিদ্ধ হইতে পারিবেন না! যেমন সাধ্য, তেমনই সাধনা চাই। যেমন সাধনা, তেমনই সাধকের প্রয়োজন!

বর্ণভেদ।

মন্‌রো সাহেব যে বর্ণভেদ লইয়া এত আন্দোলন করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে যাহাদের মধ্যে বর্ণবৈষম্য আছে, তাহাদিগের জেতৃ-জাতির সহিত রাজনৈতিক সাম্য চাহিবার অধিকার নাই,—ভারতীয় সেই বর্ণভেদের উৎপত্তি, পরিণতি, উপকারিতা, ও অপকারিতা প্রভৃতি গুণাগুণ তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ আমরা ইহার উৎপত্তিবিষয়ে আলোচনা করিব। এই বর্ণভেদের উৎপত্তিকাল নির্ণয় করা দুরূহ। যখন ভারতীয় আর্য্যেরা সারস্বত প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন ইউরোপ কি অবস্থায় ছিল, তাহার কোন প্রবাদ বা ইতিহাস নাই। অনুমানতঃ তাহা খ্রীষ্টীয় শকের প্রায় দুই তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হইবে। তখন সমস্ত পৃথিবী ঘোরতর অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। তাহার বহুকাল পরে গ্রীস ও রোমের অভ্যুদয় হয়। গ্রীস ও রোমের জ্ঞানালোক ক্রমে ক্রমে ইউরোপ হইতে অজ্ঞান-তিমির বিদূরিত করে। আমরা যে সময়ের কথা আরম্ভ করিলাম, সে সময় আমাদের জেতা ইংরাজ কাল-কুক্ষিগত ছিলেন। তাহার বহুকাল পরে তাঁহাদিগের জাতীয় উৎপত্তি হয়।

সেই সুদূর অনৈতিহাসিক কালে আর্য্যেরা ভারতে আসিয়া দেশীয়গণ অপেক্ষা আপনাদিগের বর্ণগত উৎকর্ষ দেখিয়া সর্ব্বপ্রথমে 'শ্বেত কৃষ্ণ' দ্বারা শ্রেণীবিভাগ আরম্ভ করেন। তাঁহারা আপনাদিগকে আর্য্যবর্ণ ও দেশীয়দিগকে অনার্য্য বর্ণ বলিয়া অভিহিত করেন। শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ হইতে ক্রমে আর্য্য ও অনার্য্য শ্রেণী বিভাগ হয়। এইরূপে গাত্রবর্ণ হইতে ক্রমে জেতা ও জিতরূপ রাজনৈতিক শ্রেণীবিভাগের উৎপত্তি হয়। বিজয়ী আর্য্যগণের মধ্যে তখন একমাত্র বর্ণ ছিল। সকল আর্য্যই সমান ছিলেন। সেই সত্যযুগে আর্য্যেরা আপনাদিগের মধ্যে সাম্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। আর্য্য ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে ধনী, দীন, জ্ঞানী, অজ্ঞান, বীর ও অবীর সবই সমান ছিলেন। সকলেই পরস্পরকে ভাই ভাই বলিযা মনে করিতেন। স্ত্রীজাতির প্রতি অবিশ্বাস ছিল না, সুতরাং অবরোধ প্রথা ছিলনা। স্ত্রী পুরুষ সকলেই স্বাধীন—অথচ সকলেই পরস্পরে মমতাপূর্ণ। উভয়ের প্রতি একই বিধি ব্যবস্থাপিত ছিল। মিথ্যা প্রবঞ্চনা কাহাকে বলে, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। তাঁহারা সরলতার ও সত্যপ্রিয়তার এক একটী জীবন্ত ছবি ছিলেন।

কিন্তু তাঁহাদিগের সেই পবিত্র হৃদয়াকাশে এক খানি কাল মেঘ উদিত হইয়াছিল। ক্রমে সাম্যময় আর্য্য উপনিবেশে অনার্য্য-সংস্রবে বৈষ-

ন্যের রেখা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। আদিম নিবাসিগণ নিরন্তর উৎপীড়ন করায় তাঁহাদিগের অন্তরে অনার্য্য বিদ্বেষ অতি গাঢ়তর ভাব ধারণ করিয়াছিল। ঋক্‌বেদের সমস্ত স্তোত্র গুলিতেই এই ভাব দেদীপ্যমান। যখন তাঁহারা তামসী নিশির কোলে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকিতেন, তখন অনার্য্যেরা আসিয়া তাঁহাদিগের অতি আদরের গোধন সকল লুট-পাট করিয়া লইয়া যাইত, এবং তাঁহাদিগের স্ত্রীপুত্রাদি কাড়িয়া লইয়া গিয়া তাহাদিগের মাংস ভক্ষণ করিত। এই জন্য তাঁহারা ঋক্‌বেদে অনার্য্য-দিগকে দস্যু, নরভুক্, রাক্ষসাদি নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। এই দস্যুগণের উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা রজনীতে গড়খাই করা শিবির সকলে একত্র বাস করিতেন। তাঁহারা সংখ্যায় এত কম ছিলেন যে, দৈববল দ্বারা আত্মবল উপচিত করা একান্ত আব-শ্যক মনে করিয়াছিলেন। দৈনন্দিন কার্য্য সমাপ্ত করিয়া যখন রজনীতে সকলে একত্র হইতেন, তখন তাঁহারা দেবগণের স্তোত্র আরম্ভ করিতেন। এক এক জন আপন আপন হৃদয়ের ভাব কবিতাকারে প্রকাশ করিয়া সমবেত স্ত্রীপুরুষ-মণ্ডলীর হৃদয় আকৃষ্ট করিতেন। এক এক জন আপন আপন হৃদয়ের ভাব কবিতাকারে গাঁথিয়া তানলয়-যোগে গাইয়া সেই ক্ষুদ্র আর্য্যজগৎকে মাতাইতেন; নির্ব্বাণোন্মুখ বীর্য্যবহ্নিতে প্রতিদিন ইন্ধন সংযোগ করিতেন। এই সকল স্তোত্রে আদি কবিগণের স্বভাবজ কবিত্ব, সরলতা, ও জীবন্ত ধর্ম্ম-বিশ্বাস পরিব্যক্ত। ইহাতে তাঁহারা দেবগণকে পরিচিত বন্ধুভাবে আহ্বান করিয়াছেন—তাঁহাদিগের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাদিগের ভয়-বিহ্বল হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতে আহ্বান করিয়া-ছেন;—এরূপ ভাবে আহ্বান করিয়াছেন যেন তাঁহারা সর্ব্বদা দেবগণের সাক্ষাৎকার লাভ পাইতেন, যেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিপদে তাঁহারা আসিয়া সাহায্য করিয়াছেন। এই কবিত্বপূর্ণ স্তোত্রনিচয় বহু কাল হইতে শিষ্য-পরম্পরায় অভিগীত হইয়া আসিতেছিল। অবশেষে ব্রহ্মর্ষি বেদব্যাস সংহিতাকারে সে গুলি প্রকাশ করেন। ঋক্‌বেদ --বেদব্যাস-সংগৃহীত এই স্তোত্রপরম্পরা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই ঋক্‌বেদের কোন স্থানেই আধুনিক বর্ণবৈষম্যের উল্লেখ নাই। সামবেদে এই ঋক্‌গুলি গীতাকারে

পরিণত হইয়াছে মাত্র; সুতরাং তাহাতেও বর্ণবৈষম্যের উল্লেখ থাকিতে পারে না। যজুর্ব্বেদও ঋক্‌বেদের সার-সংগ্রহ মাত্র—অধিকন্তু তাহাতে কতকগুলি মন্ত্র সংযোজিত হইয়াছে মাত্র! ইহাতেও আধুনিক বর্ণ-বৈষম্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। অথর্ব্ববেদ অনেক আধুনিক; ইহা ঋষিপ্রবর বশিষ্ঠ প্রণীত। ইহাতেও আধুনিক বর্ণবৈষম্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চতু-র্ব্বর্ণের উল্লেখ সর্ব্বপ্রথমে কেবল 'ব্রাহ্মণে' দেখিতে পাওয়া যায়। এই ব্রাহ্মণগুলিতে পরিপুষ্ট সমাজের ছবি প্রতিফলিত। ইহা যে বৈদিক কালের অনেক পরে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ বেদে যাযাবর জাতির ছবি চিত্রিত। আর্য্যেরা তখন ভারতে নূতন আসিয়াছেন। সুতরাং বেদে গ্রাম নগরীর ছবি নাই। শিল্প-বিজ্ঞানের কথা নাই, রাজপ্রাসাদ ও রাজপরিচ্ছদাদির উল্লেখ নাই। যাযাবর জাতির যাহা যাহা প্রয়োজন, কেবল সেই সকলের উল্লেখ আছে মাত্র। ক্রমে ক্রমে সমাজবন্ধন আরম্ভ হইল। আর্য্যেরা নির-ন্তর পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে ক্রমে কষ্ট বোধ করিলেন। তাহাদের গোধনও ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল। কারণ গোমাংস এই সময়ে আর্য্যদিগের প্রধান খাদ্য ছিল। গোমেধ-যজ্ঞের এসময় বিশেষ আধিক্য ছিল। অতিথি আসিলেই তাহার জন্য একটী গরু মারা হইত; এই জন্য তাহাদিগকে 'গোঘ্ন' বলিত। 'গোঘ্ন' অর্থাৎ যাহার জন্য গোবধ হয়। ক্রমে আর্য্যগণের বংশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন আর গো-মাংস ও গোদুগ্ধে কুলাইয়া উঠিল না। সুতরাং কৃষির আবশ্যকতা হইয়া উঠিল। কৃষির আবশ্যকতা হওয়ায় তাঁহাদিগকে পল্লীবদ্ধ হইতে হইল। যাযাবর অবস্থায় তাঁহাদিগের সকলকেই প্রয়োজনানুসারে সকল কার্য্যই করিতে হইত। সুতরাং তখন কার্য্যভেদে বর্ণভেদের উৎপত্তি হয় নাই। এত দিনে কার্য্যসৌকার্য্যার্থে তাঁহাদিগের শ্রম বিভাগ করা আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল। তাঁহারা দেখিলেন, সকলেই যুদ্ধ করিতে গেলে সংসারধর্ম্ম চলে না—এবং সকলে কৃষিকার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও আত্মরক্ষা হয় না। বিশেষতঃ সকলে সকল কাজে কিছু

পটু হইতে পারে না। এই জন্য যে যে কার্য্যের উপযোগী, তাহারই উপর সেই কার্য্যের ভার অর্পণ করা হইল। যাঁহারা কৃষিকার্য্যের উপযোগী, তাঁহাদিগের উপর কৃষিকার্য্যের ভার অর্পণ করা হইল। ইহাঁরা বৈশ্য বা বিশ নামে অভিহিত হইলেন। যাঁহারা যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ ও শারীরিক বলে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহারা রাজ্যরক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। ইহাঁরা বৈশ্যদিগের উপর কর্তৃত্ব করিতেন বলিয়া ইহাঁদিগকে 'বিশপতি' বলিত। ইহাঁদিগের অপর নাম ক্ষত্রিয়। আর্য্যদিগের ধর্ম্ম-বিশ্বাস অতিশয় প্রবল ছিল—ইহা জীবন্ত ও জ্বলন্ত। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারিলেই দেবতারা আসিয়া তাঁহা-দিগের সমস্ত অভাব মোচন করিবেন; তাঁহাদিগকে সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন। যখন তাঁহারা শত্রুগণ কর্তৃক আক্রান্ত হই-তেন, তখন উচ্চৈঃস্বরে এইরূপে ডাকিতেনঃ—

'ইন্দ্র ও সোম! আমাদিগের শত্রুগণকে বিনিষ্ট কর, তাহাদিগকে নরকে নিক্ষিপ্ত কর! ঐ উন্মত্তদিগকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড কর! শ্বাস-রোধ করিয়া তাহাদিগকে মারিয়া ফেল! ঐ নরভুক্‌দিগকে কাটিয়া তাহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দূরে নিক্ষিপ্ত কর'।

ইন্দ্র ও সোম! ঐ পিশাচদিগের বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ কর! অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন তাহা জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ উহাদিগের দেহে অগ্নি প্রজ্বালিত কর। ঐ আম-মাংস-ভুক্—ঐ ব্রাহ্মণদ্বেষীদিগকে চির দিন ঘৃণা করিও!'

'ইন্দ্র ও সোম! ঐ অনিষ্টকারীগণকে নরকের গভীরতম অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত কর! দেখিও যেন এক জনও সেই অন্ধকূপ হইতে উঠিতে না পারে!' শত্রু-পরিবেষ্টিত আর্য্যের হৃদয় হইতে স্বতঃই এইরূপ প্রার্থনা বাহির হইত। যাঁহাদিগের হৃদয়ে এরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস—এরূপ জীবন্ত ধর্ম্মভাব, তাঁহাদিগের মধ্যে আধ্যাত্মিক-উৎকর্ষ-সম্পন্ন ব্যক্তির আদর যে অধিক হইবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং যাঁহাদিগের অধিকতর ধর্ম্মভাব ও উজ্জ্বলতর কবিত্বশক্তি ছিল, তাঁহাদিগের প্রতি অধিকাংশেরই মন ভক্তিভাবে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। আর্য্য-সাধারণ

তাঁহাদিগকে অন্য কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া দেবারাধনায় নিযুক্ত করিলেন। ইহাঁরাই ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মোপাসক) নামে অভিহিত হইলেন। সে সময় বৈশ্যেরা কৃষক ও সৈনিকের কার্য্য করিতেন। ক্ষত্রিয়েরা সেনাপতি ও রাজার কার্য্য করিতেন; এবং ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মযাজক বা আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। আর্য্যসেনা যখন শত্রুসেনার বিরুদ্ধে অভিযানোদ্যত হইত, তখন আচার্য্যগণ বিদারিয়া দেবতাদিগকে ডাকিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। আচার্য্য দেবতাগণকে আহ্বান করিয়াছেন, সুতরাং অবশ্য তাঁহারা সমরে তাহাদিগের সাহায্য করিবেন—এই বিশ্বাসে আর্য্যসেনা বিশ্বস্ত হৃদয়ে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। সে বিশ্বাস-প্রদীপ্ত হৃদয়ের গতিরোধ করে কাহার সাধ্য? অনার্য্যজাতি এই প্রচণ্ড আর্য্য-স্রোতস্বিনীর সহিত অবিরত সংঘর্ষে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ক্রমে ইহাতে বিলীন হইয়া গেল। যাহারা মিশিল না—তাহারা পর্ব্বতের অধিত্যকা প্রদেশে গিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিল। সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতি—সেই অদমিত ও অনমনীয় অনার্য্য জাতি। তাহারা সমস্ত ছাড়িল, তথাপি স্বাধীনতা বিক্রয় করিল না। এই পার্ব্বত্যজাতি-সকলের অভ্যন্তরে আজও সেই দুর্দ্দমনীয় স্বাধীনতা-স্পৃহা বর্ত্তমান। আজও তাহারা সুযোগ পাইলেই স্বাধীনতা-পতাকা উড্ডীন করিয়া থাকে। সাঁওতাল বিদ্রোহ ও রম্পাবিদ্রোহ প্রভৃতি তাহার প্রমাণ। যে সকল অনার্য্য যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অধীনতা স্বীকার করিল, আর্য্যেরা তাহাদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন ও চতুর্থ বর্ণরূপে গ্রহণ করিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই চতুর্থ বর্ণের নাম শূদ্রবর্ণ। এইরূপে চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি হইল। এত দিনে ভারতে শান্তি বিরাজিত হইল। আর্য্য অনার্য্যে যে নিরন্তর সংঘর্ষ চলিতেছিল, তাহা মিটিয়া গিয়া আভ্যন্তরীণ উন্নতির সূত্রপাত হইল। আবার নূতন করিয়া কার্য্য বিভাগ হইল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিল। কিন্তু বৈশ্য ও শূদ্রের কার্য্যের পরিবর্ত্তন হইল। এত দিন বৈশ্যগণকে যুদ্ধের সময় সৈন্যের কার্য্য ও কমিসেরিয়টের কার্য্য, এবং শান্তির সময় কৃষিকার্য্য করিতে হইত। কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদিগের স্কন্ধে সে ভার রাখার

আর আরশ্যকতা রহিল না। অসংখ্য শূদ্র হিন্দুসমাজভুক্ত হওয়ায়, তাহাদিগের উপর এই ভার ন্যস্ত করিয়া বৈশ্যেরা এক্ষণে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। আর্য্য-অনার্য্য-মিলনের পূর্ব্বে কমিসেরিয়েট বিভাগও বৈশ্যগণের হস্তে ছিল। সেই সময় হইতেই তাঁহারা ক্রয়-বিক্রয়ে পারদর্শী হইয়াছিলেন। কমিসেরিয়েট ও সৈনিক বিভাগ হাতে থাকিলে লোকে যেরূপ সহজে ধনশালী হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। বৈশ্যেরা এক্ষণে সেই সঞ্চিত ধন বাণিজ্যে প্রয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ক্রমে তাঁহারা বহির্বাণিজ্যে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। এক দিন এমন গিয়াছে যে বৈশ্যগণের বহির্বাণিজ্য-পোত—রোম, ভিনিশ, মিসর, সিংহল, জাবা, চীন ও জাপান প্রভৃতির বন্দরে গমনাগমন করিত। এ দিকে শূদ্রজাতি কৃষিকার্য্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টিতে রত রহিলেন। এই শান্তির সময়েই ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের অধিকার সমস্ত অনাক্রান্ত রাখিবার জন্য বেদের শাখা প্রশাখা করিতে লাগিলেন। বিবাদ মিটিয়া গেলে ব্রাহ্মণের আধিপত্য স্বতঃই কমিয়া আসিল। যখন সকলেই প্রাণভয়ে আকুলিত ছিলেন, যখন সৈন্যগণ বিশ্বাস করিতেন যে, ঋষিবৃন্দের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণ রণস্থলে তাহাদিগের শরীরে আবির্ভূত হইতেন, এবং সেই বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হইয়া তাহারা রণে অজেয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই জীবনমৃত্যু-সংশয়-কালে ঋক-প্রণেতা ব্রহ্মর্ষিগণের বড় আদর ছিল। শুদ্ধ সৈন্যগণের কেন, আর্য্যজাতি-সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে দেবতারা সহায় না হইলে, যুদ্ধে জয়লাভ হয় না; এবং ব্রহ্মর্ষিগণের স্তোত্র ভিন্ন আর কিছুতেই দেবগণ সন্তুষ্ট হন না। সুতরাং যত দিন যুদ্ধ ছিল, তত দিন ব্রাহ্মণের আদরের আর সীমা ছিল না। এ বিশ্বাস ব্রাহ্মণেরা আপনারাও করিতেন। ব্রাহ্মণেরাও যে বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহাদিগের আরাধনায় দেবতারা তুষ্ট হইয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করেন, তাহা তাঁহাদিগের স্তোত্রের একাগ্রতার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হয়। এই একাগ্রতা ঋক্-বেদের অনেক স্তোত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। দুই একটীর ছবি আমরা দিতেছি:—

'হে বরুণ! তোমার সাহায্য বিনা আমি নয়নের পল্লব ফেলিতেও

অক্ষম। আমি যদিও প্রতিদিন তোমার আদেশের বিপরীতাচরণ করিতেছি, তথাপি দেখিও যেন আমায় মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করিও না। দেব! মৎপ্রদত্ত হবিঃ গ্রহণ কর। আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। এস একবার দেখা দাও, এস আবার অনেক দিনের বন্ধুর ন্যায় পরস্পর কথাবার্ত্তা কহি।'

আর এক জন কবি স্তব করিলেন—

'হে বরুণ! আমার স্তব শ্রবণ কর, আমি তোমার সাহায্যভিখারী হইয়া ডাকিতেছি, আমায় সাহায্য দেও; আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি সুখী হই।'

'হে বরুণ! হে রাজরাজেশ্বর! হে স্বর্গমর্ত্তের অধীশ্বর! দয়া করিয়া আমার প্রার্থনা শ্রবণ কর।'—ঋক্‌বেদ ১। ২৫। ১৯।

একাগ্রতা ও দৃঢ় বিশ্বাসের ইহা অপেক্ষা অধিক পরিচয় আর কি দিব? কিন্তু ব্রাহ্মণগণের এ আধিপত্য চিরদিন অক্ষুণ্ণ রহিল না। যখন শত্রু দমিত হওয়ায় আর্য্যাবর্ত্তে শান্তি বিরাজিত হইল, তখন ব্রাহ্মণগণের আধিপত্য ক্ষত্রিয়গণের অসহ্য হইয়া উঠিল। এদিকে ব্রাহ্মণেরাও অভ্যস্ত আদরে বঞ্চিত হইয়া ক্রোধানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের এই সময়কার স্তোত্র রাগদ্বেষাদিতে পরিপূর্ণ। দুই একটী স্তোত্রের ছবি দেখিলেই তাহা প্রতীত হইবেঃ—

'হে মরুদ্গণ! যাহারা আমাদিগকে উপহাস করে, যাহারা ব্রাহ্মণের দ্বেষ করে—তাহাদিগকে পুড়াইয়া মার।'

'হে সোমদেব! ব্রাহ্মণেরা এত দিন তোমাকে কি তাহাদিগের রক্ষক বলিয়া স্বীকার করে নাই? তাহারা কি বলে নাই যে, তুমি তাহাদিগকে শাপ হইতে রক্ষা করিয়াছ? তবে ব্রাহ্মণেরা যখন উপহসিত হইতেছে, তখন কেমন করিয়া তুমি উদাসীন রহিয়াছ? তোমার জ্বলন্ত বর্ষা ব্রাহ্মণদ্বেষ্টার প্রতি নিক্ষেপ কর।'

'আগামিনী উষা আমাদিগকে রক্ষা করুক! সুদৃঢ় পর্ব্বত সকল আমাদিগকে রক্ষা করুক! সুদৃঢ় পর্ব্বত সকল আমাদিগকে রক্ষা করুক ইত্যাদি। ঋক্‌বেদ ৬। ৫২।

এই ব্রহ্মদ্বিট্ যে ক্ষত্রিয়—তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ, এই সময় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্ম-বিষয়ে একাধিপত্যের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছেন। তিনি ঘোরতর তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার ও তদ্বংশীয়গণের অনেকগুলি স্তোত্র ঋক্‌বেদ সংহিতায় সংগৃহীত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে পরাস্ত হইয়া অগত্যা তাঁহাকে স্বদলভুক্ত করিয়া লইলেন। স্বদলে লইলেন বটে, কিন্তু পূরা লইলেন না। তাঁহাকে মহর্ষি উপাধি দিয়া ভুলাইলেন। স্পষ্ট ব্রাহ্মণ বলিলেন না। ব্রাহ্মণেরা আর এক জন ক্ষত্রিয়ের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে ভীত হইয়া তাঁহাকে রাজর্ষি উপাধি দিয়া ভুলাইলেন। এরূপ কথিত আছে যে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ও বিদেহরাজ সুপ্রসিদ্ধ জনকের নিকট শাস্ত্রজ্ঞানে পরাস্ত হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণেরা জনকের নিকট পরাস্ত হইয়াও তাঁহাকে রাজর্ষিমাত্র উপাধি দিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক উন্নতিতে ক্ষত্রিয়েরা যে ব্রাহ্মণগণের সমকক্ষতা লাভ করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণেরা তাহার বাধা সম্পাদিত করিয়াছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

যাহাতে ক্ষত্রিয়গণের ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তির ভাব প্রবল হয়, যাহাতে তাঁহারা ব্রাহ্মণ-পূজাকে দেবাদিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করেন, সেই জন্য ব্রাহ্মণেরা ঋক্‌বেদের স্তোত্রের মধ্যেও সেরূপ নীতি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। বেদ আর্য্য জাতির সকলেই অপৌরুষেয় বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, "সুতরাং বেদের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিলে নরকে যাইতে হইবে," এই ভয়ে ক্ষত্রিয়েরা ইহার বিরুদ্ধাচরণ হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন—এই উদ্দেশ্যেই বোধ হয়, এরূপ স্তোত্রগুলি রচিত হয়। ঋক্‌বেদের ৪।৫০।৮ স্তোত্র পাঠ করিলেই আমাদের কথা বুঝিতে পারিবেন। তাহার মর্ম্ম এইঃ—

'যে রাজা পুরোহিতকে পুরোবর্ত্তী করিয়া চলেন, তিনিই স্বরাজ্যে ও স্বগৃহে সুপ্রতিষ্ঠাপিত থাকেন; তাঁহার রাজ্যে মেদিনী শস্যশালিনী হন, তাঁহার প্রজারা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। যে রাজা শরণা-

গত ব্রাহ্মণকে ধনসম্পত্তি দিয়া রক্ষা করেন, তিনি অবাধে শত্রুমিত্রের ধনভাণ্ডার হস্তগত করিতে পারেন, ঈশ্বর তাঁহাকে সকল বিপৎ হইতে রক্ষা করেন'।

ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়গণকে এইরূপে শুদ্ধ ভুলাইয়া ক্ষান্ত রহিলেন এরূপ নহে, তাঁহাদিগের উন্নতি-পথে অনেকগুলি কণ্টক রোপণ করিয়া রাখিলেন। বেদের স্তোত্রগুলির উচ্চারণের নিয়ম এরূপ সূক্ষ্ম করিলেন যে যাঁহারা আশৈশব তাহার উচ্চারণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা ব্যতীত আর কেহ সহজে উচ্চারণ করিয়া উঠিতে পারে না। এদিকে তাঁহারা লোকের মনে এরূপ সংস্কার জন্মাইয়া দিতে লাগিলেন যে, বেদের শব্দের বা বর্ণের উচ্চারণের ঈষৎ তারতম্য হইলেও দেবতারা রুষ্ট হন। সুতরাং কার্য্যতঃ আশৈশব বেদগায়ী ব্রাহ্মণ ব্যতীত বেদের উচ্চারণে আর কাহারও অধিকার থাকিল না। সুতরাং অগত্যা জনসাধারণের দেবতুষ্টিবিধানের নিমিত্ত ব্রাহ্মণবর্ণের শরণাপন্ন হইতে হইত। এইরূপে লোকশিক্ষায়, যাজনকার্য্যে ও রাজোপদেশে ব্রাহ্মণের একাধিপত্য রহিয়া গেল। যুদ্ধ-যাত্রার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ স্তব না করিলে, ইন্দ্রাদি দেবতা প্রসন্ন হন না; ইন্দ্রাদি দেবতা প্রসন্ন না হইলেও সৈন্যের মনে বিজয়াশা জন্মে না, সৈন্য আশা-প্রদীপ্ত না হইলেও বিজয়লক্ষ্মী রাজার অঙ্ক-শায়িনী হন না—সুতরাং, রাজাকে ব্রাহ্মণ-চরণে লুণ্ঠিত-শির ও ব্রাহ্মণের অনুগ্রহপ্রার্থী দেখিয়া প্রজারাও রাজগুরু ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইত। রাজা প্রজা সকলেই ব্রহ্মশাপের ভয়ে অস্থির। ব্রাহ্মণকে যে কোন প্রকারে প্রসন্ন করিতে পারিলেই দেবতারা প্রসন্ন হইবেন—সকলেরই এই বিশ্বাস।

এদিকে ব্রাহ্মণেরাও এই বিশ্বজনীন বিশ্বাসের সুবিধা লইতেও ত্রুটি করেন নাই। তিনি আপনাকে দেবোপাসক হইতে ক্রমে উচ্চতর পদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তিনি আপনাকে 'মনুষ্য-দেব' বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। বৈদিক যুগে শ্রাদ্ধ তত দূর গড়ায় নাই। 'ব্রাহ্মণ'-যুগেই দেবপূজক ব্রাহ্মণ স্বয়ং দেবমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। শতপথব্রাহ্মণে (২য় অ।২।৬) লিখিত আছে যে, দুই

শ্রেণীর দেবতা আছেন। প্রথমতঃ স্বর্গীয় দেবগণ, দ্বিতীয়তঃ মনুষ্য দেবগণ। যাঁহারা সমগ্র বেদ পাঠ করিয়াছেন ও বেদের প্রকৃত উচ্চারণে সমর্থ, তাঁহারাই মনুষ্যরূপী দেবতা। এই দুই দেবতারই পূজা ব্যতীত মানবের মুক্তি নাই। ওদিকে ব্রাহ্মণেরা প্রথমে যে মাহাত্ম্য, নৈতিক উৎকর্ষ, ও জ্বলন্ত বিশ্বাসে আর সকলকে মুগ্ধ করিয়া আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ক্রমশঃ সে মাহাত্ম্য, নৈতিক উৎকর্ষ ও জ্বলন্ত বিশ্বাসের অভাব ঘটিতে লাগিল। সুতরাং আপনাদিগের আধিপত্য রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণগণকে আধিদৈবিক উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

তাঁহাদিগের প্রাথমিক স্তোত্র-পরম্পরায় স্বার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হয় নাই। তখন তাঁহারা একমাত্র বর্ণ বই আর কিছু জানিতেন না। তখন নিঃস্বার্থ স্বজাতিপ্রেম তাঁহাদিগের কার্য্যের একমাত্র নিয়ামক ছিল। সে সত্যযুগের কথা এখন ব্রাহ্মণ ভুলিয়া গিয়াছেন। ভাগবত পুরাণে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে 'সত্যযুগে একমাত্র বেদ, একমাত্র দেবতা, একমাত্র অগ্নি ও একমাত্র বর্ণ ছিল। ত্রেতাযুগে পুরোরবার সময়েই তিন বেদ ও তিন বর্ণ হয়।' বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এই বর্ণগত ভেদের উৎপত্তির বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ লিখিত আছে যে, "সর্ব্বপ্রথমে একমাত্র 'ব্রহ্ম' ছিলেন। তাঁহা হইতেই দেবমানবের সৃষ্টি হইয়াছে। মানবসৃষ্টির প্রথম সৃষ্টি ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় সৃষ্টি ক্ষত্রিয়, তৃতীয় সৃষ্টি বৈশ্য, চতুর্থ সৃষ্টি শূদ্র। (শূদ্রকে পৃথিবী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; অর্থাৎ ধরিত্রী যেমন সর্ব্বভূতের ভর্ত্রী, সেইরূপ শূদ্রজাতি সকল বর্ণেরই আহারদাত্রী)। ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু। যে পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে ঘৃণা করিবে, তাহাকে গুরুবধের পাতকী হইতে হইবে।'—এই সকল উক্তি দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে ব্রাহ্মণেরা এই কালে শাস্ত্রের ভয় প্রদর্শন দ্বারা ভক্তি চিরস্থায়িনী করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। যদি গুণ থাকে ত ভক্তি আপনিই আসিবে—এ বিশ্বাসের উপর তাঁহারা নির্ভর করিয়া থাকিতে সাহস করেন নাই। ইংরেজেরা এখন ভুল করিতেছেন—বেয়নেটের ভয় দেখাইয়া ভক্তি

আদায় করিবার চেষ্টা করিতেছেন,—তাঁহারাও সেই ভুল করিয়াছিলেন। প্রভেদ এই যে, ইংরেজেরা বেয়নেটের ভয় দেখাইতেছেন, ব্রাহ্মণেরা পরলোকের ভয় দেখাইয়াছিলেন। যখন পরলোকের ভয় দেখাইয়াও কুলাইল না, তখন চাপের ও শাপের ভয় দেখাইতেও পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। 'শাপেন চাপেন বা' শাপে হয় ভাল, নতুবা শত্রু দমনের জন্য তাঁহারা চাপ গ্রহণ করিতেও কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এই স্বধর্ম্মচ্যুতিরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁহারা হাতে হাতে পাইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণগণের এই একাধিপত্য প্রিয়তার জন্য ক্ষত্রিয়গণের সহিত তাঁহাদিগের ঘোরতর শত্রুতা বাধিয়া উঠিল। ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের এরূপ একাধিপত্য অস্বীকার করিলেন। অনেক রক্তারক্তির কথা ব্রাহ্মণ ও পুরাণাদিতে লিখিত আছে। আমরা এখানে দুই একটী মাত্রের উল্লেখ করিব।

ক্ষত্রিয়েরাই প্রথমে এই সংঘর্ষ উপস্থাপিত করেন। ভৃগুবংশীয়েরা কার্ত্তবীর্য্যের পুরোহিত ছিলেন। কার্ত্তবীর্য্য তাঁহাদিগকে অনেক অর্থ দিয়া যান। তাঁহাদিগের অধিকাংশই দানাদি দ্বারা সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন—কেহ কেহ তাহা বিল-মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কার্ত্তবীর্য্যের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ দুঃস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহারা জানিতেন যে ভৃগুবংশীয়গণের নিকট কার্ত্তবীর্য্য-প্রদত্ত ধন আজও মজুত আছে। তাঁহারা ভৃগুবংশীয়গণের নিকট এই ধন চাহিলেন। না পাইয়া শেষে তাঁহাদিগের বাটীর মাটী খুঁড়িতে লাগিলেন। খুঁড়িতে খুঁড়িতে সেই গুপ্ত ধন বাহির হইয়া পড়িল। তখন তাঁহারা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া ভৃগুবংশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—অধিক কি গর্ভস্থ শিশু-সন্তান পর্য্যন্ত মারিয়া ফেলিয়াছিলেন। কেবল দৈব বলে দুই একটী রক্ষা পাইয়াছিল। পরশুরাম তাহার অন্যতর। পরশুরাম ভৃগুকুল-তিলক যমদগ্নির পুত্র। সেই বীরের হৃদয়ে আশৈশব দুর্দ্দমনীয় প্রতিহিংসাবৃত্তি উদ্দীপিত ছিল। যথাকালে তিনি পিতৃকুলের উচ্ছেদের প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার ন্যায় বীর তৎকালে জন্মে নাই। তাঁহার প্রচণ্ড কুঠারের

আঘাতে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইতে লাগিল। শুনিলে হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায় যে. তিনি একবিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া সামন্ত পঞ্চকে পাঁচটী রৌধির হ্রদ প্রস্তত করিয়া, সেই শক্র-শোণিতে পিতৃ-লোকের তর্পণ করিয়াছিলেন *। পরশুরাম নিজে পরম যোগী ছিলেন। এ নরহত্যায়—এ স্বজাতিধ্বংসে—তাঁহার প্রতিহিংসা সাধন ভিন্ন অন্য কোন স্বার্থসাধনের ইচ্ছা ছিল না। তিনি এইরূপে ভারত-ভূমিকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া, ও তাহাতে ব্রাহ্মণের আধিপত্য পুনঃস্থাপিত করিয়া কাশ্যপ মুনির হস্তে সমস্ত ভারতের সাম্রাজ্য অর্পণ পূর্ব্বক মহেন্দ্র পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমিতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

যমদগ্নির মাতা সত্যবতী কান্যকুব্জাধিরাজ কুশিকবংশোদ্ভব গাধির কন্যা। এই গাধির পুত্রেরই নাম প্রখ্যাতকীর্ত্তি বিশ্বামিত্র। সুতরাং পরশুরাম বিশ্বামিত্রের ভাগিনের-পুত্র। পরস্পর এত নিকটসম্বন্ধী হই-য়াও দুই জন দুই প্রতিকূল দিকে ধাবিত হইযাছিলেন। পরশুরাম ক্ষত্রিয়ের ধ্বংসে কৃতসঙ্কল্প, বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণের একাধিপত্য-নাশে গৃহীত-ব্রত। ইক্ষাকুবংশীয় রাজা সুদেশের পৌরহিত্য লইয়া বশিষ্টের সঙ্গে বিশ্বামিত্রের যে ঘোরতর সংগ্রাম হয়, তাহার অনেক কিংবদন্তী পুরাণা-দিতে ব্যক্ত আছে। এখানে তাহার সবিস্তার বর্ণন অনাবশ্যক। এই সংঘর্ষের ফলে বিশ্বামিত্র মহর্ষি হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মর্ষিত্ব বা রাজ-পৌরহিত্য প্রাপ্ত হয়েন নাই। সেইরূপ এই সংঘর্ষকালে কাশী-শ্বর অজাতশক্র—যাঁহাকে কৌশীতকী ব্রাহ্মণে মহর্ষি গার্গ্য অপেক্ষায়ও অধিকতর বেদজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে;—এবং বিদেহরাজ জনক—যাঁহাকে যাজ্ঞবল্ক্য শতপথ ব্রাহ্মণে আপনা অপেক্ষা অধিকতর পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—রাজর্ষি উপাধিমাত্র পাইলেন, কিন্তু ব্রহ্মর্ষি উপাধি পাইলেন না। সুতরাং ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা এক প্রকার অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল। বরং এই বিজয়ে সেই প্রভুত্ব অধিকতর সুদৃঢ় হইল।

---

* মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১১৬—১১৭ অধ্যায়, মহাবীরচরিত ও রঘুবংশ প্রভৃতি দেখ।

এই সংঘর্ষের পূর্ব্বে বর্ণসংমিশ্রণের প্রতিকূলে কোন কঠোর নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু এখন হইতে ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধ স্বধর্ম্মাতিরেকের বিরুদ্ধে নিয়ম করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন না; চতুর্ব্বর্ণের পরস্পরের মধ্যে আদান ও অন্নগ্রহণাদি নিষিদ্ধ করিলেন, এবং কঠোর সামাজিক দণ্ড দ্বারা এই পার্থক্যভাব চিরস্থায়ী করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয় সকল পরশুরামের কুঠারাঘাতে প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছিল। সুতরাং ভারতের শক্তিসামঞ্জস্য নষ্ট হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের দুর্দ্দমনীয় প্রভু-শক্তিকে সংযমিত করিতে ক্ষত্রিয়কুল সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কিন্তু এইরূপ অবস্থা বহুকাল থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণের অত্যাচার যখন একান্ত দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিল, তখনই কপিলবাস্তু নগরের অধীশ্বর শুদ্ধোদনের পুত্র ক্ষত্রিয়কুলতিলক শাক্যসিংহ বর্ণত্রয়ের কষ্ট নিবারণার্থ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

ব্রাহ্মণগণের একাধিপত্যপ্রিয়তাই ভারতে শাক্যসিংহ-প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম্মের আশুকৃতকার্য্যতার প্রধান কারণ। 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ জ্ঞানী; অভেদ বুদ্ধির ভাব সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার অন্তরে উদিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি আদি বুদ্ধ বলিয়া প্রথিত। তিনি প্রচার করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সব সমান। চতুর্ব্বর্ণের নিকট তিনি এই সাম্য গান গাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ দীন দুঃখী অবহেলিত ও পদদলিত শূদ্রজাতির নিকটই তিনি এই নব ধর্ম্মের সবিশেষ প্রচার আরম্ভ করিলেন। এই গানের এমনই মোহিনী শক্তি যে, এ গান যখন যে দেশে যিনিই গাইয়াছেন, তিনিই জগৎকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছেন। খ্রীষ্ট, চৈতন্য, গুরুগোবিন্দ, শাক্যসিংহ, মহম্মদ, শঙ্কর ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি সকলেই এই সাম্যধর্ম্মের প্রচারক। প্রত্যেকেই এই নূতন গানে জগৎকে মাতাইয়া গিয়াছেন। প্রত্যেকেরই ছবি আজও জগতের কোন কোন স্থানে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। বৈষম্য-দগ্ধ জগতের আজও তাহা একমাত্র আশাস্থল।

ব্রাহ্মণ ও বেদের বিরুদ্ধেই শাক্যসিংহের অভ্যুত্থান। বৈষম্যের

আকর ব্রাহ্মণজাতি, এবং বেদ তাঁহাদিগের আধিপত্য সংরক্ষণের প্রধান দুর্গস্বরূপ; সুতরাং এ দুইই উড়াইয়া দিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি এই সুমহৎ ব্রত উদ্যাপনা জন্য রাজসিংহাসন, প্রাণময়ী ভার্য্যা, প্রাণাধিক পুত্র, স্নেহময় জনক জননী সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অতি কঠোর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন। নিজে আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া তিনি জগৎকে আত্মত্যাগ শিখাইলেন। বৈষম্যপূর্ণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রত্যেককে যে কঠোর সামাজিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, এই নব ধর্ম্ম তাহা খুলিয়া দিল। নবীন উৎসাহে ভারত মাতিয়া উঠিল। সম্রাট হইতে কুটীরী পর্য্যন্ত সকলেই এই নব ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। বুদ্ধ শুদ্ধ পুরুষজাতির পায়ের বন্ধন খুলিয়া দিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন নাই। তিনি স্ত্রীজাতিকেও সকল বিষয়ে পুরুষের সমান অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের জয়পতাকা লইয়া বৌদ্ধপ্রচারক ও বৌদ্ধ প্রচারিকাগণ ভারত আলোড়িত করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাহাদিগের প্রচারকার্য্য ভারতের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রহিল না। দেশ দেশান্তরে ও দ্বীপ দ্বীপান্তরে তাহা প্রসৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। আজ দুই একটী মুক্তিফৌজ দেখিয়া ভারতবাসী অবাক্ হইতেছে, কিন্তু কত বৌদ্ধ মুক্তিফৌজ যে জগৎকে বিমুগ্ধ করিয়া বেড়াইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সেই মোহমন্ত্র আজও মানবজাতির তৃতীয়াংশকে বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছে। আজও যেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল, সেই খানেই জাতীয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বর্ত্তমান। চীন জাপান প্রভৃতি তাহার নিদর্শন। ভারতে যে ছয় সাত শত বৎসর এই ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, সেই ছয় সাত শত বৎসরই ভারতীয় ইতিহাসের উজ্জ্বলতম কাল। ভারতের বাণিজ্যপোত, ভারতের রণতরী, ভারতের মুক্তিফৌজ এই সময়ই জগৎ আলোড়িত করিয়া বেড়াইয়াছিল। এই সময়েই শিল্পের চরমা কাষ্ঠা হইয়াছিল। এই সময়েই বিদ্যার বিমলজ্যোতি সর্ব্বশ্রেণীতে এবং স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিতে সমভাবে বিকীরিত হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থকার গ্রন্থকর্ত্রী শূদ্রজাতি হইতে উৎপন্ন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবে ভারতের এরূপ অভ্যুদয়

হইয়াছিল যে, গ্রীক নরপতিগণ ভারতীয় নরপতিগণের নিকট সন্ধি-প্রার্থী হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাচুর্ভাব-কালেই ভারত সিংহল জয় করিয়াছিল, এবং অজেয় সেকন্দর সাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু এই সৌভাগ্য ভারতের দুরদৃষ্টবশতঃ চিরস্থায়ী হইল না।

এই সাম্যতন্ত্ররূপ প্রকাণ্ড বিপ্লব ছয় সাত শত বৎসরমাত্র ভারতে রাজত্ব করিয়া ব্রাহ্মণের বুদ্ধির নিকটই পরাজয় স্বীকার করিল। সকলেই বোধ হয় জানেন যে প্রসিদ্ধনামা শঙ্করাচার্য্যই অলৌকিক প্রতিভাবলে আর্য্য-সাম্য-বায়বাস্ত্রে বৌদ্ধ সাম্য-বরুণাস্ত্র উড়াইয়া দিলেন। 'বিষস্ত 'বিষমৌষধম্' বিষ দ্বারায় বিষ নষ্ট করার ন্যায় এক প্রকার সাম্য-প্রচার দ্বারা অন্য প্রকার সাম্য বিলুপ্ত করিলেন। বুদ্ধ গাইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র সকলেই সমান। শঙ্করাচার্য্য গাইলেন—"ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্' এক ব্রহ্মই সত্তা; অপর সমস্তই সত্ত্বাভাস, প্রকৃত সত্তা নহে; জড়, অজড় সমস্তই এক ব্রহ্মময়। এই যে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ দেখিতেছ—এ সেই ব্রহ্ম বই আর কিছুই নয়। প্রকৃতি ভ্রমমাত্র পুরুষই একমাত্র সত্তা;—অর্থাৎ যাহাকে তোমরা প্রকৃতি বলিতেছ, তাহা প্রকৃতি নহে—পুরুষ বা ব্রহ্ম—প্রকৃতি পুরুষ ভেদজ্ঞান অজ্ঞানের কার্য্য। এই মহা অস্ত্রের নিকট বৌদ্ধ অস্ত্র পরাস্ত হইল। যখন সবই এক—যখন জড়, অজড় সবই ব্রহ্ম বই আর কিছুই নহে—তখন ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে, সভ্য ও অসভ্যে, দীন ও দরিদ্রে স্ত্রী ও পুরুষে কেন ভেদ থাকিবে? হঠাৎ যেন ভারতের মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হইল! ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম যেন আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া চির-লালিত বৈষম্য ভুলিয়া গেল। এই অদ্বৈতবাদগহ্বরে বৌদ্ধ সাম্যবাদ বিলীন হইয়া গেল। বৈষম্য-জনিত বিবাদ যেন কোথায় চলিয়া গেল। শূদ্র, যবন, পার্ব্বত্য, বৌদ্ধ সমস্ত সাম্প্রদায়িক নদ নদী যেন এই প্রকাণ্ড অদ্বৈতবাদ মহাসাগরে আসিয়া মিশিয়া গেল। সবই এক—সুতরাং সবই সমান—এই মহামন্ত্র ভারতের সর্ব্বত্র উদ্ঘোষিত হইতে লাগিল। যে ভারতভূমি এত দিন হিন্দু-বৌদ্ধ-সংঘর্ষে রুধির-কর্দ্দমিত হইতেছিল, আজ তাহাতে যেন শান্তিবারি পতিত হ

ধন্য শঙ্করাচার্য্য! ধন্য তোমার বিশ্বপ্রেম! ধন্য তোমার বুদ্ধিবল! তুমি আশৈশব ভারতের মঙ্গল কামনায় দীক্ষিত ছিলে বলিয়া এরূপ অসাধ্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলে। তুমি চণ্ডালের মন্ত্রশিষ্য হইতে কুণ্ঠিত হও নাই বলিয়াই ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল এক করিতে পারিয়াছিলে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম এরূপ মাহাত্ম্য আর কখন দেখাইতে পারে নাই। এ মাহাত্ম্যের এক কণামাত্র আজ ব্রাহ্মণগণে থাকিলে, ভারতের সৌভাগ্যরবি আবার উদিত হইত। এই আত্মধ্বংসকারী আর্য্য ভূমিতে তোমার মত নেতার আবার প্রয়োজন। দেব! তুমি যে অসাধ্য-সাধন করিয়া গিয়াছিলে, তোমার মত লোক ভিন্ন সে অসাধ্য-সাধন আবার করে কে? দেব! আসিয়া দেখ যে, ভারতে তোমার কীর্ত্তি লুপ্তপ্রায়! আবার ভারতবক্ষ ধর্ম্ম-সাম্প্রদায়িকতায় ছিন্ন ভিন্ন। হিন্দু ধর্ম্ম আবার ত্বদঙ্কিত সেই বিশাল বৃত্ত হইতে সঙ্কুচিত হইয়া সঙ্কীর্ণতর বৃত্তাভ্যন্তরে আসিয়া পড়িয়াছে! তুমি এক দিন হিন্দু ধর্ম্মে যে ঔদার্য্য সংক্রামিত করিয়াছিলে, যে ঔদার্য্যগুণে এক দিন হিন্দুধর্ম্ম সমস্ত ভারতবাসীকে অন্তর্লীন করিয়া মানবমণ্ডলীকে কুক্ষি গত করিতে সমুদ্যত হইয়াছিল—আসিয়া দেখ দেব! সে হিন্দুধর্ম্ম এখন কি অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে! কতিপয় সঙ্কীর্ণমনা ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অনৌদার্য্যে ইহা ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর সীমায় আবদ্ধ হইতেছে! তুমি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে যে পরিমাণে তুলিয়াছিলে, প্রতিক্রিয়ার বেগে ইহা সেই পরিমাণে নামিয়া পড়িয়াছে। সেই বর্ণভেদ, সেই জাতিভেদ, সেই স্ত্রী-পুরুষ-বৈষম্য আবার পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। যায় —সব যায়—সোণার ভারত অন্তর্বিচ্ছেদে ছার খার হয়! দেব! একবার আবির্ভূত হইয়া এই বিষম বিপত্তিকালে তোমার হৃদয়ের ধন ভারতকে উদ্ধার কর! আবার নতজানু হইয়া চণ্ডালের নিকট মন্ত্র গ্রহণ কর! আবার ভারতে বিশ্বব্যাপী সাম্যের—বিশ্বজনীন একত্বের—ভেরি বাজাও। খ্রীষ্টান্, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, য়িহুদী, ব্রাহ্ম, পারসীক—ভারতীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে আবার বিশ্বপ্রেম-বলে হিন্দুধর্ম্মের কুক্ষিগত কর! দেব! তাহা না হইলে—আবার বলি—সব রসাতলে যায়।

ব্রাহ্মণ! তুমিই ভারতকে অষ্টপৃষ্ঠে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিলে, তুমিই আবার শঙ্করাচার্য্য রূপে সেই শৃঙ্খল খুলিয়া দিয়াছিলে; আবার শৃঙ্খল পরাইয়াছ,—আবার শঙ্করমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া সেই শৃঙ্খল খোল! তাহা হইলেই তোমার গুরুতর পাপের গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত হইবে! শঙ্করাচার্য্য অসংখ্য ভাঙ্গা দল জোড়া দিয়াছিলেন—ছিন্ন ভিন্ন বিশীর্ণ ভারতকে এক করিয়াছিলেন; সকলকে পায় ধরিয়া ডাকিয়া এক ধর্ম্ম-মন্দিরের ভিতরে আনিয়াছিলেন। সে সময় শঙ্করাচার্য্য ভারতক্ষেত্রে প্রাদুর্ভূত না হইলে, বোধ হয় এত দিন জগতে হিন্দুধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইত। সেই ধর্ম্মবীরের মাহাত্ম্যেই হিন্দুধর্ম্ম নবীন তেজে উঠিয়া কিছু কাল ভারতে সমস্ত সাম্প্রদায়িকতা বিলুপ্ত করে, ভারতের স্তরে স্তরে আবার হিন্দুধর্ম্মের বীজ নিহিত হয়। কিছু কাল ধরিয়া হিন্দুধর্ম্ম শঙ্কর-মাহাত্ম্যে ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী প্রভুতা ভোগ করিয়াছিল। অদ্বৈতবাদময় সাম্যের ভেরি বহু দিন ধরিয়া ভারতের পর্ব্বতে পর্ব্বতে, গুহায় গুহায়, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে উদ্ঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু কি পাপে জানিনা—ইতিহাস আমা-দিগকে সে বিষয়ে সহায়তা করে না—আবার বৈষম্যের ভাব সমস্ত ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে! ব্রাহ্মণ নিজের আধিপত্য রক্ষার জন্য আবার বর্ণ-বৈষম্য-রূপ লূতা-তন্তু-জালে ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন! কৌলীন্যরূপ উপসর্গ আসিয়া আবার বর্ণবৈষম্য-রূপ রোগের সহিত যোগ দিয়াছে।

ব্রাহ্মণেতর বর্ণকে ও স্ত্রীজাতিকে জ্ঞান ভাণ্ডারে প্রবেশ করিতে না দেওয়ার ফল হিন্দুধর্ম্মে সাধারণের এই সহানুভূতি-বিরহ। বলা বাহুল্য যে হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দু-রাজত্বে সাধারণের এই সহানুভূতি-বিরহই ভারতের জাতীয় পতনের মূল। পাণিপথ সমরক্ষেত্রে যে অগণিত হিন্দুসেনা সমবেত হইয়াছিল, যদি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতি ও ব্রাহ্মণ্য রাজত্বের প্রতি তাহাদিগের অবিচলিত ভক্তি থাকিত, তাহা হইলে সে অজেয় সেনাকে পরাস্ত করিতে কাহার সাধ্য হইত? জনসাধারণ যদি না জানিত যে 'রামে মারিলেও মারিবে, রাবণে মারিলেও

মারিবে'—তাহা হইলে আজ বহু কোটী লোক মন্ত্রৌষধি রুদ্ধ-বীর্য্য সর্পের ন্যায় পড়িয়া থাকিত না। বহু কোটী হিন্দু থাকিতে ভারত কখন অনন্তকাল ঘুমাইয়া থাকিত না!

যতদিন না ভারত আবার এক জাতীয় ধর্ম্মের মূলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, যতদিন না আবার ভারতে সাম্যভেরি বাজিতেছে, ততদিন ভারতে জাতীয় জীবনের আশা নাই। সে একীকরণ অদ্বৈতবাদে কি দ্বৈতবাদে, হিন্দুধর্ম্মে কি ব্রাহ্মধর্ম্মে হইবে জানি না। তবে বুদ্ধজেতা শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় নেতার যে প্রয়োজন হইয়াছে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সেই বিশাল হৃদয়, সেই বিশ্বপ্রেম ব্যতীত যে ভারতের ধর্ম্ম-সমীকরণ অসাধ্য তদ্বিষয়ে আর মতদ্বৈধ নাই। অতিবিশাল ও গভীর বৌদ্ধধর্ম্মকেও যে উদার হিন্দুধর্ম্ম একদিন কুক্ষিগত করিতে পারিয়াছিল, সে উদার হিন্দুধর্ম্ম যে ভারতের বিবিধ ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে আবার অন্তর্লীন করিতে পারিবে না—কেমনে বলিব? উপকরণ সামগ্রী সমস্তই হিন্দু-ধর্ম্মের অভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে। তাহার মধ্য হইতে কালের উপ-যোগী দ্রব্য সকল বাছিয়া লইয়া একাগ্রচিত্তে শবসাধনা করিলেই সাধক সিদ্ধি লাভ করিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি খ্রীষ্টানধর্ম্মের দিকে বেশী না গড়া-ইত, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্প্রদায় এই সাধনায় সিদ্ধ হইতেন। কিন্তু তাঁহারা এক্ষণে দিন দিন হিন্দুজাতির সহিত সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ হইয়া পড়িতেছেন। এই জন্য হিন্দুজাতির উপর আর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারি-বেন কি না সন্দেহ-স্থলে দাঁড়াইয়াছে।

ব্রাহ্মণ! তুমি এই সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া শঙ্করাচার্য্যের উদার নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া আর্য্য নামের গৌরব পুনরুদ্ধার কর। বৈষম্যময় ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ভারতের যে অনিষ্ট করিয়াছ, আবার সাম্য-সুধাময় গান গাইয়া সেই গুরুতর পাপের গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত কর! আবার ভারতে নব জীবন সঞ্চারিত হউক!! মিলিত ভারত—ঘনীভূত ভারত—আবার জগতের আরাধ্য হউক!! কে বলিতে পারে, সে দিন আর আসিবে না?

ভারতের জাতীয় ভাষা।

—০০০০—

আমরা অনেক বার লিখিয়াছি ও এখনও স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি যে জাতীয় শিক্ষা ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নতি হইতে পারে না। জাতীয় শিক্ষা দ্বারা আমরা জাতীয় ভাষা দ্বারা শিক্ষা—এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছি। ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত এমন দৃষ্টান্ত দেখায় নাই, যেখানে বৈদেশিক ভাষা দ্বারা একটী জাতি সংগঠিত হইয়াছে। বৈদেশিক ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া দুই চারি জন পণ্ডিত হইতে পারেন, কিন্তু একটী সমগ্র জাতি কখন বৈদেশিক ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারে না। সমস্ত ইউরোপ গ্রীক ও লাটিন ভাষা হইতে অনন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছেন, কিন্তু ইউরোপের জনসাধারণ কখনই রোমীয় বা গ্রীসীয় ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করে নাই। ইউরোপের প্রত্যেক দেশের উন্নতি নিজ নিজ মাতৃভাষার আলোচনায় হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী নিজ নিজ মাতৃভাষাকে রোমীয় ও গ্রীসীয় ভাষা-ভাণ্ডার হইতে রত্নরাজি লইয়া অবিরাম ভূষিত করিয়াছেন কিন্তু কখন রোমীয় বা গ্রীসীয় ভাষাকে জাতীয় ভাষারূপে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন নাই। অথচ রোমীয় ও গ্রীসীয় ভাষার সহিত সমস্ত ইউরোপীয় ভাষার মূলগত ঐক্য আছে। সংস্কৃতের সহিত ভারতীয় ভাষানিচয়ের যে সম্বন্ধ, রোমীয় ও গ্রীসীয় ভাষার সঙ্গেও ইউরোপীয় ভাষাসমূহের সেই সম্বন্ধ। আমরা যেমন সংস্কৃতকে ভারতের চলিত ভাষা করিতে চেষ্টা করি না, সেইরূপ ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীও রোমীয় ও গ্রীসীয় ভাষাকে ইউরোপের চলিত ভাষা করিতে চেষ্টা করেন নাই। যে ভাষার সঙ্গে মৌলিক একতা আছে সে ভাষা যখন আমরা আমাদের চলিত ভাষা করিতে চেষ্টা করি না, তখন মূলগত-সাদৃশ্য-বিরহিত বৈদেশিক ভাষাকে জাতীয় চলিত ভাষা করিতে চেষ্টা করা অপেক্ষা অধিকতর বিড়ম্বনা আর নাই। যাঁহারা এরূপ করেন তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয় উন্নতির

প্রধান অন্তরায়। আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের সুশিক্ষিত সম্প্রদায় বৈদেশিক ভাষায় স্বপ্ন পর্য্যন্ত দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা কথোপকথনে, পত্রলেখনে ও বক্তৃতায় ভুলিয়াও মাতৃভাষা ব্যবহার করেন না। তাঁহারা বলেন বঙ্গভাষা অপুষ্ট, সুতরাং তাহাতে সমস্ত ভাব ব্যক্ত করা যায় না, বিশেষতঃ ভারতবাসী সকলে বাঙ্গালা ভাষা বুঝে না, সুতরাং অগত্যা ইংরাজী ব্যবহার করিতে হয়। বাঙ্গালা ভাষা অপুষ্ট ইহা স্বীকার্য্য, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাতে ভাবব্যঞ্জনে বিরত থাকিলে কোন কালেই ইহার পরিপুষ্টি হইবে না। কারণ অভাবের মোচন না হইলে, চিরকালই সে অভাব থাকিয়া যাইবে। কোন্ স্থানে ভাষার অভাব আছে- সে ভাষায় কথোপকথন, সে ভাষায় চিঠি পত্র লিখন, ও সে ভাষায় হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন না করিলে তাহা কখনই উপলব্ধি হইবে না। প্রকৃতির স্রোত বন্ধ না করিলে, জাতীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ভাষা আপনিই উন্নত হইতে থাকিবে। অন্তরে ভাবান্তরাদি রহিলে সেই ভাবোচ্ছ্বাসের অনুরূপ ভাষা আপনা হইতেই বাহির হইবে। নিষাদকে মৈথুনাসক্ত ক্রৌঞ্চমিথুনের অন্যতরকে বধ করিতে দেখিয়া বাল্মীকির হৃদয়ে কারুণ্য রসের আবির্ভাব হয়,

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"

এই শ্লোক তাহার প্রতিবিম্ব মাত্র। এই উচ্ছ্বাসময় ছন্দোবন্ধন সংস্কৃত ভাষার প্রথম শ্লোক। হৃদ্গত ভাবের প্রতিবিম্ব ভাষারূপ দর্পণে প্রতিফলিত হইবেই হইবে। মুখ ও দর্পণের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকিলে যেমন দর্পণে মুখের ছবি প্রতিবিম্বিত হয় না, সেইরূপ হৃদ্গত ভাব ও জাতীয় ভাষার মধ্যে কোন ব্যবধান থাকিলে হৃদ্গত ভাব জাতীয় ভাষায় প্রতিবিম্বিত হয় না। ইংরাজী ভাষা আমাদের দেশে সেই ব্যবধানের কার্য্য করিতেছে। এই মৃণ্ময় দেউলে আমাদের হৃদ্গত ভাব পতিত হইয়া প্রতিহত হয়, তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয় না।

"প্রভবতি শুচির্বিম্বোৎ গ্রাহেন মৃদাংচয়ঃ"

দর্পণই বিম্বোদ্গ্রহে সমর্থ, মৃৎপিণ্ড বিম্বগ্রহণে সমর্থ নহে।

রূপক পরিত্যাগ করিয়া সহজ কথায় বলি। ভাবস্ফূর্ত্তির সহিত ভাষাস্ফূর্ত্তি আপনিই হইয়া থাকে। ভাষা ভাবব্যক্তির সঙ্কেত মাত্র। ভাবের আবির্ভাব হইলে সঙ্কেতের অভাব হয় না। নূতন ভাব হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে, তদ্‌বোধক নূতন সঙ্কেতের অবতারণায় কোন বাধা নাই। যদি সেই সঙ্কেত জাতিসাধারণ গ্রহণ করিলেন তাহা হইলে তাহা জাতীয় ভাষার অঙ্গীভূত হইল। যদি কেহ সেই সঙ্কেতের পরিবর্ত্তে আরও ভাল সঙ্কেত ব্যবহার করেন, তাহা হইলে প্রথমটী পরিত্যক্ত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে দ্বিতীয়টী ব্যবহৃত হইবে। যদি দুইটীই ভাল সঙ্কেত হয়, তাহা হইলে হয়তঃ দুইটীই পরস্পরের প্রতিবাক্যরূপে ব্যবহৃত হইবে। দুই কিম্বা ততোধিক সঙ্কেতও পরস্পরের প্রতিবাক্য হইতে পারে। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাই। একটী অশ্বাকৃতিবিশিষ্ট জন্তুকে দেখিয়া আমি বলিলাম এই অশ্ব। আর এক জন অন্য সময় বলিল এই ঘোটক। তৃতীয় ব্যক্তি আর এক সময় বলিল এই হয়। তিন ব্যক্তির শব্দই জাতি গ্রহণ করিল। সেই অবধি অশ্ব, ঘোটক, হয় পরস্পরের প্রতিবাক্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সংস্কৃত ভাষায় যে অসংখ্য প্রতিরূপ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার এইরূপে সৃষ্টি হইয়াছে। সাঙ্কেতিক শব্দে যেরূপ দেখাইলাম, যৌগিক শব্দেও সেইরূপ। যিনি যে ভাষা বা পদার্থ বুঝাইবার জন্য যে সঙ্কেত ব্যবহার করিয়াছেন ভারতীয় আর্য্যেরা যত্নপূর্ব্বক তাহাকে ভাষায় স্থান দিয়াছেন। এই জন্যই সংস্কৃত ভাষা এত পরিপুষ্ট, এত সুমধুর, ও এত বৈচিত্র্যপূর্ণ। এরূপ অল্পভাব আছে, ও এরূপ অল্প পদার্থ আছে, যাহা সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় লইয়া ব্যক্ত করা যায় না। বঙ্গ ভাষা সেই সংস্কৃত ভাষারূপ অপূর্ব্ব অলঙ্কারের মধ্যমণি। ইংরাজী ভাষায় এমন অল্পভাব প্রতিবিম্বিত আছে, যাহা সংস্কৃতের আশ্রয়ে বাঙ্গালা ভাষায় প্রতিবিম্বিত করা যাইতে না পারে। হয়ত আজ সেই নব শব্দের অনুরূপ ভাব জাতিসাধারণের মনে উদ্ভূত হইবে না। কিন্তু যখন সে ভাবোদয় হইবে, তখন সে ভাবের অনুরূপ সঙ্কেত ভাষায় রহিয়াছে দেখিয়া জাতীয় হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে।

যাঁহারা সময়ের কিঞ্চিৎ অগ্রে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবদ্দশায় হয়ত তাঁহারা প্রত্যাখ্যাত হইবেন। কিন্তু কাল আসিবেই, যখন তাঁহাদিগের হৃদয়ভাব-দ্যোতক ভাষা জাতিসাধারণ আদর করিয়া লইবে।

কিন্তু তুমি যদি সে পরিশ্রম স্বীকার না করিয়া তোমার হৃদয়ের ভাব করপ্রাপ্ত বৈদেশিক সঙ্কেত দ্বারা ব্যক্ত করিয়া চলিলে, তাহা হইলে তোমার হৃদয়ের ছবি তোমার জাতিতে রাখিয়া গেলে না। বৈদেশিকেরা তোমার হৃদয়ের চিত্র কখন সাদরে বক্ষে ধারণ করিবে না। সুতরাং সে ছবি অচিরে কাল-সাগরে বিলীন হইবে। কিন্তু তুমি যদি একটী নূতন ভাব নূতন সঙ্কেত দ্বারা তোমার জাতীয় ভাষায় ব্যক্ত করিয়া যাও, তোমার জাতি মৃত বন্ধুর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাহা অনন্তকাল বক্ষে ধারণ করিবে।

তবে কেন ভাই এ বিড়ম্বনা? কেন দুই জনে একত্র হইলে জাতীয় সঙ্কেতে উভয়ের মনের দ্বার উভয়ের নিকট উদ্‌ঘাটন কর না? কেন ভাবব্যক্তির অস্ফুটতা লুকাইবার জন্য বৈদেশিক ভাষায় কথা কহিয়া বা লিখিয়া পরস্পর পরস্পরকে ঠকাইবার চেষ্টা কর? কেন কাকাতুয়ার মত পরের বুলি মুখস্থ করিয়া আওড়াইয়া পরস্পরকে ঠকাইবার চেষ্টা কর?

এ জীবন-মরণ সংগ্রামের সময়। পরস্পরকে ঠকাইবার সময় নহে এ দুর্দ্দিনে পরস্পরের অভাব পরস্পরকে জানাইয়া পরস্পরের সাহায্যে সে অভাব মোচন করিয়া লইতে হইবে। জাতীয় দুর্গের যেখানে যে ভাঙ্গা আছে পরস্পর পড়িয়া তাহা সারিয়া লইতে হইবে। পত্রাবরণে সে ভগ্ন স্থান লুকাইলে চলিবে না। ভাষার অভাব থাকে পূরণ করিয়া লও। ভাবের অভাব থাকে ত ভাবিতে আরম্ভ কর। বলের অভাব থাকে ত বলোপচয় কর। পরের বলে, পরের ভাবে, ও পরের ভাষায় মুগ্ধ হইয়া আপনার জাতীয় ভবিষ্যৎ নষ্ট করিও না।

আর যাহারা সুনিপুণ ভাবে বাঙ্গালা ভাষার গতি নিরীক্ষণ করিবেন তাঁহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে বাঙ্গালাভাষার ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। ভারতবর্ষের এমন স্থান নাই—যেখানে বাঙ্গালীর সঙ্গে সঙ্গে

বাঙ্গালা ভাষাও তথায় যায় নাই। যেন ভবিষ্য ভারতীয় ভাষার যোগ্য হইবার জন্য বাঙ্গালা ভাষা ধীরে ধীরে স্ফীতাবয়ব হইতেছে। সংস্কৃতের পর প্রাকৃত, প্রাকৃতের পর পালী, পালীর পর মাগধী, মাগধীর পর মৈথিলী, মৈথিলীর পর বাঙ্গালা। সংস্কৃত ভাষা ক্রমিক আবর্ত্তনে এই বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। হিমালয় হইতে যেন গঙ্গা বাহির হইয়া নানা তীর্থ পর্য্যটন পূর্ব্বক সাগরে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। এক দিকে অত্যুচ্চ গগনস্পর্শী হিমাচল—অন্য দিকে অনন্ত ও অসীম সাগর। সেইরূপ এক দিকে উত্তুঙ্গ সংস্কৃত—অন্য দিকে অনন্ত উন্নতিসহ বাঙ্গালা। কারণের অনুরূপ কার্য্য।

সেই অনন্ত উন্নতিসহ জাতীয় ভাষাকে পদদলিত ও অবহেলিত করিয়া যাহারা পরভাষাকে মস্তকে লইয়া আপনাদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়, তাহাদিগকে আমি "জাত দাস" ভিন্ন অন্য লঘুতর বাক্যে অভিহিত করিতে পারি না।

আমরা ইতিহাস হইতে দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া দেখাইব যে ভাষাবৈষম্য বিদূরিত হওয়া পর্য্যন্ত সেই সেই দেশে জাতীয় একতা সম্পন্ন হয় নাই। ব্রিটনে প্রথমে অনেকগুলি ভাষা ছিল। সে সময় বিভিন্ন-ভাষা-কথন-শীল জাতি-নিচয়ের মধ্যে ঘোর বৈরভাব ছিল। ব্রিটনের প্রধান অঙ্গ ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, ওয়েলস, ও আয়র্লণ্ডে ত চারিটি স্বতন্ত্র ভাষা ছিলই, তদ্ভিন্নও ভাষাগত অনেক অবান্তর ভেদ ছিল। বৈদেশিকের পদার্পণের পূর্ব্বে ব্রিটন্ জাতির একটী ভাষা ছিল। তাহার পর রোমাণেরা আসিয়া সমস্ত আদালতে লাটীন্ ভাষা প্রচলিত করিলেন। রোমান্দিগের পর সাক্সেনেরা আসিয়া সাক্সন ভাষা আদালত ও বিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত করিলেন। তাহার পর নর্ম্মাণেরা আসিলেন—আসিয়া তাঁহারাও সমস্ত আদালতে ও বিদ্যালয়ে নর্ম্মান্ ভাষা প্রচলিত করিলেন। যতদিন এই ভাষাগত পার্থক্য ছিল, ততদিন এই সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে গাঢ়তর বিদ্বেষভাব বর্ত্তমান ছিল। তখন ব্রিটনকে কে চিনিত? পরস্পরের বল পরস্পরের উপর ক্ষয়িত করিয়া ব্রিটন জাতি তখন জাতিগণনায় নগণ্য ছিলেন।

ক্রমে তাঁহারা নিজ নিজ ভুল বুঝিয়া এই সর্ব্বনাশের মূলীভূত কারণ ভাষাবৈষম্য পরিহার করিতে লাগিলেন। টিউডার রাজবংশের সময় এই ভাষাবৈষম্য অপনীত হইতে আরম্ভ হয়—তাই অষ্টম হেন্‌রী ও এলিজেবেথের সময় এত এত বড় বড় গ্রন্থকারের আবির্ভাব হইয়াছিল। মিলনের বলের মধুময় ফল সেক্সপীয়র বেকন প্রভৃতি প্রতিভাশালী গ্রন্থকারগণ। প্রথম জেমসের সময় স্কটলণ্ড ও ইংলণ্ড মিলিত হয়। সেই মিলনের অমৃতময় ফল অতুলনীয় মিলটন্ ও আধুনিক যাবতীয় কবি, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, পুরাবিৎ ও বৈজ্ঞানিকগণ। সেই ভাষাগত মিলনের অপূর্ব্ব পরিণাম ব্রিটনের বর্ত্তমান সৌভাগ্য। ব্রিটন এখন অদ্যাপি-পরিজ্ঞাত জগতের সর্ব্বত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। পৃথিবীর অন্যূন এক চতুর্থাংশে এখন ইংরাজী ভাষা কিছু না কিছু পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আজ যদি ইংলণ্ডে সেই ভাষাগত বৈষম্য থাকিত তাহা হইলে ইংলণ্ডের কখন এরূপ সৌভাগ্য হইত না।

একবার চল প্রাচীন রোমের সৌভাগ্যের মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া দেখি। লাটিন ভাষা প্রথমে ইতালীর একটী ক্ষুদ্র প্রদেশে কথিত হইত। তখন ইতালী অন্তর্বিচ্ছিন্ন, ও প্রাদেশিক বিদ্বেষানলে জ্বলিত। সে সময়ে ইতালীর নাম আল্পসের বাহিরে যায় নাই, ভূমধ্যসাগর পার হইয়া দেশ দেশান্তরেও প্রতিধ্বনিত হয় নাই, কিন্তু যখন লাটিন-ভাষা-কথন-শীল রোমীয় জাতির বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইতালীতে লাটিন ভাষা প্রচলিত হইল, তখন রোম ভুবনেশ্বরী হইয়া উঠিল। লাটিনভাষা তখন জগতে আদৃত হইল। তখন অসংখ্য পদ্য ও গদ্য লেখক—অসংখ্য ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ এবং অসংখ্য বৈজ্ঞানিক ও বাগ্মিক ইতালীক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাদিগের প্রতিভাবলে নূতন ইউরোপ সৃষ্ট হইল। ইয়ুরোপের বর্ত্তমান উন্নতির একটী প্রধান কারণ লাটিনভাষা। ইয়ুরোপীয় অধিকাংশ দেশেই লাটিন গ্রন্থসকল অনুদিত বা অনুকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় জাতিনিচয়ে লাটিন ভাষারূপ ফটোগ্রাফ যন্ত্রে সেই প্রাচীন রোমীয় জাতির ছবি পূর্ণ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে—তাই আজ ইয়ুরোপের এত সমৃদ্ধি! তাই আজ ইয়ুরোপের এত প্রতাপ।

একবার ভারতের পূর্ব্বাবস্থা আলোচনা করি। যখন আর্য্যেরা প্রথমে ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন সংস্কৃত তাঁহাদিগের কথিত ভাষা ছিল। আর্য্যঋষিগণের জলন্ত হৃদয়ভাব ঋগ্‌বেদে প্রতিবিম্বিত। ঋষিরা বেদিতে বসিয়া সেই জ্বালাময়ী ভাষায় হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়া সম্মিলিত ঔপনিবেশিকগণের মনে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বা বীরবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া দিতেন। তাঁহাদিগের সেই উন্মাদিনী ভাষায় উত্তেজিত হইয়া কতিপয় মাত্র আর্য্য ঔপনিবেশিক অমানুষ অবদানপরম্পরা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ভাষাগত সাম্য সেই আর্য্যজাতিকে অচিরকালমধ্যে অদ্বিতীয় শক্তি করিয়া তুলে। যতদিন তাঁহারা সারস্বত প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহারা এই ভাষাগত সাম্যে নিবিড়রূপে ঘনীভূত ছিলেন। তখন তাঁহাদিগের উন্নতির সীমা ছিল না—সৌভাগ্যেরও সীমা ছিল না। ক্রমে বিজয়মার্গে অগ্রসর হইয়া তাঁহারা পরস্পর হইতে বহুদূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন। আদিম জাতির সহিত সংমিশ্রণে তাঁহাদিগের পবিত্র দেবভাষা ক্রমে অসংখ্য প্রাকৃত ভাষায় (Dialects) পরিণত হইল। গৌড়ী, সৌরসেনী, মাগধী, মৈথিলী, পালী প্রভৃতি অসংখ্য প্রাকৃত ভাষা আর্য্য জাতির বিস্তৃতি ও আদিম জাতিনিচয়ের সহিত সংমিশ্রণের ফল। অসংখ্য প্রাদেশিক ভাষায় সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যজাতির অন্তর্বিচ্ছেদ আরম্ভ হয়। ভাষাবৈষম্যের বিষময় ফল প্রাদেশিক বিদ্বেষ। সেই প্রাদেশিক বিদ্বেষ হইতেই ভারতের জাতীয় পতন সংঘটিত হইয়াছে। পরস্পর-ঘনীভূত একভাষাকথনশীল আর্য্যজাতি ক্রমে পরস্পর-মমতাশূন্য বিভিন্ন-ভাষা-কথন-শীল অসংখ্য জাতিতে পরিণত হইয়া পরস্পরের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। বর্গী আসিয়া বঙ্গদেশ ছারখার করিল জয়চন্দ্র দিল্লীর সিংহাসন যবনকে বিক্রয় করিল—অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্তর্জাতীয় উপদ্রব ত গণনা করিয়া উঠা দায়। এখনও ভাষাগত বৈষম্যে ভারতের অস্থিমজ্জা জর্জ্জরিত। ভাষাবৈষম্যে ভারতের পতন হইয়াছে—ভাষাজনিত সাম্য ব্যতীত ভারত সঞ্জীবিত হইতে পারে না।

ভাষাসাম্য যে জাতীয় একতার অপরিহার্য্য উপাদান তদ্বিষয়ে মত-

দ্বৈধ নাই। তবে কোন্ ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষা হইবে তদ্বিষয়ে ঘোরতর মতভেদ বর্ত্তমান। কেহ সংস্কৃত, কেহ হিন্দী, কেহ উর্দ্দু, কেহ বা ইংরাজীকে ভারতের ভবিষ্য জাতীয় ভাষা বলিয়া প্রখ্যাত করিয়াছেন। কিন্তু আমার ক্রমে বিশ্বাস জন্মিতেছে যে বাঙ্গালা ভাষাই ভবিষ্যতে ভারতের জাতীয় ভাষা হইবে। এ বিশ্বাস অমূলক নহে। যাঁহারা নিপুণ চিত্তে ভারতীয় ভাষানিচয়ের সহিত আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার তুলনা করিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, লিখিত বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন অন্যান্য সমস্ত ভারতীয় ভাষা অপেক্ষা, সংস্কৃতের অধিক নিকটবর্ত্তী। সুতরাং অধিকতর পরিমার্জ্জিত ও ভাবব্যঞ্জক। সংস্কৃত অপেক্ষা অধিকতর পূর্ণ ভাষা আজও পৃথিবীতে জন্মে নাই। যে ভাষা সেই ভাষার অধিকতর অনুগামী, তাহা জগতের বর্ত্তমান ভাষা মাত্রেরই উপরে যে অচিরাৎ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে তদ্বিষয়ে সংশয় অল্প। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন অন্যান্য ভাষার শুদ্ধ যে ধাতু বিকৃত হইয়াছে এরূপ নহে, অনেক শব্দও বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালায় শব্দের বিকার হয় নাই। যিনি সংস্কৃত জানেন, তাঁহার পক্ষে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করা অতি সহজ। যিনি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন যে কোন ভাষা পড়িয়াছেন, তাঁহার পক্ষেও বাঙ্গালা সহজবোধ্য। কারণ উভয় ভাষার শব্দগত অনেক সাদৃশ্য আছে। দুরধিগম্য সংস্কৃত ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না। উর্দ্দুতে অনেক পারস্য ও আরবী কথা থাকায় তাহা হিন্দুবহুল ভারতের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না। বৈদেশিক ভাষা জাতীয় হৃদয়ের অন্তস্থল কখন স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং ইংরাজীরও কখন ভারতের জাতীয় ভাষা হইবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে রহিল বাঙ্গালা ও হিন্দি—ভারতের ইংরাজী ও ফরাসী। আমরা একবার বলিয়াছি এতদুভয়ের মধ্যে বাঙ্গালা অধিকতর পরিমার্জ্জিত, অধিকতর পরিপুষ্ট, সুতরাং অধিকতর ভাবব্যঞ্জক; আবার সেই বাক্য পুনরুক্ত করিলাম। অধিকতর পরিপুষ্ট ও অধিকতর ভাবব্যঞ্জক বলিয়াই বাঙ্গালাভাষা ত্বরিতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। কি গদ্য, কি পদ্য, কি ইতিহাস,

কি পুরাবৃত্ত, কি দর্শন, কি বিজ্ঞান, কি সমাজনীতি, কি রাজনীতি, সকল বিষয়েই বঙ্গভাষায় ভূরি ভূরি পুস্তক লিখিত হইতেছে। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সময় হইতে আধুনিক বাঙ্গালার সূত্রপাত। তখনও ইহা মৈথিলীগন্ধবিশিষ্ট ছিল। চৈতন্যের ধর্ম্ম প্রচারের সময় ইহা অধিকতর পরিপুষ্ট হয়। চৈতন্যের সময় হইতে ভারতচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত ইহার কিঞ্চিৎ গতিমান্দ্য উপলক্ষিত হয়। ভারতচন্দ্রের সময় হইতেই ইহা বেগবতী হইতে আরম্ভ হয়। রামমোহন রায়ের সময় এই বেগ খরতর হইয়া উঠে। সেই অবধিই বাঙ্গালা ভাষা প্রচণ্ড স্রোতস্বিনীর ন্যায় উন্নতি-সাগরাভিমুখে প্রবল বেগে ধাবিত হইয়াছে। সে আজ অর্দ্ধ শতাব্দী মাত্র হইবে—ইহার মধ্যে অসংখ্য প্রতিভাশালী লেখক বাঙ্গালা ভাষাকে বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর, মদনমোহন, অক্ষয়কুমার, দীনবন্ধু, বঙ্কিম, মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রভৃতি প্রতিভাশালী লেখকমণ্ডলীর আবির্ভাব এই অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যেই। যেরূপ ত্বরিতগতিতে বাঙ্গালা অগ্রসর হইতেছে ইহাতে আর কোন ভারতীয় ভাষার বাঙ্গালার সমকক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি উৎসাহ পায়, যদি গৃহমধ্য হইতেই বাধা না পায়, তাহা হইলে বাঙ্গালা অচিরকালমধ্যে অন্যান্য ভারতীয় ভাষাকে কুক্ষিগত করিয়া লইতে পারে—জাতীয়সম্মিলনের প্রধান অন্তরায় ভাষাবৈষম্যকে বিদূরিত করিয়া অপূর্ব্ব ভারতীয় জাতীয় ভাষার সৃষ্টি করিতে পারে। বাঙ্গালা বহিশ্চর ও আভ্যন্তরীণ অনেক বাধা বিপত্তি সত্বেও ক্রমিক অগ্রসর হইতেছে। বহিশ্চর বাধার উপর আমাদের কর্ত্তৃত্ব নাই, কিন্তু আভ্যন্তরীণ বাধা আমরা ইচ্ছা করিলেই অপনীত করিতে পারি। উপরে যে বৈদেশিক ভাষার উল্লেখ করিলাম, তাহা বৈদেশিক-শাসন-জনিত। বৈদেশিক রাজার স্বার্থ জাতীয়ভাষার ধ্বংসে বৈদেশিক ভাষা বহুল প্রচার। বৈদেশিক রাজার স্বার্থ ভাষাবৈষম্য চিরস্থায়ী করা। কারণ বিভিন্ন ভাষা স্বত্বে ঘনীভূত মিলনের কোন সম্ভাবনা নাই এইজন্য গবর্ণমেণ্ট ভারতের অপরিপুষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাদেশিকে ভাষাগুলিকে অতি যত্নে পরিরক্ষিত করিতেছেন। আসামী ও উড়িয়া ভাষার সহিত বাঙ্গালা ভাষার অনেক সৌসাদৃশ্য।

গবর্ণমেণ্টের বিপরীত চেষ্টা সত্ত্বেও আসামী ক্রমে বাঙ্গালার কুক্ষিগত হইতেছে। উড়িয়াও এত দিন কুক্ষিগত হইত, কিন্তু বর্ণমালার আকার-গত বৈষম্য নিবন্ধন তাহার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতেছে মাত্র। বাঙ্গালার অতি সরল ও সুন্দর বর্ণমালা একদিন নিশ্চয়ই জটিল ও কদাকার উড়িয়া বর্ণমালাকে পর্য্যুদস্ত করিবে। দেবনাগর বর্ণমালা অপেক্ষাও বাঙ্গালা বর্ণমালা অধিকতর সরল, অথচ সমানই সুন্দর। সুতরাং হিন্দীর দেবনাগর বর্ণমালাও Survival of the fittest মতানুসারে কালে বিলীন হইয়া যাইবে। যেমন ওল্ড ইংলিস বর্ণমালা অধিকতর ornamental বলিয়া রোমীয় বর্ণমালা দ্বারা পর্য্যুদস্ত হইয়াছে, সেইরূপ অধিকতর অলঙ্কৃত দেবনাগর বর্ণমালা সরলতর বাঙ্গালা বর্ণমালা দ্বারা একদিন নিশ্চয়ই বিতাড়িত হইবে। বৈদেশিক রাজার কৌশলে এ শুভদিন আসিতে বিলম্ব হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু এরূপ দিন যে আসিবে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার জাতীয় ভাষা হওয়ার অনুকূলে আর একটী যুক্তি এই যে বাঙ্গালা ভারতের রাজধানীর ভাষা। রাজধানীর ভাষাই সকলকালে সকল দেশেই জাতীয় ভাষারূপে পরি-ণত হইয়াছে। বৌদ্ধ বিপ্লবের সময় পালি ভাষা রাজধানীর ভাষা ছিল, সুতরাং পালি তৎকালে সর্ব্বতঃপ্রসারী হইয়া উঠিয়া ছিল। সেইরূপ মাগধী, মৈথিলি, ও গৌড় প্রভৃতি ভাষাও যখন যখন রাজধানীর ভাষা হইয়াছিল, তখনই সেই সেই রাজধানীর অন্তর্গত প্রদেশসমূহের ভাষা-রূপে পরিণত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট দ্বৈকেন্দ্রিক নীতি (Decent-ralization policy) অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালার বিস্তৃতি দূর-বিলম্বিত করিতে পারেন বটে কিন্তু এ গতি একেবারে রোধ করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না। ভারতের রাজধানীর ভাষা বাঙ্গালা একদিন ভারতের জাতীয় ভাষা হইবেই হইবে। ইংরাজী ভাষা ও ইতালীয় ভাষা এ বিষয়ে আমাদের পূর্ব্ব নিদর্শন। আইস ভাই! আমরা আভ্যন্তরীণ অন্তরায়-গুলি বিদূরিত করিয়া বাঙ্গালা ভাষার সেই সৌভাগ্যের দিন শীঘ্র আন-য়ন করি। আইস ভাই! আমরা মাতৃভাষাকে পূজা করিতে শিখাই। ভারতীয় আর্য্যেরা সংস্কৃত ভাষাকে দেবভাষা বলিয়া ভক্তি করিতেন,

তাই সংস্কৃত আজও ভাষাজগতের শীর্ষস্থানীয় রহিয়াছে। সেই সংস্কৃতের খাতিরে আজও আমরা সভ্য জগতের গৌরবভাজন। সেই সংস্কৃতের খাতিরে আজও আমরা বিজেত্রী জাতির আদর-ভাজন। সংস্কৃত ভাষার পুণ্যবল না থাকিলে এতদিন হয়ত আমরা আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণের দশা প্রাপ্ত হইতাম। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদিগকে আর কিছুই দিয়া যান নাই, কেবল অনন্ত-রত্ন প্রসবিনী ভারতভূমি ও অনন্ত-রত্ন-গর্ভ সংস্কৃত ভাষা রাখিয়া গিয়াছেন। এই দুই এর কর্ষণ ও মন্থনে আমাদের সমস্ত জাতীয় অভাব বিদূরিত হইবে। আইস আমরা সেই অনন্ত রত্নাকর হইতে রত্নরাজি আহরণ করিয়া মাতৃভাষার অঙ্গ ভূষিত করি। কত কত গভীর চিন্তা সংস্কৃতভাষার অভ্যন্তরে বিলীন হইয়াছে, আমরা আজও তাহার সহস্রাংশও মাতৃভাষায় প্রতিফলিত করিতে পারি নাই। পারি নাই তাহার কারণ মাতৃভাষার অনাদর। যিনি সে কার্য্যে ব্রতী হইবেন তিনিই অনাহারে মরিবেন। কারণ বাঙ্গালী আজও বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক ভিন্ন অন্য পুস্তক কিনিতে শিখে নাই। শুদ্ধ যে আমরা উচ্চ সাহিত্যের লেখকগণকে অনাহারে মারি তাহা নহে, আমরা অনেক সময় তাঁহাদিগের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইয়া থাকি। যিনি বাঙ্গালানবিশ বঙ্গসমাজে তাঁহার বড় অনাদর। বাঙ্গালানবিশ বঙ্গ সমাজে অবজ্ঞা-সূচক উপাধি। যিনি ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন, ও ইংরাজীতে লিখেন, তাঁহার সমাজে অধিকতর সম্মান। যেন ভাবের কোন মাহাত্ম্য নাই, ভাষারই মাহাত্ম্য। যেন কোন মহান্ ভাব জাতীয় ভাষায় ব্যক্ত করিলে তাহার মাহাত্ম্য কমিয়া যায়! যেন কোন ভাব অধিক লোকে বুঝিলে ভাবপ্রকাশকের গৌরব কমিয়া যায়। যেন মনে মনে শঙ্কা পাছে দাস জাতির ভাষা ব্যবহার করিতে দেখিলে বৈদেশিকেরা আমাদিগকে দাস বলিয়া ঘৃণা করিবে। কিন্তু দাস! কতকাল এরূপ ময়ূর পুচ্ছে নিজ কাকত্ব লুকাইবে? কতকাল পরের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া আপনাকে সুন্দর দেখাইতে চেষ্টা করিবে? যাহা তোমার নয়, কখন তোমার হইবে না ও হইতেও পারে না, তাহার গর্ব্বে অভিভূত হইয়া নিজের কাপুরুষত্ব আর কতকাল দেখাইবে? তাই বলিতেছি আইস ভাই!

আমরা আপন জিনিসকে আদর করিতে শিখি। যে মাতৃভাষাকে আমরা অনাদর করিলে, জগৎ অনাদর করিবে, সে মাতৃভাষার গৌরব বর্দ্ধন করিতে শিখি। যে মাতৃভাষাকে আমরা সুশোভিত না করিলে আর কেহ সুশোভিত করিবে না, নানা দেশ হইতে রত্নরাজি আহরণ করিয়া তাহাকে সাজাই। নানা ভাষার মুকুটমণি আনিয়া সেই অনাদৃতা মাতৃভাষার শিরোভূষণ করি। যে চিত্রকর তাহাকে ভাল বর্ণে ফলিত করিতে পারিবেন, যে শিল্পকর তাহাকে বিচিত্র অলঙ্কারে বিভূষিত করিতে পারিবেন, ও যে উপাসক সেই উজ্জ্বল-বিচিত্রালঙ্কার-ভূষিত প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন, আইস ভাই! আমরা তাঁহাদিগের পূজা করিতে শিখি। যদি সেই প্রতিমাকে জগন্মনোমোহিনী ও উদ্দীপনাময়ী করিতে চাও, তবে সেই প্রতিমার নির্ম্মাতাগণকে পর্য্যাপ্ত আহার প্রদান কর। যাহাতে তাঁহারা অনন্যমনে সেই প্রাণ-প্রতিষ্ঠাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন তাহার উপায় করিয়া দেও। অনাহারে যাহার নিজের প্রাণ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, সে কখন অপরের প্রাণসঞ্চার করিতে পারে না। দিবারাত্র যাহার অন্নচিন্তায় অতিবাহিত হয়, সে কিরূপে এ কঠোর শবসাধনায় সিদ্ধ হইবে? অন্যকার্য্যে যাহার জীবনী শক্তি ক্ষয়িত হইতেছে, তাহার ক্ষীণ স্বরে বহুদিনের পতিত জাতি কি উঠিতে পারে? যাহার মস্তিষ্ক লেখনীশলাকায় অবিরাম বিদ্যুৎ উদ্গীরণ করে, ভারতে এরূপ লোকের এক্ষণে বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। সে তাড়িত-প্রবাহ অন্য দিকে ব্যয়িত হইলে ভারতের সুখের দিন আসিবার অনেক বিলম্ব পড়িয়া যাইবে। তাই বলিতেছি আইস ভাই! আমরা এখন হইতে জাতীয় ভাষার উন্নতিসাধনে আত্মোৎসর্গ করিতে শিক্ষা করি। ওহাবীরা ধর্ম্মার্থে প্রতি গৃহস্থ প্রতিদিন এক মুষ্টি করিয়া চাউল রাখিয়া দেয়। সেইরূপ আইস আমরা এখন হইতে জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধনার্থ প্রত্যেক মুষ্টিপরিমিত চাউল সঞ্চিত করি। আইস আমরা এইরূপে সঞ্চিত চাউল বিক্রয় করিয়া প্রতিগৃহে একটী করিয়া পুস্তকালয় সংস্থাপিত করি। কেহ টের পাইবে না, অথচ অচিরকালমধ্যে প্রতিগৃহ অচিরাৎ পুস্তকরাশিতে পরিপূরিত

হইবে। চতুর্দ্দিক্ হইতে তখন উৎকৃষ্ট গ্রন্থের পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকিবে। অন্তর্নিগূহিত জাতীয় প্রতিভা তখন দ্বাদশরুদ্রের উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইবে। সেই তাড়িত যন্ত্রের (Battery) অবিরাম প্রয়োগে অচেতন ভারত পুনর্জ্জীবিত হইবে। বিধাতঃ! ভারতের ভাগ্যে তুমি কি এ সৌভাগ্য লেখ নাই। না! তা ভাবিতে পারি না। যে বিধাতা ভারতকে এক দিন জগতের অধীশ্বরী করিয়াছিলেন, যে বিধাতা ভারতের পূর্ব্বভাষাকে দেবভাষায় পরিণত করিয়াছেন, যে বিধাতা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে আজও ভারতকে জগতের শীর্ষস্থানীয় করিয়া রাখিয়াছেন, সে বিধাতা যে ভারতকে আর উঠিতে দিবেন না—তাহা কখন বোধ হয় না।—কখনই নহে। ভারত আবার উঠিবে—আবার জাতিগণনায় অগ্রণী হইবে—আবার সভ্যতা-লোকে জগৎ ঝলসিত করিবে—আবার তাহার জাতীয় ভাষা যুগপৎ অমৃতবর্ষণ ও বিদ্যুদুদ্গীরণ করিবে! সে জাতীয় ভাষা বাঙ্গালা হইবে কি না, তাহা সম্পূর্ণরূপে বঙ্গবাসীর করায়ত্ত!

অভিযান ও সারস্বত উৎসব।*

সন্তানগণ! আজ আমরা যে অভিযানিক যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম, ইহা সামান্য অভিযান নহে। বিজয়োদ্যত সেনা বিজয় পিপাসায় প্রমত্ত হইয়া শত্রু বিরুদ্ধে যে অভিযান বা মার্চ্চ (march) করে, ইহা সে অভিযান নহে। আমরা আজ যে অর্থে এই অভিযান শব্দ প্রযুক্ত করিলাম, এ অর্থে অভিযান শব্দ পূর্ব্বে কখন প্রযুক্ত হয় নাই। সুতরাং অভিধান খুঁজিয়া অভিযানের এ অর্থ পাইবে না। হৃদয়ের উৎস হইতে অভিযানের যে অর্থ উদ্ভূত হইয়াছিল, অনেক দিনের সাধনাবলে আজ অভিযান শব্দ সেই অর্থে কার্য্যতঃ প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া জীবন সার্থক বোধ করিলাম।

---

* এই প্রবন্ধটী ময়মনসিংহ সারস্বত সমিতির উদ্বোধন-উপলক্ষে পঠিত হয়।

আমরা যে অর্থে অভিযান শব্দ অদ্য কার্য্যতঃ প্রযুক্ত করিলাম, তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতেছি। অভি পূর্ব্বক 'যা' ধাতুর উত্তর শান্‌চ প্রত্যয় করিয়া অভিযান শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং ইহার যৌগিক অর্থ কাহারও অভিমুখে গমন করা। ইহার রূঢ় অর্থ এক দল সৈন্যের শত্রু অভিমুখে গমন। আজ আমরা এই রূঢ় শব্দের পরিবর্ত্তন করিয়া এই অর্থে ইহাকে ব্যবহার করিলাম—এক হৃদয়দলের অন্য হৃদয়দলের অভিমুখে গমন। আমরা অপগণ্ড ভারত সন্তান এত দিন নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম। আজ আমাদের কোন দৈবী শক্তিবলে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। কে যেন আমাদের অঙ্গে সম্মোহন অস্ত্র প্রযুক্ত করিয়াছিল—তাই আমরা এত দিন চেতনা-হারা হইয়া পড়িয়াছিলাম—আমাদের অঙ্গের বেশভূষা রত্নাভরণ সেই অবসরে কে লুটিয়া লইয়া গিয়াছে। এত দিন আমরা মৃতপ্রায় পড়িয়াছিলাম—সংজ্ঞা ছিলনা—সুতরাং কিছুই জানিতে পারি নাই—এবং প্রতিবিধানও করিতে পারি নাই। সহসা নিদ্রাভঙ্গে দেখি—আমরা লগ্নকায়, লগ্নপদ এবং রাজরাজেশ্বরীর সন্তান হইয়াও নিরাভরণ পড়িয়া আছি। তখন দরবিগলিত অশ্রুধারায় আমাদের বক্ষ ভাসিয়া গেল। ক্রন্দনে আমাদের এত দিন অতীত হইয়াছে। আজ আমরা বুঝিয়াছি যে বসিয়া শুদ্ধ কাঁদিলে চলিবে না। আমাদের ভাই ভগিনীগণের সকলেরইত এই দশা ঘটিয়াছে। সুতরাং এস ভাই! আমরা কে কোথায় পড়িয়া আছে—কে কোথায় পড়িয়া কাঁদিতেছে—দেখিয়া আসি, যে উঠিতে পারিতেছে না চল আমরা, গিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া তুলি; যে কাঁদিতেছে তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিই; আশ্বাসবাক্যে তাহার শুষ্কপ্রায় হৃদয়কে সঞ্জীবিত করি। চল ভাই! আমরা যে দল উঠিয়াছি—সেই দলের সঙ্গে অন্য দলের যোগ সাধনা করি। ভারতের সমস্ত হৃদয়-স্রোতস্বিনী একত্র মিলাইয়া এক নূতন মহাসাগর উৎপন্ন করি। এক হৃদয়-স্রোতস্বিনীর অন্য হৃদয়-স্রোতস্বিনীর অভিমুখে যে গমন—তাহাই আমাদের আজকার অভিযানের প্রতিপাদ্য। ইহা রাজসিক বা তামসিক নহে। ইহা পূর্ণ সাত্ত্বিক। ইহার সহিত সামরিক ভাবের বা বীর রসের কোন সংস্রব

নাই। করুণ রসই এ অভিযানের জীবন—সুতরাং নিরস্ত্র বলিয়া আমা-
দের দুঃখিত হইবার কারণ নাই। যোগসিদ্ধ না হইলে অস্ত্র গ্রহণ
নিবিদ্ধ। যত দিন আমরা যোগসিদ্ধ না হইব—তত দিন আমরা
বালক—কৃপার পাত্র। পঞ্চবিংশতি কোটী হৃদয় পরস্পর সংযুক্ত হইলে,
আমাদের কিসের অভাব? সুতরাং আমাদের প্রথম কার্য্য এই যোগ
সাধনা। এত দিন আমরা শুষ্ক ভাবময় জীবনে সময় অতীত করি-
য়াছি,—আজ আমাদের কার্য্যময় জীবন আরম্ভ হইল। তাই আজ
আমরা দ্বারে দ্বারে অভিযান করিয়া দূরবিক্ষিপ্ত হৃদয়-কলিকাগুলি কুড়া-
ইয়া লইয়া আজ ভগবতী সরস্বতী দেবীর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হই-
য়াছি। যে সরস্বতী দেবীর বরে আজ ইউরোপ ও আমেরিকা—এসি-
য়ায় ও আফ্রিকায় কর্ত্তৃত্ব করিতেছে,—যে ভগবতী সরস্বতীর কৃপায়
প্রাচীন আর্য্যেরা জগতে অজেয় ছিলেন, আজ সেই ভগবতী সরস্বতীর
মন্দিরে আসিয়া তাঁহার নিকট জ্ঞানভিক্ষা করিতেছি। বিনা জ্ঞানে
কোন জাতি উঠিতে পারে না। জ্ঞানহীন হইয়া পড়িয়াছি বলিয়াই আজ
আমাদের এই দুর্দ্দশা। সুতরাং এস ভাই! আজ সমস্ত ভারত মিলিয়া
এই শুভ দিনে ভগবতী সরস্বতী দেবীর আরাধনা করি। তিনি যেন
ভারতের প্রতি আবার কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। যেন আবার ভারতকে
জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বলিত করেন। যখন এ পূজায় আমাদের অধিকার
ছিল, তখন সারস্বত উৎসবে সমস্ত ভারত মাতিয়া উঠিত। কিন্তু
অজ্ঞানে সারস্বত উৎসবের মহিমা বুঝিবে কিরূপে? তাই অজ্ঞান আমরা
এত দিন সারস্বত উৎসবে বিরত ছিলাম। এখন জ্ঞানের পুনরুন্মেষের
সহিত আমরা সারস্বত মহিমা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি—তাই আজ
আবার এই সারস্বত উৎসবের অবতারণা। ময়মনসিংহ পুণ্যভূমি—
যেহেতু সারস্বত উৎসবের পুনরারম্ভ ময়মনসিংহে। আশা করি অচিরাৎ
সমস্ত ভারত সারস্বত উৎসবে ময়মনসিংহের অনুবর্ত্তন করিবেন।
তখন এক স্থানের অভিযান অন্য স্থানের অভিযানের সহিত মিলিত হইয়া
ভারতে অপূর্ব্ব সৌভাগ্য রবি সমুদিত করিবে। বৎসরের দুই চারি
দিন অন্ততঃ আমরা জাতিধর্ম্ম—ধর্ম্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া যদি

ভগবতী সরস্বতীর মন্দিরে আসিয়া পরস্পর শোকদুর্ভর ভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে শিখি, যদি দুই চারি জন নিজ স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থে বলি দিয়া আত্মবিস্মৃত হইতে পারি, তাহা হইলেও কালে আমরা একটী সমগ্র জাতিতে পরিণত হইতে পারি। হিন্দু, মুসলমান, য়িহুদী, খ্রীষ্টান্‌, শিখ ও ব্রাহ্ম—সকলেই এই অভিযানে ও এই সারস্বত উৎসবে যোগ দিতে পারেন। কাহারও ইহাতে কোন আপত্তি নাই—আপত্তি থাকিবার কারণও নাই। ইহা অপেক্ষা সুখের দিন শতধাবিভিন্ন ভারতের ভাগ্যে আর কি হইতে পারে?

সন্তানগণ! সন্তান শব্দের সহিত জননী শব্দের যে নিত্য সম্বন্ধ। একটী শব্দ উচ্চারণ করিলেই যে আর একটী শব্দ স্বতঃই মুখ হইতে নিঃসৃত হয়। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি—আমাদের জননী কোথায়? ঐ যে কঙ্কালময়ী বিবশা নিরাভরণা রুক্ষালকা আলুলায়িত-কেশী রমণী-মূর্ত্তি দেখিতেছি, উনিই আমাদের মা—ভারত জননী। ঐ দেখ! উনি মৃতপ্রায়া ধরাশায়িনী পড়িয়া আছেন। ঐ যে চতুর্দ্দিকে করালমূর্ত্তি করধৃতদণ্ড পুরুষগণ দাঁড়াইয়া আছে, উহারা কে? সত্যবান্‌কে যমালয়ে লইয়া যাইবার জন্য যে সকল যমদূতেরা আসিয়াছিল, বোধ হয়, আমাদের জননীকে গতাসু মনে করিয়া তাহারাই উহাঁকে যমালয়ে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে। আজ আমরা সাবিত্রীর অনুবর্ত্তন করিব। সাবিত্রী যেমন শমনসদন হইতে সত্যবান্‌কে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, আমরাও—সন্তানগণ—সেইরূপ জননীকে কালের করাল পুরী হইতেই ফিরাইয়া আনিব। আনিয়া জননীর মৃতপ্রায় দেহে সঞ্জীবনৌষধ প্রয়োগ করিব। যতদিন না মা আবার বলশালিনী হন, তত দিন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় নিমগ্ন থাকিব। তত দিন আমোদ আহ্লাদ সুখবিলাসে জলাঞ্জলি দিয়া ব্রতধারী রহিব। মা মরণোন্মুখী থাকিতে সন্তানের আমোদে অধিকার কি?

সন্তানগণ! তোমরা আজ একটী নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে। তোমাদের রক্ত বসন তোমাদের ওই নব ধর্ম্মে দীক্ষার পরিচায়ক। কোন উৎসব বা আমোদের জন্য তোমরা আজ এই রঞ্জিত বসনে আবৃত হও

নাই। তোমরা একটী গভীর ব্রত উদ্যাপনার জন্য আপন ইচ্ছায় এই বসনকে অঙ্গের আভরণ করিয়াছ। আশা করি, যত দিন ব্রতের উদ্যাপনা না হইবে, তত দিন এই বসন পরিত্যাগ করিবে না। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থ চতুর্দ্দশ বৎসর সন্ন্যাসীর বেশে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শাক্যসিংহ সাম্য ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য রাজ সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া আজীবন সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন আরও অনেক সন্ন্যাসীর জীবনে ভারতক্ষেত্র সমুজ্জলিত হইয়াছিল। তখন প্রতি গৃহী অর্দ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন। সন্ন্যাস ধর্ম্মের মহিমায় ভারত তৎকালে হিমালয় সমান উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল। আবার ভারতে সন্ন্যাস ধর্ম্মের প্রয়োজন হইয়াছে। পতিত জাতিকে তুলিবার এরূপ মহামন্ত্র আর নাই। গৃহে থাকিলে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না, এরূপ সংস্কার অমূলক। সন্ন্যাসধর্ম্ম অন্তরে অবস্থিত। যে অন্তরে সন্ন্যাসী তাহার গৃহও অরণ্য সমান। গৃহে থাকিয়া সন্ন্যাসী হইলে বরং সন্ন্যাস ধর্ম্মের অধিকতর স্ফূর্ত্তি হয়—কার্য্যের প্রসর অধিকতর বিস্তৃত হয়। সুতরাং সন্তানগণ! তোমরা গৃহে থাকিয়াই সন্ন্যাস ধর্ম্মের অনুশীলন করিবে, গৃহে থাকিয়াই জননীর চরণে আত্ম বলি দিতে অভ্যাস করিবে, পরিবারের মধ্যে থাকিয়াই পারিবারিক জীবনকে জাতীয় জীবনে আহুতি দিতে শিক্ষা করিবে।

আজ হইতেই আত্ম ভুলিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির চরণে আত্ম-আহুতি দিতে আরম্ভ করিবে। এ বড় কঠোর সাধনা। আমি অনেক দিন হইতে এ সাধনায় নিমগ্ন আছি—কিন্তু আজও সিদ্ধকাম হইতে পারিলাম না। চতুর্দ্দিকের ঘটনাবলী আসিয়া মধ্যে মধ্যে ব্রতভঙ্গ করিয়া দেয়। পারিবারিক জীবন সময়ে সময়ে জাতীয় জীবনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। সেই স্রোতে পড়িয়া সময়ে সময়ে—স্বদেশ ও স্বজাতি—হৃদয়ের আরাধ্য দেবতাদ্বয়কে—ভুলিয়া যাই। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্রতস্মৃতি প্রবল বেগে হৃদয়ে সমুদ্ভূত হয়। তখন আবার লজ্জায় অভিভূত হই,—ক্ষণিক আত্মস্মৃতির জন্য গতানুশোচনায় দগ্ধ হইতে থাকি, এইরূপে এই দগ্ধ জীবন চলিতেছে। অন্তর্দাহে হৃদয় দগ্ধীভূত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে

ব্রতস্খলন হইলেও—মধ্যে মধ্যে আত্মস্মৃতির অধীন হইলেও—গৃহীত ব্রত কখন পরিত্যাগ করি নাই। ব্রত পরিত্যাগ করি নাই বলিয়াই আজ তোমাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহস করিয়াছি। কিন্তু আশা হইতে আশা অল্প। এই দেখ আমার শ্মশ্রুকেশ পলিত বেশ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কত দিন আর বাঁচিব? আমি জননীর কিছুই করিতে পারিলাম না। এই দুঃখে দিন দিন আরও অকালবৃদ্ধ হইতেছি। জীবন দিন দিন দুর্ভর বোধ হইতেছে। কিন্তু তোমাদের মুখের দিকে যখন তাকাই, তখন আবার মনে সাহস হয়, আশা-ঊষা নবীন রশ্মিতে আবির্ভূত হয়। সন্তানগণ! তোমরা এখন ভারতের একমাত্র আশা! আমাদের জীবনের শিক্ষা তোমাদের মূল ধন। এই মূলধন লইয়া এই জাতীয় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে শীঘ্রই তোমরা কৃতকার্য্য হইবে। আমরা যখন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, তখন কোন মূলধন পাই নাই। তবে আর্য্যগৌরবের স্মৃতি মাত্র উপলক্ষ করিয়া এতদূর হইয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা এই মূলধনকে পাথেয় করিয়া দিন দিন অধিকতর অগ্রসর হও, এবং অনতিকালে গন্তব্য স্থানে উপনীত হও।

সন্তানগণ! অভিযানের আর একটী গূঢ় উদ্দেশ্য তোমাদিগকে না বলিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারিতেছি না। আমাদের দেশের পতনের প্রধান কারণ স্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্য উন্নতির চরম অবস্থা —ও অপব্যবহারে পতনের প্রধান সোপান। স্বানুবন্ধন না করিলে মানুষ কখন উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইতে পারে না। প্রতিপদে সমাজ যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে ব্যক্তিগত উন্নতি পদে পদে প্রতিহত হইবে। পরস্পর-সংঘর্ষে জাতীয় শক্তি বিনষ্ট হইবে! সমাজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতিকূলে দাঁড়াইলে যেমন সমাজের পতন অনিবার্য্য, সেইরূপ ব্যক্তি সমষ্টিরূপ সমাজের প্রত্যেক উপাদান, যদি সামাজিক শাসনের প্রতিকূলে দাঁড়ায়, তাহা হইলে সমাজ ধ্বংস বা সমাজ-বিপ্লব উপস্থিত হয়। সুতরাং উভয়েরই উভয়কে রক্ষা করিয়া চলা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন—এতদুভয়েরই পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। সমাজ যদি ব্যক্তিগত অস্তিত্বের

প্রতিকূলে দাঁড়ান, তাহা হইলে তিনি আত্মধ্বংসকারী হইবেন।' সেই-রূপ ব্যক্তিগণ যদি স্বাতন্ত্রী হইয়া সামাজিক অস্তিত্বের প্রতিকূলে দাঁড়ান—তাহা হইলে বন্যজন্তুর অবস্থায় পরিণত হইবেন। আমরা সমাজের ধ্বংসকামী নহি, সুতরাং সমাজদ্রোহী হইব না। সমাজকে বজায় রাখিয়া ব্যক্তিগত উন্নতি সাধন করিব। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাফলে আমরা সকলেই স্বাতন্ত্রী হইতেছি। ইহা জাতীয় জীবন-গঠনের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। সকলেই স্বাতন্ত্রী হইলে আমরা কোন সাধনাতেই কাহারও দ্বারা অভিনীত হইব না। সকলেই নেতা; নীত হইবার কেহ থাকিবে না। ভারতে এখন আদেশ কর্ত্তার সংখ্যা এত বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, কে আদেশ প্রতিপালন করিবে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সকলেই স্ব স্ব প্রধান। কেহই কাহারও কথা শুনে না—কেহই কাহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করে না, নেতা বলিয়া কাহাকে নির্ব্বাচন করিয়া লইতেও চাহে না। এরূপ অবস্থায় আমাদের কোন সমবেত কার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। এ অবস্থায় থাকিলে আমাদের জাতীয় দুর্গতির দিনের অবসান হইবে না। আমাদের সম্মুখে ইংরাজ জাতির যে দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে—তাহা হইতে আমরা কি শিক্ষা পাইতে পারি? ইংরাজ জাতির প্রধান গুণ এই অধিনীতি ধর্ম্ম। তাঁহারা যেরূপ অধি-নীত হইতে জানেন, বোধ হয় আর কোন জাতি এরূপ অধিনীত হইতে জানেন না। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের অধিবাসিগণকেও আমরা এই শ্রেণীভুক্ত করিলাম। ব্রিটন্ ও ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের উন্নতির মূল এই অধিনীতি। যাঁহাকে নেতা বলিয়া নির্ব্বাচন বা স্বীকার করিয়া লইলাম, তিনি যাহা বলিবেন অবিতর্কে তাহা সম্পাদন করাই অধিনীতি ধর্ম্মের প্রধান প্রতিপাদ্য। গুরু বা নেতা যাহা বলিবেন বিনা বিচারণায় তাহার অনুবর্ত্তন না করিলে কোন মহৎ কার্য্য সাধন হইতে পারে না। কারণ ক্ষিপ্রকার্য্য করণ সময়ে অধিনীত ব্যক্তি মাত্রকেই কার্য্যের দোষ গুণ বিচারণা দ্বারা বুঝাইয়া একমতে আনা অসম্ভব। সুতরাং তাহা করিতে সকল কর্ম্ম পণ্ড হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। ঐ যে রণে অজেয় শিখজাতি আজ মিসর, ব্রহ্ম, আফগান, সুদন জয় করিয়া বেড়াইতেছে,

উহা এই অধিনীতি ধর্ম্মের জলন্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ। শিখগুরু মহামতি গুরু-গোবিন্দ সিংহ উহাদিগকে এই অধিনীতি মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই তাহারা আজ রণে অজেয়—বীরত্বে অতুলনায়। ইতালীর উদ্ধারকর্ত্তা ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডীও তাঁহাদিগের মন্ত্রশিষ্যগণকে এই অধিনীতি মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন বলিয়াই এত অল্প দিনে তাঁহারা সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের মন্ত্রশিষ্যগণকে যথায় যাইতে বলিতেন, যমালয় হইলেও তাঁহারা বিনা বিচারণায় তথায় যাইতেন। তাঁহারা যাহা করিতে বলিতেন, মনুষ্যের অসাধ্য হইলেও তাহা তাঁহারা করিতে চেষ্টা করিতেন। এরূপ অধিনীতের সংখ্যা ভারতে যতই বাড়িবে—ততই ভারতের মঙ্গল। সন্তানগণ! তোমরা আজ সেই অধিনীতি ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে। আজ হইতে তোমরা মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর য়ে, তোমাদের নিজ-নির্ব্বাচিত বা মহাজন-নির্ব্বাচিত গুরুর বচন তোমরা কখন উল্লঙ্ঘন করিবে না। প্রতিজ্ঞা কর যে, গুরু তোমাদিগকে যমালয়ে লইয়া যাইতে চাহিলেও—তোমরা তথায় যাইতে পশ্চাদ্‌পাদ হইবে না। প্রতিজ্ঞা কর যে তোমাদের গুরু তোমাদিগকে যাহা করিতে বলিবেন—প্রাণোৎসর্গেও তাহা তোমরা সাধন করিবে। এ প্রাণ যদি স্বদেশের ও স্বজাতির কার্য্যে ব্যয়িত না হইল, তাহা হইলে এ প্রাণে প্রয়োজন কি? এ জীবনের সার্থকতা কি? তোমাদিগের কঙ্কালময়ী জননী মূর্ত্তি তোমাদিগকে সতত এই ব্রত স্মরণ করাইয়া দিবে। জননীর কঙ্কালময়ী প্রতিমূর্ত্তি তোমাদিগের নয়ন-সমক্ষে রহিয়াছে। যে অন্ধ, সেই কেবল তাহা দেখিতে পায় না। যত দিন জননীর এই মূর্ত্তি থাকিবে তত দিন তোমাদিগকে এ ব্রত পালন করিতে হইবে। কিন্তু একটী কথা যেন তোমাদের মনে সর্ব্বদা থাকে। তোমাদের ব্রত শুদ্ধ সত্বগুণ মূলক। রজঃ ও তমোগুণের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই। ঔদ্ধত্য ও অবিনয় রজঃ ও তমোগুণের ধর্ম্ম। সুতরাং ঔদ্ধত্য ও অবিনয়কে তোমারা সর্ব্বথা পরিহার করিবে। গুরুর বচন হৃদয়ে ধারণ করিয়া—জননী ও ঈশ্বরকে—মস্তকে রাখিয়া তোমরা—সন্তানদল —অকুতোভয়ে সংসারপথে অগ্রসর হও—এই আমাদের এই দীন হীন

সন্তানের একমাত্র বাসনা। যাহা আমি করিতে পারি নাই—তোমরা তাহা সাধন কর—এইমাত্র কামনা। স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!

জাতীয় সংস্থান।

সুরেন্দ্র বাবুর কারাবাসের অমৃতময় ফল "জাতীয় সংস্থান"। যদি কোন কারণে সুরেন্দ্র বাবুর নাম ভারত-বক্ষে চিরঅঙ্কিত থাকে, ত এই "জাতীয় সংস্থানেই" থাকিবে। জাতীয় সংস্থান নূতন কথা নহে বটে, কিন্তু, এ বিস্তৃত ও নূতন আকারে আর কেহ কখন ইহার অবতারণা করেন নাই। ইহাকে এরূপ নিত্য আকার দিতে আর কেহ কখন চেষ্টা করেন নাই। পূর্ব্বে চেষ্টা করিলে কেহ কৃতকার্য্য হইতেন কি না জানি না। পূর্ব্বে বোধ হয় সময় হয় নাই। কারণ সময় হইলে বোধ হয় চেষ্টাও হইত। সময় উপযুক্ত প্রস্তাবক প্রস্তুত করিয়া লইত। সময় আসিলে লোকের অপ্রতুল হয় না। সকল লোকের মনে যখন একইরূপ ভাবের উদয় হয়, তখনই সময় আসিয়াছে মনে করিতে হইবে। যে সেই ভাব প্রথমে ফুটিয়া বলে, লোকে তাহাকেই নেতা করিয়া লয়। সেই সৎসাহসের উৎসাহ দিবার জন্যই বোধ হয় লোকে এইরূপ করিয়া থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবাবিবাহের প্রস্তাব করেন, তখন কৃতবিদ্য বঙ্গবাসিমাত্রেরই অন্তরে বিধবাবিবাহের আবশ্যকতা ও যৌক্তিকতার ভাব অঙ্কিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহস করিয়া সর্ব্ব-প্রথমে সর্ব্বসমক্ষে সেই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছিলেন বলিয়াই সুশিক্ষিত সমাজ আজও তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। তিনি বিধবা-বিবাহ বিষয়ে এখন বড় হস্তক্ষেপ করেন না, তথাপি লোকে প্রতি বিধবা-বিবাহের সময়েই তাঁহার নাম সঙ্কীর্ত্তিত করিয়া থাকে। বিদ্যাসাগর ও বিধবা-বিবাহ যেন চির-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ।

সেইরূপ জাতীয় সংস্থানের সহিত সুরেন্দ্র বাবুর নাম দুশ্ছেদ্য সূত্রে চিরসম্বদ্ধ থাকিবে। বড় বড় বিপদে বড় বড় ভাব মনে উদিত হয়।

সুরেন্দ্র বাবু কারাগৃহের লৌহপিঞ্জরে বসিয়া ভারতের ভাবী মঙ্গলের পথ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। সমস্ত ভারত একতা-সূত্রে আবদ্ধ না হইলে আর কোন আশা নাই। সে একতার ভাব একদিনে জন্মে না। আমরা সবে ভাই ভাই—কেবল মুখে এই কথা বলিয়া বেড়াইলেও একতা শিক্ষা হয় না। যতদিন আমরা সেই ভাই ভাই ভাব কার্য্যে পরিণত না করি, ততদিন তাহাতে আমাদের বিশেষ উপকার নাই। সেই ভাই ভাই ভাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে তাহাকে নিজ নিজ রুধিরে পরিপুষ্ট করিতে হইবে। ভারতবাসী ভ্রাতৃবৃন্দের উপকারার্থ প্রতিদিন প্রত্যেক ভারতবাসীকে কিয়ৎ পরিমাণে আত্মত্যাগ করিতে হইবে। সমাধি ও অনুষ্ঠান—ভাবের পুষ্টিসাধনে দুইই অপরিহার্য্য উপাদান। 'আমরা সবে ভাই ভাই'—প্রতিদিন এই মন্ত্র জপ করিলেও ফল আছে সত্য, কিন্তু নিত্য অনুষ্ঠান দ্বারা সেই জপের জীবন্ত ভাব দেখাইতে পারিলে তদপেক্ষাও অধিকতর ফল। যিনি উপদেষ্টা তিনিও পূজনীয় সত্য, কিন্তু যিনি দৃষ্টান্ত-দর্শয়িতা তিনি অধিকতর পূজনীয়। যে উপদেষ্টা স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম প্রচার করিয়া বেড়ান, তিনিও পূজার্হ সন্দেহ নাই, কিন্তু যিনি স্বজীবনে স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন, সেই দেবতা অধিকতর পূজার্হ।

এতদিন আমরা স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগের প্রচার করিয়া আসিয়াছি মাত্র। এখনও আমরা নিজ নিজ জীবনে তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি নাই। অল্পদিনে সে শিক্ষা হয় না। যে জাতি এত কাল পতিত রহিয়াছে, সে জাতিতে আত্মত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সহসা আবির্ভূত হইতে পারে না। এতদিনে আমাদের দেশে ভাব-বিপ্লব সমাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং এখন সেই সকল ভাব কার্য্যে পরিণত করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সুরেন্দ্র বাবুর কারাবাসে বিশ্বজনীন সহানুভূতি দ্বারা জানা গিয়াছে, ভাব-বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে, এবং কার্য্যকাল উপস্থিত হইয়াছে।

কার্য্য করিতে যাইলেই অর্থের আবশ্যকতা। বিপুল অর্থ ব্যতীত বড় বড় কার্য্য সংসাধিত হইতে পারে না। সেই বিপুল অর্থ এক-

দিনেও সংগৃহীত হইতে পারে না। এক জনেও তাহা দিতে পারে না। অসংখ্য লোকে কিছু কিছু করিয়া দিলে অল্পকালমধ্যে বিপুল অর্থ সংগৃহীত হইবে অথচ কাহারও গাত্রে আঁচ লাগিবে না। যে ভারত পঞ্চবিংশ কোটী মানবের আবাস-ভূমি, তাহার কিসের অভাব? পঞ্চবিংশ কোটী অধিবাসী বৎসরে এক পয়সা করিয়া দিলেও অল্পকাল মধ্যে জাতীয় ধনাগার ধনে পূর্ণ হইবে। আর দীন হীন কাঙ্গালও বৎসরে এক পয়সা দিতে কাতর হইবে না। জাতীয় সংস্থানের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিতে পারিলেই অর্থ চতুর্দ্দিক্ হইতে আপনিই আসিবে। সমস্ত ভারতবাসীর অন্তরে এই আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিবার জন্যই কতিপয় রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর এবং এক খানি সুলভ দৈনিক পত্রিকার একান্ত প্রয়োজন। ভারতসভা অন্যান্য আগড়ম বাগড়ম ছাড়িয়া দিয়া কতিপয় রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর ব্যয়ভার গ্রহণ ও একখানি সুলভ দৈনিক পত্রিকা প্রচার করুন। এই দুই কর-যন্ত্র দ্বারা ভারতসভার মহৎ উদ্দেশ্য অচিরকালমধ্যে সংসাধিত হইবে। দানশীলতা ভারতবাসীর চির লালিত ধর্ম্ম। এমন গৃহ নাই যেখানে প্রতিদিন এক মুষ্টি ভিক্ষা দেওয়া হয় না। প্রতিদিন প্রতিগৃহ এক মুষ্টি করিয়া চাউল দিলে, জাতীয় সংস্থান হইতে কয় দিন লাগে? ভারতবাসী ব্যক্তিগত দানশীলতায় চিরাভ্যস্ত। আমাদিগকে কেবল ব্যক্তিগত দানশীলতার কিয়দংশ জাতীয় দানশীলতায় পরিণত করিতে হইবে। সেই প্রকাণ্ড স্রোতস্বিনী হইতে খাল কাটিয়া আমাদিগকে ভারতের নানাস্থানে লইয়া যাইতে হইবে এবং সেই কৃত্রিম সরিতের জলে ভারতের জাতীয় জীবন অভিসিঞ্চিত করিতে হইবে। ইহা অতিমানুষ কার্য্য নহে—তবে বিনা লোকবলে সিদ্ধ হইবার নহে। সেই জন্যই বলিতেছিলাম—ভারতসভা সব ছাড়িয়া কতকগুলি রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর ব্যয়ভার গ্রহণ করুন। ইঁহাদিগের দ্বারা শুদ্ধ জাতীয় সংস্থান কেন আরও অনেক মহৎ কার্য্য সংসাধিত হইবে। ইঁহারা ভারতবাসী জনসাধারণের রাজনৈতিক ধর্ম্মের দীক্ষাগুরু হইতে পারিবেন। আপাততঃ প্রতি জেলায় এক জন করিয়া রাজনৈতিক সন্ন্যাসী থাকিলে চলিতে পারিবে। কার্য্যের প্রসর

বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাবাহুল্যের প্রয়োজন হইবে। ইহাঁরা প্রতি গ্রামে গিয়া রাজনৈতিক ধর্ম্ম প্রচার করিবেন, এবং জাতীয় সংস্থানের চাঁদা সংগ্রহ করিবেন। প্রস্তাবিত সুলভ দৈনিক পত্রিকা এই নব ধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে তাঁহাদিগের বিশেষ সহায়তা করিবে। জেলায় যাহাতে শক্তি-সামঞ্জস্য থাকে, তদ্বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। শাসন কর্ত্তারা শাসিত দিগের প্রতি অবিচার বা অত্যাচার করিলে অমনি তাঁহারা জাতীয় সংবাদপত্রে প্রচার করিবেন, ইহাতে শাসনকর্ত্তাগণের সংশোধন ও জাতীয় সুখ বৃদ্ধি হইবে।

ভারতের দুর্দ্দশার মূল গৃহশত্রু ও আত্মবিচ্ছেদ। ভারতের সম্প্রদায়-বিশেষ স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া ইহারই মধ্যে জাতীয় জীবনের এই প্রথম কার্য্যের বিরুদ্ধেই খড়্গ-হস্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। পাছে ভারতসভা প্রজার দুঃখাপনোদনার্থ জাতীয় ধনভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করেন, এই ভয়ে জমিদারগণ জাতীয় সংস্থান প্রতিষ্ঠাপনের উদ্যমকে অঙ্কুরে বিদলিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তাঁহারা এই কার্য্যের উপযোগী নেতাও পাইয়াছেন। যে মহাপুরুষ জমিদারগণের জন্য জমিদারেতর সমস্ত ভারতবাসীর পূজা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তিনিই এই বিনাশ-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার লেখন-চাতুর্য্যের প্রশংসা না করে, এমন লোক নাই। এত জ্ঞান রাশি অল্প লোকেই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু সে জ্ঞানরাশি তিনি কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশেই ব্যয়িত করিয়া থাকেন। জমিদারগণ হইতে তিনি বিবিধ উপকার পাইয়াছেন ও পাইতেছেন, সুতরাং তিনি তাঁহাদিগেরই স্বার্থসিদ্ধি বা স্বার্থরক্ষার জন্য আপনার বহুকালার্জ্জিত জ্ঞানরাশি ব্যয়িত করিয়া থাকেন। তাঁহার স্বদেশানুরাগ কৃতজ্ঞতার নিকট পরাস্ত হইয়াছে। জাতীয় সংস্থান বিষয়ে সমস্ত দেশীয় সম্পাদক একদিকে, আর তিনি একদিকে। এ স্থলে তিনি যে জাতীয় নেতা তাহা আর বলিব কিরূপে? বিরোধী দলের যুক্তি আমাদের নিকট অতি অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। প্রথমতঃ তাঁহারা বলেন জাতীয় সংস্থানের কোন আবশ্যকতা নাই। যে দেশ কোন বিষয়েই সমবেত হইয়া কার্য্য করিতে জানে না, সে দেশে

সমবেত কার্য্য করণের শিক্ষা অনাবশ্যক এ কথা কেমন করিয়া বলিব? যদি সমবেত কার্য্য করণের শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন হইয়া থাকে, ত জাতীয় সংস্থানের অনুষ্ঠানও একান্ত প্রযোজনীয়। কারণ জাতীয় সংস্থান বিনা কোন সমবেত জাতীয় কার্য্য হইতে পাবে না। আর সমবেত কার্য্য ব্যতীতও জাতীয় জীবন দৃঢ় হয় না। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা বলেন যে, যখন কোন কাজ উপস্থিত হইবে তখনই টাকা তোলা যাইবে। এখন ত কোন কাজ উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং টাকা তোলার প্রযোজন কি? ইহাব উত্তরে বক্তব্য এই যে, কাজ করিলেই আছে, আর না করিলেই নাই। যে জাতির চতুর্দ্দিকে এত অভাব, সে জাতির কবিবাব কোনও কাজ নাই এ কথা স্থূলদর্শী অলস ব্যতীত আর কেহ বলিবেনা। অদূবদর্শী অলস ব্যক্তি চতুর্দ্দিকে আগুণ লাগিয়াছে দেখিবাও বলিবে—যে এখন সুখে নিদ্রা যাই, যখন আমার ঘরে আগুণ লাগিবে তখনই উঠিয়া থামাইবাব চেষ্টা করিব। এদিকে ভগবান্ বিশ্বাবসু আসিযা হয়ত নিদ্রিত মানবসহ সেই গৃহ দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। যাঁহারা অবশ্যম্ভাবী আপদের জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া না থাকেন তাঁহাদের দশা প্রায় এইরূপই হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ তাঁহারা বলেন যে, জাতীয় ভাণ্ডারে অর্থ জমিলে অনেক সময় অনিষ্টকর কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মিবে। এ যুক্তি বরং ব্যক্তিবিষযে অধিকতর প্রযুক্ত হইতে পারে। কারণ ব্যক্তিবিশেষ অনিয়ন্ত্রিতভাবে সংগৃহীত অর্থের অপব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু জাতীয ধনেব অপব্যবহার করা কাহারও পক্ষে সহজ নহে। আব একজনের হস্তেই কিছু জাতীয় ভাণ্ডার সন্ন্যস্ত হইতেছে না। যাঁহাবা ট্রষ্টি হইবেন, তাঁহারা যদি কখন জাতীয় বিশ্বাসের অপব্যবহাব করেন, তাঁহাদিগকে জাতিসাধারণ তৎক্ষণাৎ বিদূরিত করিতে পারেন। জাতিসাধারণের মত না লইয়াই বা কেন তাঁহারা কোন খরচ করিবেন। যদি বল যে জাতিসাধারণও কুপথগামী হইতে পাবে, যদি তাহাই হয় তোমার থেকাইয়া রাখিবার সাধ্য কি? আর সে স্থলে ভাল মন্দ নির্ণয় হইবেই বা কিরূপে? তুমি যাহাকে কুপথ বলিতেছ, তাহা যে বাস্তবিকই কুপথ—তাহা স্থির করিবে কে? সুতরাং

যখন আমরা সম্পত্তি ব্যক্তি-বিশেষের হস্তে দিতে ভীত হই না, তখন জাতীয় নেতৃবৃন্দের হস্তে দিতে ভীত হইব কেন? জাতীয় নেতৃদলে বিশ্বাস না থাকিলে, কখন আমরা একটী জাতিরূপে পরিণত হইতে পারিব না। সকলেই স্ব স্ব প্রধান হওয়াতেই আমাদের আজ এই দুর্দ্দশা।

চতুর্থতঃ তাঁহারা বলেন যে, জাতীয় ভাণ্ডারে অর্থ থাকিলে জিত ও বিজেত্রী জাতির মধ্যে শান্তি থাকিবে না। বিজেত্রী জাতি সর্ব্বদা সন্দিগ্ধচিত্তে আমাদিগকে দেখিবেন। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, যাঁহারা শাণিত খড়্গাগ্রে ভারত শাসন করিতে চাহেন, তাঁহারা সন্দিহান হইতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা অকৃত্রিম রাজভক্তিকেই শাসন-সৌধের ভিত্তি করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের মনে কখন কোন সন্দেহ উপস্থিত হইবে না। মহামতি লর্ড রীপণের ন্যায় শাসন-কর্ত্তাগণের মনে কখন কোন আশঙ্কার উদয় হইবে না। ভারতবাসী চিরদিন রাজভক্ত, অকৃত্রিম স্নেহ ও অবিচলিত বিশ্বাসের পূর্ণ প্রতিদান দিতে কখনই পরাঙ্মুখ নহে। বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতম অপরাধ বলিয়া মনে করেন। লর্ড রীপণের ন্যায় শাসনকর্ত্তা চিরদিন পাইলে জিত-বিজেতৃ-বিদ্বেষ তাঁহাদিগের মন হইতে একবারে তিরোহিত হইবে। ভারতপ্রবাসী ইংরাজবর্গের নিকট তাঁহারা এত যে গালি খাইতেছেন, তথাপি এক লর্ড রীপণের গুণে তাঁহারা অম্লান বদনে সমস্ত সহিতেছেন। এখন ত ভারতবাসীই প্রকৃত রাজভক্ত—লর্ড রীপণের গবর্ণমেণ্টের প্রধান সমর্থক।

যে রাজা প্রজার বিরোধী, তাঁহার সহিতই প্রজার সংঘর্ষ হইতে পারে। যিনি বলেন যে, হাতে টাকা থাকিলেই প্রজারা রাজার সহিত অকারণ বিবাদ করিবে, তাঁহাদের মানবপ্রকৃতির উপর বিশ্বাস নাই। অকারণ বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া মানবপ্রকৃতির স্বধর্ম্ম নহে। রাজা প্রজার মঙ্গল কামনায় সতত নিমগ্ন আর প্রজা রাজার সর্ব্বনাশে সতত নিরত—এরূপ ঘটনা ঘটে নাই এবং ঘটিতে পারে বলিয়াও আমাদের বিশ্বাস নাই। তবে রাজার স্বার্থের সহিত যদি প্রজার স্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত

হয়, তখনই উভয়ে বিবাদ বাদে। রামচন্দ্রের ন্যায় রাজা সে স্থলে আত্মস্বার্থ প্রজাস্বার্থে বলি দিয়া থাকেন। যে রাজা তাহা করিতে পারেন, প্রজাগণ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিয়া থাকেন। প্রথম চালর্সের ন্যায় রাজা সে স্থলে আত্মস্বার্থে প্রজাস্বার্থ বলি দিতে চেষ্টা করেন। যদি তিনি কৃতকার্য্য হইলেন, তাহা হইলে প্রজার দুঃখের আর সীমা রহিল না। প্রজা যখন দুর্ব্বল থাকে, তখন রাজাই প্রজাকে প্রদমিত করিয়া রাখেন। যেখানে হ্যাম্‌ডেনের ন্যায় প্রজা থাকে, সেখানে প্রজায় রাজাকে দমিত করিয়া রাখে। রাজায় প্রজায় ক্রমিক এইরূপ সংঘর্ষ হওয়াতেই ইংলণ্ডের আজ এত সৌভাগ্য। যদি ইংলণ্ডীয় রাজবৃন্দ প্রজাবৃন্দকে চিরকাল দমিত করিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে আজ ইংরেজের এত প্রাদুর্ভাব হইত না। যখন প্রজাসাধারণের রাজ্যের শাসনকার্য্যে মমত্ব থাকে, তখনই রাজ্যের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হয়। যখন শাসিতে ও শাসনকর্ত্তায় সহানুভূতির অভাব হয়, তখনই রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। কারণ প্রজাসাধারণ রাজ্যরক্ষা না করিলে তাহা অচিরকালমধ্যে শত্রুকবলে পতিত হয়। হিন্দু রাজত্বের পতনের মূল প্রজাসাধারণের শাসনকর্ত্তাগণের সহিত সহানুভূতির অভাব। মুসলমান রাজত্বের পতনের মূল প্রজাসাধারণের সহিত শাসনকর্ত্তাগণের বৈরভাব। ইংরাজ শাসনকর্ত্তাগণের প্রতি এখনও প্রজাসাধারণের বিশ্বাস আছে বলিয়াই এখনও ইংরাজ-রাজত্ব অটুট রহিয়াছে। যদি কখন জাতিসাধারণের মন হইতে সে বিশ্বাস চলিয়া যায়, তখন কোটী কোটী বেয়নেটেও সে রাজত্ব রক্ষা করিতে পারিবে না। আর যতদিন সে বিশ্বাস থাকিবে, ততদিন ভারতশাসনের জন্য বেয়নেটেরও প্রয়োজন নাই। গভীর রাজনীতিজ্ঞ লর্ড রিপণ এই গূঢ় তত্ত্ব বুঝিয়াছেন বলিয়াই তিনি প্রতি ভারতবাসীর হৃদয়-রাজ্যে এতদূর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছেন। তাই বলিতেছি, যতদিন রাজা প্রজার হিতাকাঙ্ক্ষী থাকিবেন, ততদিন প্রজা তাহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকিবে। যদি রাজা কখন সেই রাজধর্ম্মের প্রতিকূলাচরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিরস্ত করিবার জন্য বৈধ আন্দোলনের প্রয়োজন। আমা-

দিগকে স্বে আন্দোলন এখানে ও বিলাতে উভয় স্থানেই করিতে হইবে। ইহা বহু ব্যয়-সাধ্য। সুতরাং এরূপ ভবিষ্য বিপদের জন্য আমাদের জাতীয় সংস্থান একান্ত প্রয়োজনীয়। তদ্ভিন্ন এমন অনেক সৎকার্য্য আছে, যাহাতে গবর্ণমেণ্ট প্রজার সাহায্য-সাপেক্ষ হইতে পারেন। সে সকল স্থলেও গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থ জাতীয় ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইবে। জাতীয় শিক্ষাবিধান, জাতীয় স্বাস্থ্যবর্দ্ধন, জাতীয় শিল্প বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধন, জাতীয় কৃষিবিদ্যার উন্নতি বিধান, শত্রুর আক্রমণ নিবারণ প্রভৃতি অসংখ্য হিতকর কার্য্যে জাতীয় ভাণ্ডার গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিতে পারে। প্রজাসাধারণের সহানুভূতি পাইলে গবর্ণমেণ্ট দ্বিগুণিত উৎসাহের সহিত কত মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

আর এক আপত্তি এই যে, প্রাদেশিক কার্য্যের জন্য জাতিসাধারণের নিকট চাঁদা সংগ্রহ করা অনুচিত। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ভারতসভা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই জাতীয় অর্থ কখন প্রাদেশিক কার্য্যে ব্যয়িত হইবে না। যে সকল কার্য্যে, জাতিসাধারণের স্বার্থ, জাতীয় অর্থ কেবল তাহাতেই ব্যয়িত হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, প্রাদেশিক সংস্থান দ্বারা প্রাদেশিক অভাব মোচন হইলেই, প্রকারান্তরে জাতীয় অভাব মোচন হইবে। এরূপ আপত্তি নিতান্ত অসার, কারণ সমস্ত ভারতবাসীকে একতাসূত্রে সম্বদ্ধ করিতে হইলে, সমবেত কার্য্যের প্রয়োজন। মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে না শিখিলেও, পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃস্নেহ জন্মিবে না। সমস্ত ভারতবাসীর যে এক স্বার্থ—কার্য্য দ্বারা তাহা না দেখাইলে একতাবন্ধন দৃঢ়ীভূত হইবে না। আর এমন অনেক কাজ আছে; যাহাতে জাতীয় সমবেত উদ্যম প্রয়োজনীয়। প্রাদেশিক সভা ও প্রাদেশিক সংস্থান দ্বারা তাহা সংসাধিত হইতে পারে না। জাতীয় সভা ও জাতীয় সংস্থানের প্রাদেশিক শাখা সংস্থাপিত হইতে পারে, কিন্তু জাতীয় তরু অগ্রে রোপিত করা চাই। তাহাকে অভিষিঞ্চিত করিলে—তাহার পুষ্টিসাধন করিলে—সেই তরু হইতেই শাখা প্রশাখা আপনিই বাহির হইবে। যাঁহারা সেই মূল তরুকে অঙ্কুরে বিদলিত করিতে চান, তাঁহাদিগকে আমরা আত্মঘাতী বলিব।

ভ্রাতৃগণ! এখন বিবাদের সময় নয়। আমাদিগকে শ্রেণীগত বিদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই প্রকাণ্ড জাতীয় ভাবে আত্ম-আহুতি প্রদান করিতে হইবে। নিজ স্বার্থ জাতীয় স্বার্থে বলি দিতে হইবে, নিজ সুখ জাতিসাধারণের সুখে উৎসর্গ করিতে হইবে। প্রজাস্বার্থে রাজস্বার্থ বলিদান দেওয়াই প্রকৃত রাজধর্ম্ম শাস্ত্রকারেরা বলিয়া গিয়াছেন। রামচন্দ্র প্রমুখ রাজবৃন্দ সেই প্রকাণ্ড নীতির অনুবর্ত্তন করিয়া জগতে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের উত্তরাধিকারী হইয়া আজ তোমরা সে রাজধর্ম্ম ভুলিয়া যাইতেছ কেন? আর্য্যসন্তান হইয়া আর্য্যধর্ম্ম ত্যাগ করিতেছ কেন? সন্তানের ন্যায় প্রজাগণকে স্নেহ কর, প্রজাগণও তোমাদিগকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিবে। স্নেহ নিম্নগামী। অগ্রে তোমাকে স্নেহ দেখাইতে হইবে, তবে ভক্তি পাইবে। যদি বড় হইতে যাও তোমাকে অগ্রে নামিতে হইবে। যে আপনা হইতে উচ্চ আসনে গিয়া বসে সে বড় লোক নহে, কিন্তু যাঁহাকে জাতি-সাধারণ উচ্চ আসন দেয়, তিনিই প্রকৃত বড় লোক। জাতিসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উচ্চ আসন গ্রহণ করিলে জাতিসাধারণ তোমাদিগকে নামাইবে। সে সংঘর্ষে জাতিসাধারণের জয় হইবে। সে প্রচণ্ড পবনের সম্মুখে দুই চারি শত জমিদার তৃষের ন্যায় উড়িয়া যাইবে। ফরাশিবিপ্লবের সময় ফরাশি জমিদারগণ এই ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হওয়ায়, তাঁহারা জাতীয় দেবতার নিকট বলি পড়িয়াছিলেন। তাই বলিতেছি, ভ্রাতৃগণ! জাতিসাধারণের ইচ্ছার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া আত্মধ্বংসের পথ পরিষ্কৃত করিও না; এবং জাতীয় সঞ্জীবনের দিন দূর-বিপ্রকৃষ্ট করিও না। জানিও, এ সংঘর্ষে তোমরাই মরিবে—জাতিসাধারণ মরিবে না। তবে জাতীয় সঞ্জীবনের দিন বিলম্বিত হইবে মাত্র। এ আত্ম-ধ্বংসে—এ জাতীয় অনিষ্ট-সাধনে—তোমাদের কি লাভ—কি সুখ?

তাই বলিতেছি, ভ্রাতৃগণ! শ্রেণীগত বিদ্বেষ ভুলিয়া এই মহৎ জাতীয় কার্য্যে যোগ দান কর। জানিও, জাতিসাধারণের সহানুভূতি থাকিলে, কেহ তোমাদিগের কেশস্পর্শ করিতে পারিবে না। তোমাদিগের মহত্ত্ব

দেখিলে প্রজাগণ আপনা হইতেই তোমাদিগের পূজা করিবে। জানিও, মহত্ত্বের পূজা জগৎ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, এবং কখন বিলুপ্তও হইতে পারে না।

—oooo—

জাতীয় বিদ্বেষ।

দেখিতে দেখিতে শ্বেতকৃষ্ণ বর্ণভেদ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া আসিল। ইলবার্টের বিলের পরিণাম আর কিছু হউক বা না হউক ইহা নিশ্চয় যে শ্বেতকৃষ্ণে মিলন আর সম্ভব নহে। কলিকাতা হইতে আরম্ভ করিয়া তুমি যেখানে যাইবে, দেখিতে পাইবে যে, দেশীয় ও বৈদেশিকে বিদ্বেষভাব বর্ত্তমান। এক দিকে জেতা ইংরাজ নবীভূত জয়-গর্ব্বে উদ্দীপিত হইয়া শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় দেশীয়দিগকে ঘৃণার সহিত দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন; অন্য দিকে অসহায় দেশীয়গণ দলিত অভিমান-ভরে ভারতীয় ইংরাজদিগের প্রতি শাপাদি প্রয়োগ করিতেছেন। গর্ব্বিত ভারতীয় ইংরাজের ইচ্ছা চিরদিন তাঁহাদিগকে দলিত করিয়া রাখেন, অপমানিত ও অবহেলিত দেশীয়গণের ইচ্ছা শীঘ্র তাঁহাদিগের অপহৃত স্বত্ব সকল পুনরধিকৃত করেন। দেশীয়গণ যত বিদ্যা বুদ্ধি ও যোগ্যতায় উন্নত হইতেছেন, ততই ভারতীয় শ্বেতপুরুষেরা তাঁহাদিগের প্রতি দাসোচিত ব্যবহার করিতেছেন। যাহা হওয়া উচিত ঠিক তাহার বিপরীত হইতেছে। যদি নিজের মান নিজে চাও তবে পরের মান অগ্রে রক্ষা কর। দেশীয়গণকে সম্মান কর, দেখিবে তাঁহারাও তোমার পূজা করিবেন। তাঁহাদিগকে পদে পদে অপমানিত ও পদ-দলিত করিবে ত তাঁহারাও তোমায় অপমানিত ও পদদলিত করিবার জন্য সুবিধা খুঁজিয়া বেড়াইবেন। সুবিধা আজ না আসিতে পারে, কালও না আসিতে পারে, কিন্তু পরশ্ব যে আসিবে না কে বলিতে পারে? ‘চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।’—সুখদুঃখ নিরন্তর চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আজ তোমার সুখ ও আমার দুঃখ

দেখিতেছ, কিন্তু কাল হয়ত তোমার সুখের অবসানে আমাদের সুখের উদয় হইবে। নদীর এক দিক্ ভাঙ্গে, আর একদিকে চঁড়া পড়ে। যে পাড়, ভাঙ্গিতেছে, সেই পাড়ের লোকের দুঃখ দেখিয়া হাসিবার প্রয়োজন নাই। কারণ আবার ওপারও ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইবে। একদিন ভারতীয় আর্য্যেরা উন্নতিশৈলের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন—তখন ইংরাজসিংহ গর্ত্তে বাস করিতেন। কালচক্রের আবর্ত্তনে সেই আমরা নামিয়া পড়িয়া ছিলাম। কিন্তু আবার আমরা উঠিতেছি, তোমরা নামিতে আরম্ভ করিয়াছ। দিন আসিবে, যখন তোমরা নিম্নে নামিবে, আমরা উচ্চে উঠিব। যদি সে সময় হাসির জ্বালা সহিতে প্রস্তুত না থাক, ত আমাদের অবস্থা দেখিয়া হাসিও না। কারণ হাসিলে দ্বিগুণিত হাসির জ্বালা সহিতে হইবে। ঘৃণার মর্ম্মন্তুদ আঘাত সহিতে যদি প্রস্তুত না থাক, ত ঘৃণা করিও না। আধুনিক হইয়া অনেক কালের বনেদী ঘরের প্রতি পরিহাসোক্তি করিও না। জন্ম হইলেই মৃত্যু আছে, অভ্যুদয় হইলেই পতন আছে। সেইরূপ বিপরীত হইতে বিপরীত নিশ্চয় আসিবে। গ্রীস পড়িয়াছিল, আবার উঠিয়াছে। ইতালী দুই বার পড়িয়া দুই বার উঠিয়াছে। ভারত পড়িয়া আর কত দিন রবে? তুমিই বা উঠিয়া কতদিন থাকিবে? যে চক্রের উপরে তুমি রহিয়াছ, সেই চক্রের নিম্নে ভারত রহিয়াছে। সুতরাং ভারত উঠিলে তুমি নামিবে। তুমি নামিলে ভারত উঠিবে। উচ্চতমশিখরে তুমি উঠিয়াছ, নিম্নতম তলে ভারত রহিয়াছে। তোমার উন্নতির চরম হইয়াছে, ভারতের অধোগতিরও শেষ হইয়াছে। এখন দশা পরিবর্ত্তনের সময়। অবিরাম ভ্রাম্যমাণ চক্রের গতিরোধ করে কাহার সাধ্য?

পতন যে আরম্ভ হইয়াছে, ইলবার্ট বিলের আন্দোলনে তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অতি দর্পে হতা লঙ্কা, অতিমানে চ কৌরবাঃ— অতি দর্পে সোণার লঙ্কা ছারখার হইয়াছিল; অতি অভিমানে কুরু-কুলধ্বংস হইয়াছিল। আদর্শ মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত দুই প্রকাণ্ড ঘটনা দ্বারা জগৎকে এই মহানীতি শিক্ষা দিয়াছে যে, অতি

অভিমান ও অতি দর্প মৃত্যুর অপরিহার্য্য কারণ। অত্যাচারী দশানন বিজয়দর্পে অঙ্কিতমতি হইয়া জগতকে উদ্বেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। যখন পাপের ভরা পূর্ণ হইল, তখন দর্পহারী রামচন্দ্রের শাণিত শরে তাঁহার দশ মুণ্ড ধরাশায়ী হইল। মূর্ত্তিমান অভিমান কুরু-কুল-কলঙ্ক দুর্য্যোধন অভিমানে অন্ধ হইয়া ধর্ম্মের পদে পদাঘাত করিলেন, অমনি দর্পহারী নারায়ণের ষড়যন্ত্রে কুরুকুল ধ্বংস হইল। ভারতীয় শ্বেত-পুরুষগণের দর্প ও অভিমান দুইই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাই অনুমান হয় পতন অদূরবর্ত্তী।

ইলবার্ট বিলের বাধা প্রদান এই দর্প ও অভিমানের একটী বাহ্য বিস্ফুরণ মাত্র। ১৮৩৩ সালের চার্টার বিধিতে ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট ভারত-শাসননীতি পরিস্ফুটরূপে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে—ভারতবাসী যোগ্যতা অনুসারে ভারতীয় সমস্ত উচ্চ পদে অভি-ষিক্ত হইতে পারিবে। অধিক কি গবর্ণর-জেনেরেল ও প্রধান সেনা-পতির পদ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সম্মুখে উন্মুক্ত থাকিবে। ব্রিটিশ পার্লে-মেণ্টের এই উদারনীতি খ্যাপিত হইল মাত্র, কিন্তু একদিনও কার্য্যে পরিণত হইল না। কত কত বৎসর অতীত হইল তথাপি তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার কোনও চিহ্ন উপলক্ষিত হইল না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পা-নির একমাত্র লক্ষ্য অর্থ সংগ্রহ, তাঁহারা কেবল দুই হাতে সেই অর্থ সংগ্রহই করিতে লাগিলেন। ইংরাজজাতিসাধারণ তৎকালে ভারত-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। এই জন্য শ্বেতবণিকসম্প্রদায় ভারতে কি করিতেছেন না করিতেছেন তদ্বিষয়ে কোন অনুসন্ধানও করিতেন না। বহুদিন তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। ১৮৫৭-৫৮ সালের সিপাই বিদ্রোহ তাঁহাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ করিল। পদদলিত ফণীর ভীষণ গর্জ্জনে ব্রিটিশসিংহের হৃদয়ও ভয়ে বিকম্পিত হইল। ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ-শাসন-সৌধ নিমেষমধ্যে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য একেবারে বিদূরিত হইল। ইংরাজ তখন দেখিলেন প্রজার হৃদয়ে পদাঘাত করিয়া রাজত্ব করা অসম্ভব। যিনি প্রজার মনোরঞ্জন করিতে পারেন, তিনিই রাজা। "রাজা

প্রকৃতিরঞ্জনাৎ"—প্রকৃতি-রঞ্জন-গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিই রাজপদ-বাচ্য। যিনি প্রজারঞ্জনে অক্ষম, তাঁহার রাজসিংহাসনে আরোহণ বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহাকে জীবন রক্ষার জন্য সর্ব্বদা রক্ষি-পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতে হয়। আর্য্যরাজবৃন্দ প্রজার হৃদয় দ্বারা পরিরক্ষিত হইতেন। দেহরক্ষক সৈন্য (Body-guard) তাঁহাদিগের প্রয়োজন হইত না। রাজা দিলীপ যৎকালে সপত্নীক বশিষ্ঠাশ্রমে গমন করেম, তখন সারথিমাত্র সঙ্গে করিয়া গমন করিয়াছিলেন। প্রজারা পথে ক্ষীর সর নবনীত লইয়া সারি গাঁথিয়া তাঁহার রথের গমনপথের দুই ধারে দাঁড়াইয়া থাকিত। এ দৃশ্যের নিকট রুসীয় সম্রাটের গমনপথের দৃশ্য তুলনা কর। দুই দিকে ক্রমাগত সৈন্যশ্রেণী বন্দুকে গুলি পুরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার ভিতর দিয়া সম্রাট্ যাইতেছেন, তথাপি দেহরক্ষক সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া যাইতে হইতেছে। তাহাতেও নিস্তারণ্নাই। মধ্যে মধ্যে পাতাল ভেদ করিয়া আগ্নেয় অস্ত্রের উদ্গীরণ হইতেছে। আহার নাই, নিদ্রা নাই, শান্তি নাই। একপ সম্রাটের জীবন অপেক্ষা দাসের জীবনও অধিকতর সুখময়। ভারতেও ইংরাজগণেরও প্রায় তদ্রূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে এই অবস্থার চরমা কাষ্ঠা উপস্থিত হইয়াছিল। দুর্দ্দান্ত ড্যালহাউসী ভারতীয় সামন্তগণের বক্ষে পদাঘাত করিয়া ও প্রজাসাধারণের ক্রন্দন উপেক্ষা করিয়া বলে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। সামন্ত-বর্গে ও প্রজাগণের অন্তরে অসন্তোষ-বহ্নি প্রধূমিত হইতে লাগিল। ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সেই বহ্নি টোটারূপ সামান্য বায়ুর সংযোগে জ্বলজ্জাল হইয়া অসংখ্য শ্বেত দেহকে ভস্মীভূত করিল। দয়াময়ী মহারাণী আপনার প্রজাগণের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ভারতের রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট যে উদারনীতি উদ্ঘোষিত করেন, তিনি বিশদরূপে সেই নীতি আবার উদ্ঘোষিত করিলেন। সেই ঘোষণাপত্রই ভারতের ম্যাগনাচার্টা। সেই ঘোষণা-পত্রে মহারাণী স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম ভেদ ভুলিয়া কেবল যোগ্যতানুসারে ভারতের যাবতীয় উচ্চ পদ পরিপূরিত করিবেন; এবং জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম ভেদে পদের

ক্ষমতার তারতম্য করিবেন না। আজ মহামতি লর্ড রীপণ মহারাণীর বাক্যের যাথার্থ্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত ইলবার্ট বিল্ অবতারিত করিয়াছেন। ইলবার্ট বিল্ পাশ হইলে আপাততঃ অল্প সংখ্যক মাত্র দেশীয় জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ ইউরোপীয়গণের উপর বিচারাধিকার পাইবেন। ভারতীয় ইংরাজগণের তাহাও অসহনীয়। প্রায় সমস্ত কর্ম্মচারী ও অ-কর্ম্মচারী ইংরাজ একবাক্যে এই বিলের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছেন। দেশীয়গণকে তাঁহাদিগের প্রাকৃতিক স্বত্ব হইতে চিরদিন বঞ্চিত রাখিবার জন্য ভারতীয় ইংরাজেরা দলবদ্ধ হইয়াছেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে। তাঁহারা এই ধনভাণ্ডারের নাম আত্মরক্ষক ধনভাণ্ডার রাখিয়াছেন। অর্থাৎ এদেশে তাঁহাদিগের আধিপত্য চিরদিন রাখিবার জন্য যত কিছু ব্যয় সম্ভব, তাঁহারা এই ধনভাণ্ডার হইতে তাহার সরবরাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তাঁহারা পার্লেমেণ্টের, মহারাণীর, ও ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের উদারনীতি বিফল করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন, 'আমরা বলে ভারত জয় করিয়াছি, বলেই চিরদিন ভারতে রাজত্ব করিব—পরাজিত দাস জাতিকে কখন সমান অধিকার দিব না। কখন তাহাদিগের বিচারাধীনে আসিব না।' এই যুদ্ধখ্যাপনে ভারতের অধিবাসিবৃন্দের হৃদয় বিকম্পিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের হৃদয়ে চিরলালিত আশালতা অঙ্কুরে বিদলিত হইয়াছে। ইলবার্ট বিল্ তাঁহাদিগের অদৃষ্ট পরীক্ষার নিকষস্বরূপ। যদি ইলবার্ট বিল্ পাশ হয়, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিবেন যে তাঁহাদিগের সুখের দিন অদূরবর্ত্তী। যদি পাশ না হয় তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিবেন, যে তাঁহাদিগের অদৃষ্টে এখনও অনেক দুঃখ আছে; বুঝিবেন, মহারাণীর ঘোষণার ও পার্লেমেণ্টের বিধির কোনও মূল্য নাই;—বুঝিবেন ভারত গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে বিষশূন্য ফণী; বুঝিবেন ভারতের প্রকৃত রাজা এক্ষণে ভারতীয় কর্ম্মচারী ও অ-কর্ম্মচারী ইংরাজ; বুঝিবেন, ইংলণ্ডের উদারনীতিক মন্ত্রিগণের এক্ষণে কোনও ক্ষমতা নাই; বুঝিবেন, নিরস্ত্র ভারতের অধিবাসিবৃন্দকে এখন হইতে সশস্ত্র ভারতীয় ইংরাজগণ কর্ত্তৃক পদদলিত ও অপমানিত হইয়া অতিকষ্টে দুর্ভর জীবন

অতিবাহিত করিতে হইবে ; বুঝিবেন, সমবেত চেষ্টার বিরুদ্ধে সমবেত চেষ্টা ভিন্ন তাঁহাদিগের আর গত্যন্তর নাই। * * * *

যদি প্রজাবৎসলা জাতীয় বিদ্বেষশূন্যা স্নেহময়ী ভারতেশ্বরীর উপর ভারতীয় অধিবাসি-বৃন্দের প্রগাঢ় রাজভক্তি না থাকিত, যদি পার্লেমেণ্টের উচ্চ মহৎ আশয়ের উপর ভারতীয় প্রজার অবিচলিত বিশ্বাস না রহিত, যদি মন্ত্রিপ্রবর মহামতি গ্লাড্‌ষ্টোন্ ও তদীয় উদারনীতিক সহচরবৃন্দের উপর ভারতবাসীর অচলা শ্রদ্ধা না থাকিত, যদি ইংরাজজাতিসাধারণের ন্যায়পরতার উপর ভারতবাসীর অটল বিশ্বাস না থাকিত, এবং শেষতঃ যদি ভারতবন্ধু ধার্ম্মিকপ্রবর লর্ড রিপণের ও লর্ড কিম্বার্‌লেনের কর্ত্তব্যপরায়ণতার উপর ভারতবাসীর অচলা আস্থা না থাকিত, তাহা হইলে ইলবার্ট বিলের আন্দোলনজনিত অত্যাচারে এত দিন ভারত অগ্নিময় হইয়া উঠিত। ভারতবাসী অসহ্য গালি সহ্য করিতেছেন, পদে পদে লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইতেছেন, অপমানের মর্ম্মবেদনায় দগ্ধ হইতেছেন, তথাপি হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া আছেন। তাঁহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, যে ন্যায় বিচার হইবেই হইবে। মানুষের হাতে না হয়, ভগবানের হাতে হইবে। তাঁহাদিগের আরও বিশ্বাস, অধর্ম্মের জয় চিরদিন হইতে পারে না। সংক্ষেপতঃ তাঁহাদিগের বিশ্বাস—'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ'—যে দিকে ধর্ম্ম, সেই দিকেরই পরিণামে জয় হইবে। দুর্ব্বল ভারতবাসীর মনকে প্রবোধ দিবার এতদ্ভিন্ন আর কি আছে? *

---

* এ প্রবন্ধটীতে তাৎকালিক আন্দোলনের ছবি প্রতিবিম্বিত আছে বলিয়া অসাময়িক হইলেও পরিগৃহীত হইল।

জার্ম্মান্ বালিকাজীবন ও জার্ম্মান্ গৃহ।

সমস্ত ইউরোপীয় জাতির মধ্যে জার্ম্মান্‌দিগের সহিতই আমাদিগের ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ। সুতরাং জার্ম্মান্‌দিগের রীতি নীতি ও সামাজিক পদ্ধতি জানিতে আমাদিগের স্বভাবতঃ ঔৎসুক্য জন্মিয়া থাকে। সেই ঔৎসুক্য অংশতঃ চরিতার্থ করিবার জন্য অদ্য জার্ম্মান্ বালিকাজীবন ও জার্ম্মান্ গৃহ বিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বালিকা বিধাতার সৃষ্টির একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য। ইহার সরল স্বচ্ছ মুখকান্তিতে যেন স্বর্গীয় ভাব প্রতিবিম্বিত দেখা যায়। ইহাকে দেখিলে যেন স্বর্গের পরী বলিয়া বোধ হয়। ইহাকে দেখিলে দুর্ব্বৃত্তেরও মনে ধর্ম্মভাবের উদয় হয়। পিতার শ্রান্তিহারিণী, মাতার আনন্দদায়িনী, সমাজের বন্ধন-স্বরূপিণী বালিকা—যে দেশেরই হউক সকলেরই স্নেহের সামগ্রী। ভারতীয় বালিকার অন্তর্জীবনেব এখন ঘোর প্রলয়কাল উপস্থিত। এই সময়ে বৈদেশিক বালিকাগণের অন্তর্জীবনের চিত্র প্রচুর পরিমাণে আলোচনা করা ভারতীয় বালিকাগণের ও তদভিভাবকগণের বিশেষ কর্ত্তব্য।

জার্ম্মাণীতে প্রথম হইতেই বালিকাগণের চরিত্র গঠিত করিতে চেষ্টা করা হয়। তিন চারি বৎসর বয়সের সময় সকালে বিকালে বালিকারা "শিশুবিদ্যালয়ে" প্রেরিত হয় বটে, কিন্তু সে সকল বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য শুদ্ধ পুস্তক পাঠ করিতে শিখান নয়। এই সকল বিদ্যালয়ে এক এক জন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত থাকেন। গ্রামের বা পল্লীর কোন সম্ভ্রান্তা প্রবীণা রমণী পতিবিয়োগে উপায়হীনা হইলে ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করার অপমান হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকেই এই পদ প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই প্রবীণা রমণী সর্ব্বপ্রথমে নানাপ্রকারে বালিকাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন। তিনি তজ্জন্য বালিকাদিগের মনোরঞ্জনার্থ নানাবিধ খেলনা ও ক্রীড়া-পুত্তলী লইয়া তাহাদিগের সহিত খেলা করেন, ও তাহারা নির্ব্বিবাদে যাহাতে পর-

স্পরের সহিত খেলা করে, কোমল শাসনে তাহার বন্দোবস্ত করেন। এইরূপে বালিকারা অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্যালয়ের অবস্থাকে অতি সুখপ্রদ বলিয়া মনে করিতে থাকে। বাটী হইতে বিদ্যালয়ে গমন ও তথা হইতে বাটীতে প্রত্যাগমনও তাহাদিগের স্বাস্থ্যের পরিবর্দ্ধক। সুতরাং যাতায়াতেও তাহারা ক্রমে সুখানুভব করিতে থাকে। ক্রমে তাহাদিগের মন সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হইলে ও স্মৃতি ধারণক্ষম হইলে তাহাদিগকে বর্ণমালা পড়িতে ও ঈশ্বরস্তোত্র মুখস্থ করিতে শিখান হয়। ক্রমে তাহারা যেমন বড় হইতে থাকে, তাহারা পড়িতে, গান করিতে, ও ছোট ছোট কবিতা আওড়াইতে, ও তাহাদিগের ক্রীড়া-পুত্তলীদিগকে পরিচ্ছদ পরাইতে শিখে।

আমরা যে বালিকাগণের জীবনচিত্র প্রদান করিতেছি, তাহারা মধ্যবিত্ত লোকের কন্যা। ব্যবহারাজীব, চিকিৎসক, সৈনিক, বণিক্ ও রাজকর্ম্মচারী—ইহাঁরাই মধ্যশ্রেণী। বিশেষতঃ জার্ম্মাণীতে রাজকর্ম্মচারিগণের বেতন অতি অল্প। সেই আয়ে তাঁহাদিগের সুখসচ্ছন্দতা কথঞ্চিৎ চলে বটে, কিন্তু তাহাতে কোন প্রকার জাঁকযমক চলিতে পারে না। কন্যারা জাকযমক প্রিয় হইলে, তাহাদিগের স্বামি-গণ অসুখী হইবে বলিয়া তাহাদিগকে আশৈশব পরিমিতাচার শিক্ষা দেওয়া হয়। সুতরাং কন্যারা যতই কেন বিদ্যাবতী ও কলাবতী হউক না, সামান্য গৃহকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা অপমান বোধ করে না। জননীর দৃষ্টান্ত তাহাদিগের প্রধান শিক্ষাস্থল। জননীকে তাহারা প্রথম প্রথম নানাপ্রকার বেশভূষায় চাকচিক্যশালিনী ও বিবিধ কলায় অলঙ্কৃতা দেখিয়াছিল, কিন্তু কালে তাঁহাকে পুরন্ধ্রী হইয়া—সকলের পরিচ্ছদ সীবন, রন্ধন, ও পরিচ্ছদ পাদুকাদির যথাস্থানে সন্নিবেশন প্রভৃতি—সমস্ত গৃহকার্য্যই করিতে হইয়াছে, তাহাও তাহারা দেখিতে পায়। সুতরাং তাহারা সেই বালিকা-বয়স হইতেই আপনাদিগের কর্ত্তব্যের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে।

জার্ম্মান্ জননীরা পরিচ্ছদ-গর্ব্বকে এত ঘৃণা করেন, যে পাছে কন্যাগণের অন্তরে সেই অশুভ ভাব বদ্ধমূল হয়, এই ভয়ে তাঁহারা তাহাদিগকে যথোচিত পরিচ্ছদে ভূষিত করেন না। ব্রিটন বালিকার

তরঙ্গায়িত কেশপাশ, স্ফীত কারুকর্ম্ম-সমুচ্ছ্বাসিত পরিচ্ছদ—জার্ম্মাণীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। জার্ম্মান্ বালিকাদিগের পরিচ্ছদ সাদাসিধা, কেশ পেটীকরা, এবং একটী রঞ্জিত ফিতায় আবদ্ধ দুইটী বেণী পৃষ্ঠদেশে লম্বমান। ছোট ছোট বালিকাগণের পরিচ্ছদ আগুল্ফ-লম্বিত; শীত-কালে তাহাদিগের পাদদ্বয় কৃষ্ণ বস্ত্রের পাজামায় আবৃত। জার্ম্মান্ জননীরা, বালিকাগণের মুখকান্তি পরিপুষ্ট করিবার জন্য কোনও চেষ্টা করেন না; কেবল সূর্য্যালোকে যাহাতে সেই মুখ-কুমুদিনী ম্লান না হয় এই জন্য ইহাকে মুখাবরণ দ্বারা আবৃত করিয়া রাখেন। কেশের প্রতি তাঁহাদিগের বিশেষ যত্ন। সবিশেষ পরিমার্জ্জনায় কেশ এরূপ চাক-চিক্যশালী হয় যে সময়ে সময়ে ইহাকে রেশম বলিয়া ভ্রম জন্মে, এবং এরূপ পরিপুষ্ট হয় যে অনেক স্থলে ইহাকে আগুল্ফ বিলম্বী দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাথমিক জ্ঞানোপার্জ্জন ও ধর্ম্মোপদেশ সমাপ্ত হইলে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইহাকে "নাসচুল" বা সীবন-শিক্ষা-মন্দিরে প্রেরণ করা হয়। তথায় সে বিবিধ সূচীকার্য্য, মোজাবুনন, কার্পেট বুনন প্রভৃতি কার্য্য সমাপ্ত করিয়া "হোহীয়ার টচটা-রস্কুল" অর্থাৎ শিক্ষা-সমাপ্তিকারী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। এখানে সে ফরাশি ভাষা, উদ্ভিজ্জ বিদ্যা এবং নৃত্য গীত চিত্র কর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ কলা শিক্ষা করে।

জার্ম্মাণীর ন্যায় আর কোন দেশেই যান্ত্রিক সঙ্গীতের এত চর্চ্চা দেখা যায় না। কি যুবা কি বৃদ্ধ, কি ধনী কি নির্ধন—সঙ্গীতের চর্চ্চা সক-লেরই দুর্দ্দমনীয় ব্যসন ও বৃত্তি। ইহা ধনীর আমোদ প্রমোদের মূল, এবং দরিদ্রের জীবিকা; কারণ সঙ্গীত-ব্যবসায়ীর জার্ম্মাণীতে বিশেষ আদর। ইংলণ্ডে প্রত্যেক শুভকার্য্যে ভোজোৎসব, জার্ম্মাণীতে প্রত্যেক শুভকার্য্যে সঙ্গীতোৎসব। জার্ম্মাণীতে রাজনীতির আলোচনা অপেক্ষা, সঙ্গীতের চর্চ্চাই অধিকতর বলবতী। জার্ম্মাণীতে স্বাজাতিপ্রেম ও স্বদেশহিতৈষণা বক্তৃতায় বা তর্ক বিতর্কে পরিণত না হইয়া সঙ্গীতের সাহায্যে অভিগীত হইয়া লোকের চিত্ত হরণ করে।

জার্ম্মান্ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকে শিকার করা, পাখী মারা বা মাছ ধরা ভাল বাসেন না। তাঁহারা মাছধরাকে অতিশয় নীচ কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন।

বিবাহ বা খ্রীষ্টোৎসব ব্যতীত অন্য সময়ে স্ত্রী-পুরুষ-সংমিশ্রণ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল উৎসবকালে ভদ্রলোকে ও ভদ্র মহিলারা একত্র মিশ্রিত হন বটে, কিন্তু সেও বিশেষ সংযমের সহিত। পুরুষেরা একদিকে বসিয়া পরস্পর কথোপকথন করেন, এবং স্ত্রী-লোকেরা দল বাঁধিয়া অন্যদিকে পরস্পর আলাপ করেন। বলের (Ball) সময় স্ত্রী-পুরুষে একত্র নৃত্য করেন বটে, কিন্তু বল সমাপ্ত হইলেই যুবতী নৃত্য-সহচরের নিকট বিদায় লইয়া জননীর নিকট গমন করেন। নৃত্য-ভঙ্গের পর নৃত্য-সহচরের যুবতীর হস্তধারণে কোন অধিকার নাই। সেরূপ করিলে তাঁহাদিগের বিশেষ নিন্দা হইবে। নৃত্য-ভঙ্গের পর যুব-তীর অঙ্গুলির অগ্রভাগ মাত্র স্পর্শকরণে পুরুষের অধিকার আছে। ইহার অতিরিক্ত করিলে তাঁহাদিগের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে। নৃত্যসহচর নৃত্যভঙ্গের পর এতদূর উদাসীন ভাব ধারণ করিলে কিন্তু ইংলণ্ডীয় রমণী আপনাকে বিশেষ অপমানিতা মনে করেন।

জার্ম্মাণীর লোকেরা অতি সামান্য ভাবে বাস করে। তাহাদিগের অধিকাংশেরই স্বতন্ত্র গৃহ নাই। একটী বাটীর চারি পাঁচ তল। প্রত্যেক তলে এক একটা পরিবার বাস করে। বাটী গুলি প্রকাণ্ড এবং বাহির হইতে দেখিতে অতি সুন্দর; কিন্তু অভ্যন্তর ভাগ অতি সামান্য। কার্পেটের প্রচুর ব্যবহার নাই, এই জন্য মেজে প্রায় বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত। গৃহাভ্যন্তরে ইংলণ্ডের ন্যায় অতিরঞ্জিত ও স্থূল মশারি এখানে দেখা যায় না। এখানকার মশারি অতি পাতলা ও তরল বর্ণের, জার্ম্মান্ গৃহসামগ্রীর মধ্যে মেহাগনী কাষ্ঠের চেয়ার, টেবিল, খাট প্রভৃ-তিই বিশেষ দ্রষ্টব্য। জার্ম্মাণেরা কোন প্রকারে টেবিল সাজায় না। ইংরাজ-গৃহের আয়না একটী প্রধান ভূষণ, কিন্তু জার্ম্মান্-গৃহে আয়না এত উচ্চে টাঙ্গান থাকে, যে পদাগ্রে দাঁড়াইয়াও তাহাতে মুখ দেখা যায় না। আইভীলতা ও পিয়ানো এই দুইটীই জার্ম্মান্দিগের গৃহদেবতা। এই

দুইয়ের নিকটেই সমস্ত জার্ম্মান্ পরিবার নত-শির। অতিশৈত্যনিবন্ধন আইভীলতা অতি কষ্টে জার্ম্মাণীতে পরিবর্দ্ধিত হয়। এত দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই ইহার এত আদর। যদি জানালায় টবে করিয়া একটী আইভীলতা রাখিতে পারিলেন, তবেই একজন জার্ম্মান্ গর্ব্বে স্ফীত হইলেন।

অনেক সময় এরূপ ঘটে যে অনেকগুলি সঙ্গীত-চর্চ্চা-শীল পরিবার একত্র এক বাটীতে বাস করেন, এবং তাঁহারা প্রত্যহ মিলিত হইয়া ঐকতানিক বাদ্যে নিমগ্ন হন। ইহার পরিণাম এই হয় যে করলালিত শিশুরাও সঙ্গীতে আনন্দানুভব করিতে শিখে। অতি শৈশবেই তাহাদিগের কণ্ঠ সঙ্গীতানুকূল হইয়া উঠে; তাহারা সঙ্গীতের মূল সূত্র শিখিবার জন্য আপনারাই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে।

বালিকার বয়স যখন পঞ্চদশ বা ষোড়শ তখন তাহার বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত হয়। তখন তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ সকল যত্নপূর্ব্বক শিখিতে হইবে, ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পাঠ করিতে হইবে, এবং সেই সকল স্বহস্তে নকল করিতে হইবে। এই সমস্ত বাধা বিঘ্নের মধ্যেও তাহাকে এখন হইতে সমস্ত পরিবারের জন্য রন্ধনাদি করিতে হইবে। এসকল সত্ত্বে তাহাকে নিয়ত সঙ্গীত-শাস্ত্রের আলোচনা করিতে হইবে।

জার্ম্মান্ বালিকারা বন্ধনবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী। তাহারা উদ্ভিদ ও মৎস্য মাংসের নানাবিধ পাক ও বিবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে পারে। গ্রীষ্মকাল অতীত হইলে তাহারা উদ্ভিদ হইতে নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখে। কারণ শীতকালে জার্ম্মাণীতে প্রায় কোন-প্রকার উদ্ভিদ পাওয়া যায় না।

জার্ম্মান্-গৃহিণী স্বামী ও পুত্রকন্যাদিগের জন্য আহার প্রস্তুত করিতে সবিশেষ ব্যগ্র। এতদ্ভিন্ন পরিচ্ছদাদির তত্ত্বাবধারণ করা ও বাহিরে কন্যাগণের সঙ্গে গমন করা তাঁহার আর দুই প্রধান কার্য্য। কারণ জার্ম্মাণেরা অবিবাহিতা কন্যাকে একাকী কোন স্থানে যাইতে দেন না। শরৎকালে যখন শীতকালের জন্য খাদ্যদ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়, সে সময়ে কাজের এত ভীড় হয় যে কোন কুলকামিনী একাকী তাহা নির্ব্বাহ করিয়া উঠিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহাকে প্রতিবেশিনীদিগের

সাহায্য লইতে হয়। এইরূপে প্রত্যেক বাড়ীতে সকলে মিলিয়া কাজ করায়, তাদৃশ সঙ্কট সময়েও লোকাভাব হয় না।

প্রতি বাড়ী বাড়ী যখন সকল প্রতিবেশিনীগণের সমাবেশ হয়, তখন কাফী দিয়া সকলের সম্মান বৰ্দ্ধন করা হয়। কাফী খাইতে খাইতে প্রতিবেশিনীগণের পরের কথা লইয়া অনেক আন্দোলন হয়। "অমুকের স্বামী এত অল্প বেতন পায়, তথাপি তাহার স্ত্রীর পরিচ্ছদের ছটা দেখ! শুনিতে পাই, তাহার স্বামী নাকি ইংরাজের নিকট ঘুস খাইয়া তাহাদিগের নিকট আমাদিগের গৃহছিদ্র প্রকাশ করে। ইংলণ্ড হইতে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই রেজিষ্টারি চিঠি তাহার নিকট আসে। তাহার মেয়েটী আবার অমুক সৈনিকপুরুষের দিকে কটাক্ষপাত করে। তাহার মাতাও শুনিতে পাই সে বিষয়ে সাহায্য করে। এ বড় লজ্জার কথা! কিন্তু তাকে কে বিবাহ কর্‌বে, কারণ সে রন্ধন কার্য্য কিছুই জানে না। কেবল পিয়ানো বাজাতে পাবে; সহজ সহজ গান কর্‌তে পারে, এবং কদাকার প্রতিমূর্ত্তি আঁক্‌তে পারে।" পুরন্ধ্রীগণ সমবেত হইলে এই সকল কথায় সময় কাটাইয়া থাকেন।

ষোড়শবর্ষীয়া বালিকা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গীত শাস্ত্রের অনুশীলনে এতদূর তন্ময় হইয়া যায়, যে তাহার বেশভূষা বা অঙ্গসংস্কারে কোন প্রকার আস্থা থাকে না। জার্ম্মান্ বালিকারা অপরিচিত সমাজের সহিত তত মেশামিশি করে না, এই জন্য অঙ্গের অসংস্কারে বা বেশভূষার অভাবে তাহাদিগের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু তাহাদিগের জননী তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া মধ্যে মধ্যে অপরিচিত সমাজেও লইয়া যান। সেই সময় জননীই তাহাদিগের অঙ্গসংস্কার ও বেশভূষা করিয়া দেন। কিন্তু ইংলণ্ডের ন্যায় অবিবাহিতা কন্যাকে তরাইবার এখানে নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হয় না।

জার্ম্মাণীতে পাণিগ্রহণার্থী ব্যক্তির প্রথমেই কন্যাকে সম্বোধন করিবার অধিকার নাই। তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে কন্যার পিতার নিকটে অনুমতি লইতে হইবে। এই অনুমতি না পাইলে তাঁহার কন্যার গৃহে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। অভদ্রলোকে সময়ে সময়ে গুপ্ত ভাবে

অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে কন্যা-গৃহে প্রবেশ করিয়া কন্যার হৃদয় হরণ করিতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়ম নহে, সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার মাত্র। কন্যাপ্রার্থী কন্যার পিতার নিকট অনুমতি পান বটে, কিন্তু তিনি নির্জ্জনে তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পান না। অভিভাবকের নয়ন-সমক্ষে তাঁহাকে কন্যার সহিত কথোপকথন করিতে হইবে। কন্যা—পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নিগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহাও তিনি বসিয়া দেখিতে পারেন। পারিবারিক ব্যবহারে কন্যার স্বভাব চরিত্র যতদূর জানা যাইতে পারে, তাহা জানিবার তাঁহার অধিকার আছে। জার্ম্মান্ বরেরা কন্যার বাহ্য আকৃতিতে সম্পূর্ণ মুগ্ধ হন না। তাঁহারা কন্যার স্বভাব চরিত্র সবিশেষ বিদিত না হইয়া কখনই বৈবাহিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন না। যদি জার্ম্মান্ বর তাঁহার প্রণয়পাত্রীকে অভীষ্ট গুণে বিভূষিতা দেখেন, তবেই তাঁহাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হন। তখন তাঁহারা পরস্পর অঙ্গুরীয়ক বিনিময় করেন, এবং তাঁহারা যে পরস্পর প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হইয়াছেন, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদিগের বিদিতার্থ তাহা সম্বাদপত্রে প্রচার করেন। যদি বর এই বিজ্ঞাপনের পরও সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে কন্যাকে দুর্ব্বিনীতা বা বৃথা-গর্ব্বিতা বলিয়া জানিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি ভদ্রতার নিয়ম ভঙ্গ বা রাজবিধি উল্লঙ্ঘন না করিয়াও এই বিবাহ হইতে অপসৃত হইতে পারেন। কিন্তু বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর বিবাহভঙ্গ অল্পই ঘটিয়া থাকে।

একবার বৈবাহিক জীবনে আবদ্ধ হইলে জার্ম্মান্ দম্পতী আমরণ অবিচ্ছিন্ন থাকেন। ইহার প্রধান কারণ—জার্ম্মাণীতে জীবিকা নির্ব্বাহের কঠোরতা। অনেককেই অতি সামান্য অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে উন্নতির উচ্চতম সোপানে উঠিতে হয়। অনেকে প্রথম অবস্থায় বেতনস্বরূপ এক কপর্দ্দকও প্রাপ্ত হন না। আবার যখন যুবক কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাইতে আরম্ভ করেন, তখন যুবতীর পিতা মাতা হয় ত সে সময় আর কন্যাকে কিছুই সাহায্য করিয়া উঠিতে পারেন না। জার্ম্মাণীতে বিবাহের পর কন্যা যখন প্রথম স্বামীগৃহে গমন করেন, তখন পিতা-

মাতা তাঁহাকে যে শুদ্ধ তাঁহার প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াই নিষ্কৃতি পান এরূপ নহে, তাঁহাদিগকে কন্যার সংসার-করণোপযোগী যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী প্রদান করিতে হয়; এতদ্ভিন্ন যতদিন জামাতা কিছু আনিতে না পারেন, ততদিন তাঁহাদিগকে জামাতা ও কন্যার ভরণ-পোষণের জন্য নিয়মিতরূপে কিছু কিছু অর্থসাহায্য করিতে হয়। এই-রূপে কন্যার সহিত বরের আর একটী গুরুতর বন্ধন বাঁধিয়া যায়। এই সকল গুরুতর দায়িত্বের জন্যই জার্ম্মান্ জননীরা কন্যার বিবাহ দিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যস্ত হন না। এই জন্যই তাঁহারা ইংরাজ জননীগণের ন্যায় কন্যাগণকে বিবাহযোগ্য বসনভূষণে সাজাইয়া প্রকাশ্য জনসমাজে অবতারিত করিতে চাহেন না। কারণ অবস্থা ভাল না হইলে কন্যার বিবাহে পিতামাতাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে। যতদিন কন্যার বিবাহ না হয়, ততদিন পিতা যে অল্প বেতন পান, তাহাতেও তাঁহার খরচপত্র একপ্রকার চলিয়া যায়। কিন্তু কন্যার বিবাহ হইলে তাহাকে সসজ্জ করিয়া পতিগৃহে পাঠাইতে তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায়।

জার্ম্মান্ যুবতীরাও বিবাহ করিতে নিতান্ত ব্যগ্র নহেন, কারণ বৈবাহিক জীবনে তাঁহাদিগের সুখের বিশেষ আশা নাই। পিতার জীবদ্দশায় তাঁহারা পিতৃগৃহে যতদূর সুখিনী, পতিগৃহে পুত্রকন্যাবতী হইয়া অল্প আয়ে জীবন কাটাইতে তাঁহারা ততদূর সুখানুভব করেন না। পিতার মৃত্যু হইলেও জার্ম্মান্ বালিকারা আমাদের দেশের বালিকাগণের ন্যায় নিতান্ত নিরবলম্ব ও হতাশ হইয়া পড়েন না। তাঁহারা যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতে পিতা ও স্বামী বিনাও কথঞ্চিৎ স্বাধীন ভাবে জীবন কাটাইতে পারেন।

কন্যা—বিবাহরাত্রি উৎসবে কাটাইবার জন্য বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজন সকলকেই নিমন্ত্রিত করেন। কন্যালয়ে বিবাহরাত্রিতে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অন্যান্য নানাবিধ আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিমাত্রই সেই সময়ের উপযোগী বিবিধ যৌতুক লইয়া কন্যালয়ে আসেন ও কন্যাকে উপহার প্রদান করেন। পরদিন "কোড্ নেপো-লিয়ন্" অনুসারে নির্দ্দিষ্ট রাজকর্ম্মচারী দ্বারা বরকন্যা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ

হয়েন; তাহার পর তাঁহারা আপন ইচ্ছানুসারে গির্জ্জায় গিয়া ধর্ম্মযাজকের সম্মুখে শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক বিবাহের শেষ অঙ্গ পূর্ণ করেন। বিবাহের পর দম্পতী কিছু দিনের জন্য দেশভ্রমণে নির্গত হন; কিন্তু অর্থাভাবে সকলেরই অদৃষ্টে এ সুখ ঘটিয়া উঠে না। যাঁহারা দেশ ভ্রমণে নির্গত হইতে পারেন, তাঁহারা বিবাহের পরই একবারে "ঘরকন্না" আরম্ভ করেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জার্ম্মাণীতে সকলেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাটী নাই। সুতরাং নবদম্পতী বিবাহের পর কোন বাটীর দুই একটী কুঠারী ভাড়া লইয়া তাঁহাদিগের নূতন জীবন আরম্ভ করেন। ইহাতে তাঁহাদিগের কোন নিন্দা নাই, কারণ ইহা তথাকার প্রথা। এই জন্যই জার্ম্মান্ যুবকেরা অল্প আয়ে কথঞ্চিৎ জীবন যাপন করিতে পারেন। নবোঢ়া ইংরাজ যুবতীর ন্যায় জার্ম্মান্ যুবতীরা ততদূর ফুলবধূ নন, এই জন্যও তাঁহাদিগের স্বামিগণের বৈবাহিক জীবন তত ক্লেশকর বোধ হয় না। ইংরাজ রমণীরা বিবাহের পর বিলাস দ্রব্যের জন্য স্বামীকে নানামতে জ্বালাতন করিয়া থাকেন। এইজন্য ইংলণ্ডে অনেকেই বৈবাহিক জীবন অপেক্ষা অনূঢ়াবস্থাকে অধিক আদর করিয়া থাকেন। কিন্তু জার্ম্মান্ যুবতীরা বৃথা গর্ব্বজনিত সেই সকল বিলাসিতা হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত। এই জন্যই জার্ম্মাণীতে অল্পবেতনের লোকে বিবাহ করিতে ততদূর ভীত হয়েন না। এই জন্যই জার্ম্মাণীতে ইংলণ্ডের ন্যায় অনূঢ় যুবকদলের সংখ্যা অধিক নহে।

এই প্রস্তাবে জার্ম্মান্ জীবনের যে চিত্র প্রদান করা হইল, তাহা জার্ম্মান্ নগরসমূহের মধ্যশ্রেণীর লোকের। উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীতে স্থানে স্থানে এই চিত্রের বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ ইহা জাতি-সাধারণেরই প্রতিবিম্ব। জার্ম্মান্দিগের সামাজিক অবস্থার সহিত প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণের সামাজিক অবস্থার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে—এই প্রস্তাব পড়িলে সহজেই উপলব্ধি হইবে। জার্ম্মাণেরা যে দেব-সেনাপতি স্কন্দ কর্ত্তৃক তাড়িত দৈত্যগণ—এই সমাজসাম্য তাহার একটী আভ্যন্তরীণ প্রমাণ।

—oooo—

বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত।*

স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতির পরস্পর মিলন এবং সেই মিলনের ফল-স্বরূপ সন্ততি সমাজগৃহের মূলভিত্তি। এই মিলনের নাম বিবাহ। এই মিলনসম্বদ্ধ পুরুষ—স্বামী ও স্ত্রী—ভার্য্যা বা স্ত্রী নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। যে সকল নিয়মাবলী দ্বারা এই বিবাহ সংযমিত হয় তাহা সম্পূর্ণ লৌকিক। লৌকিক না হইলে কখন ইহা এত পরিবর্ত্তনশীল হইত না। লৌকিক না হইলে বিভিন্ন দেশের শাস্ত্রকারেরা বিভিন্ন কালে স্ব স্ব ইচ্ছামত এতৎসম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার নিয়মাবলী প্রবর্ত্তিত করিতে পারিতেন না। এই নিয়মাবলী দৈব হইলে আদি মনুষ্য হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইহা সকল দেশে সকল সময়ে একভাবে চলিয়া আসিত। কিন্তু জগতে আমরা ইহার বৈপরীত্যই উপলক্ষিত করিয়া থাকি। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত জগতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, দেখিতে পাই, যে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর সম্বন্ধ সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। আদি কালে বিবাহের কোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল না। যে পুরুষের যে রমণীকে লইয়া যতক্ষণ বা যত দিন থাকিতে ইচ্ছা হইত, তিনি ততক্ষণ বা তত্তদিন থাকিতে পারিতেন। ক্রমে বিবাহের প্রথা চিরস্থায়িনী হইয়া উঠিল। কিন্তু বিবাহপ্রথা চিরস্থায়িনী হইয়াও, বিভিন্ন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বিভিন্ন কালে বিভিন্ন বিভিন্ন আকার ধারণ করিতেছে। কোন দেশে এক স্ত্রী দ্বি বা বহুপতিকে বিবাহ করিতে পারেন, কোন দেশে এক পতি দ্বি বা বহু স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারেন, কোন দেশে বা এক পতি একমাত্র ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন। হিন্দু ও মুষলমানদিগের মধ্যে পুরুষের বহুভার্য্যার পাণিগ্রহণ, তিব্বতীয় বৌদ্ধদিগের মধ্যে এক ভার্য্যার বহুপতিগ্রহণ, এবং খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যে এক পতির একমাত্র ভার্য্যাগ্রহণ প্রচলিত

---

* শ্রীঈশানচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও নানা দেশে নানা প্রকার বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে; এবং বিবাহ বিষয়ে প্রতিদিন নূতন নূতন মতের উদ্ভাবনা হইতেছে। কেহ বা বিবাহকে ধর্ম্মমূলক, কেহবা প্রেমমূলক, এবং কেহবা ইন্দ্রিয়মূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। কোন স্থানে চির-বিবাহ-প্রণালীর পরিবর্ত্তে ইচ্ছাসংসর্গের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইতেছে, কোন স্থানে চিরপ্রচলিত বহুবিবাহকে উঠাইবার চেষ্টা হইতেছে, কোন স্থানে বা বহুবিবাহকে নবপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। এক দেশে যাহা ভাল বলিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে, আর এক দেশে তাহা অনিষ্টকর ও অযৌক্তিকর বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে। একদেশেও আবার ভিন্ন ভিন্ন লোকের এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত। ঘাত প্রতিঘাতে হিন্দুসমাজে ঘোরতর তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে। এ তরঙ্গের বেগ কে রোধ করিতে পারে? এরূপ ভাব অস্বাভাবিক নহে। মানব-জাতির মন স্বভাবতঃ পরিবর্ত্তনশীল। ইহা চিরকাল কখন একভাবে থাকিতে পারে না। স্থিরতা ইহার মৃত্যু। যেমন সরোবরের জল স্থির বলিয়া শীঘ্র দূষিত ও কলুষিত হয়, সেইরূপ মানবমন ও মানবমনঃকল্পিত নিয়মাবলীও অধিক দিন স্থিরভাবে থাকিলে নিশ্চয়ই দূষিত ও কলুষিত হইবে। পরিবর্ত্তন মানবমনের জীবন। পরিবর্ত্তনই ইহার উন্নতি। যে সময় হইতে হিন্দু সমাজে এই পরিবর্ত্তন রহিত হইয়াছে, যে সময় হইতে ঋষিদিগের বাক্য অখণ্ডনীয় বেদবাক্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, *সেই সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুসমাজের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে।* ঋক্‌বেদের সময় হইতে মনুর সময় পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজে অবিশ্রান্ত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া প্রতীতি হয়। সেই সময়েই আর্য্য জাতির গৌরবরবির মধ্যাহ্ণ কাল। ক্রমে পরিবর্ত্তন রহিত হইল, আর্য্যজাতিও ঘোরতর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। নিশ্চেষ্টতা তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতা হইয়া উঠিল। নিশ্চেষ্টতাই তাঁহাদিগের স্বর্গ ও মোক্ষ বলিয়া চতুর্দ্দিকে উদ্ঘোষিত হইতে লাগিল। এইরূপে আর্য্য-জাতি কিছুকাল নিদ্রায় অভিভূত ও বিহ্বল হইয়া ছিলেন। এক্ষণে প্রতীচ্য জ্ঞানসূর্য্য উদিত হইয়া আর্য্যজাতির সেই নিদ্রা ভঙ্গ করিয়াছে।

আর্য্যজাতি নব জীবন প্রাপ্ত হইয়া নবীন উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়াছে। এ সুখের সময় গ্রন্থকার কেন এত বিষণ্ণ হইয়াছেন?

মানুষ যে অবস্থায় মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সেই অবস্থাতেই বসুন্ধরার কুক্ষিস্থ হইতে পারে না। যে পারে, সে মানুষ নয়। সে নরাকার জড়পিণ্ড। আমরা এরূপ লোকের অস্তিত্ব গ্রাহ্যই করি না। যাঁহার জীবনে যে পরিমাণে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে বড় লোক। পরিবর্ত্তনে অনেক সময় অনেক অমঙ্গল সংঘটিত হয় সত্য; কিন্তু পরিবর্ত্তন—শৌর্য্য, সাহস, সজীবতা, দুঃখসহিষ্ণুতা প্রভৃতি যে সকল অসংখ্য মানসিক গুণের উদ্ভাবনা করে, তাহাতে যে জগতের অসংখ্য মঙ্গল সংসাধিত হয়, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ফরাশিবিপ্লব নররুধিরতরঙ্গে ভূমণ্ডল উক্ষিত করিয়াও যে জগতে নব জীবন সঞ্চারিত করিয়াছে, তাহা কে অস্বীকার, করিবেন? গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে পুনর্বার বিবাহিতা বিধবার সন্তান পৌনর্ভব ও হইবে না, একবারে ঔরস পুত্র তুল্য গণ্য হইবে; তাঁহার মতে পুনর্ব্বিবাহার্থিনী বিধবার বয়সেরও কোন নিয়ম নাই। কোন ব্রাহ্মের যত্নে নূতন এক বিবাহব্যবস্থা হইল, তাহা জাতিনির্ব্বিশেষ হইল, তাহাতে কন্যা বরের বয়সের যোগ্যাযোগ্যতারও নিরূপণ রহিল না—বয়োজ্যেষ্ঠা স্ত্রীরও বয়ঃকনিষ্ঠ পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিবার বাধা ত্যাগ হইল।

গ্রন্থকারের জানা উচিত ছিল যে এ সকল পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা সর্ব্বত্র অনুভূত না হইলে কোন ব্যক্তিবিশেষের যত্নে কখন এরূপ গুরুতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে পারিত না।

"বিধবাবিবাহের কি গরলময় ফল উৎপন্ন হয়, গত ১৮ই মার্চের ইণ্ডিয়ান্ মিরার তাহার দুইটী বাস্তব ঘটনার উদাহরণ দিয়া বঙ্গদর্শনের মধুমতিকে বঙ্গবাসীদিগের হৃদয়ে পুনঃ প্রদর্শিত করিয়াছেন"।

দুইটী বাস্তব ঘটনায় বিধবাবিবাহের গরলময় ফল উৎপন্ন হইতে দেখিয়া গ্রন্থকার একেবারে বিধবাবিবাহকে অনিষ্টোৎপাদক মনে করিয়াছেন। কি গভীর যুক্তি!

"কিন্তু এক্ষণে আনন্দ সহকারে দেখিতেছি, সে দিন গিয়াছে; ঝড় থামিয়াছে; স্রোতও ফিরিয়াছে। * * * কিন্তু আমার হৃদয়ে আশঙ্কার অধিকার অধিক। আমি ভয় করি, আবার এই স্রোত বিপরীত দিকে যাইবে। কে বলিতে পারে, যাইবে না?"

আমরা গ্রন্থকারকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে এই স্রোত প্রকৃতির নিয়মানুসারে আবার বিপরীত দিকে যাইবে, কেহই ইহার গতি রোধ করিতে পারিবে না। স্রোতের গতিপরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। তিনি যেন প্রত্যেক পরিবর্ত্তনে পরলোকের অভিলাষী না হন।

আমরা এ পর্য্যন্ত শুদ্ধ পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা, অবশ্যম্ভাবিতা ও অনিবার্য্যতা মাত্র বর্ণনা করিলাম। এক্ষণে "বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত" সকলের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আমাদিগের বিশ্বাস এই যে পৃথিবীতে বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে যত প্রকার মত প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে মনুর ও মহম্মদের মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মনুর মতে যে অনেক দোষ ও অভাব নাই এ কথা আমরা বলিনা। কারণ মনুষ্যকৃত নিয়মাবলী দোষস্পর্শশূন্য হইতে পারে না, ইহা আমাদিগের পূর্ণ বিশ্বাস। এই দোষগুলির দূরীকরণ ও অভাবগুলির পরিপূরণ করিলে বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মতগুলি সভ্যজগতে যে অতি উপাদেয় দ্রব্য হইবে, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই। ইহাকে সর্ব্বাবয়বে বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত করিবার চেষ্টা উন্মত্ততা মাত্র। তবে ইহার যে অবয়বগুলির বর্ত্তমান সময়ে প্রচলন আবশ্যক, আমরা কেবল তাহারই মীমাংসা করিব।

মনুষ্যের যত প্রকার বিবাহ ঘটিতে পারিত, মনু তৎসমুদায়কে আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ। (১)

বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা কন্যাবরের আচ্ছাদন ও পূজন পুরঃসর বিদ্যা-

---

(১) ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ। গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধর্মঃ॥ ৩।২১

সদাচার-সম্পন্ন অপ্রার্থক বরকে কন্যাদান করার নাম "ব্রাহ্ম" বিবাহ (১)

হিন্দুদিগের মধ্যে এই বিবাহ সর্ব্বত্র প্রচলিত।

অতি বিস্তৃত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে কর্ম্মকর্ত্তা ঋত্বিক্‌কে সালঙ্কৃত কন্যা দান করাকে "দৈব" বিবাহ বলা যায়। (২)

এই প্রকার বিবাহ এক্ষণে সম্পূর্ণ অপ্রচলিত এবং ইহার পুনঃ-প্রবর্ত্তনারও কোন আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না।

বরের নিকট হইতে এক বা দুই গোমিথুন গ্রহণ-পূর্ব্বক যে কন্যা-দান, তাহার নাম "আর্য" বিবাহ। (৩)

এই বিবাহও এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে অপ্রচলিত রহিয়াছে। ইহারও পুনঃ প্রবর্ত্তনা অনাবশ্যক।

"তোমরা উভয়ে ধর্ম্মের আচরণ কর" বর ও কন্যাকে এই কথা বলিয়া অর্চ্চনা পূর্ব্বক কন্যাদানের নাম প্রাজাপত্য বিবাহ। (৪)

কন্যার পিত্রাদিকে এবং কন্যাকে শক্ত্যনুসারে শুল্ক দিয়া বরের স্বেচ্ছানুসারে যে কন্যা-গ্রহণ, তাদৃশ বিবাহকে আসুর বিবাহ বলা যায়। (৫)

কন্যা এবং বর উভয়ের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ সহকারে যে বিবাহ হয় তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলা যায়। (৬)

---

(১) আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং। আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৩। ২৭

(২) যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে। অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে। ৩। ২৮

(৩) একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ। কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে। ৩। ২৯

(৪) সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য চ। কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিস্মৃতঃ। ৩। ৩০

(৫) জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ। কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যা-দাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে। ৩।৩১

(৬) ইচ্ছয়ান্যোন্য সংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ। গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ। ৩।৩২

গান্ধর্ব্ব বিবাহ এক্ষণে প্রচলিত নাই। এই বিবাহের পুনঃ প্রচলন আরম্ভ হইলে কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রূণ-হত্যার ভীষণ পাতকে দূষিত ও কলঙ্কিত হইবে না। তাহা হইলে প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর পবিত্র সম্মিলন আর ব্যভিচার নামে আখ্যাত হইবে না। তাহা হইলে কত দুষ্মন্ত ও কত শকুন্তলা আমাদের নয়ন-সমক্ষে রমণীয় আকার ধারণ করিবে, এবং কত ভরত, কত আলেক্জা-ণ্ডার ও কত যীষস্ মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া জগতের সিংহাসন অধিকার করিবেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

আসুর বিবাহ অনেকস্থলে প্রচলিত রহিয়াছে। বংশজ ও শ্রোত্রিয় বরের বিবাহে এইরূপ শুল্ক দেওয়ার প্রথা অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

বিপক্ষ কন্যাপক্ষীয়দিগকে হত ও আহত করিয়া প্রাচীরাদি ভেদ পূর্ব্বক রোরুদ্যমানা ক্রোধান্বিতা কন্যাহরণের নাম রাক্ষস বিবাহ। (১)

নিদ্রায় অভিভূতা বা মদ্যপানে বিহ্বলা অথবা অনবধানযুক্তা স্ত্রীতে নির্জ্জন প্রদেশে গমন করার নাম পৈশাচ বিবাহ। ইহা আট প্রকার বিবাহের মধ্যে পাপজনক ও অতি অধম। (২)

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে পৃথি-বীতে যত প্রকার মত প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে মনু ও মহম্মদের মত সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইলেও দোষস্পর্শশূন্য নয়। তন্মধ্যে কেবল মনুর মতের দোষগুণ বিচার করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

বিবাহ কাহাকে বলে এবং ইহার উদ্দেশ্যই বা কি এই গুরুতর প্রশ্নের কে উত্তর দিবে? সাধারণ লোকে ইহার মূল অনুসন্ধান করিবে না, সুতরাং তাহারা এরূপ প্রশ্নে চমকিত হইয়া প্রশ্নকর্ত্তার উপর খড়্গা-হস্ত হইয়া উঠিবে। তাহাদিগের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে যে প্রশ্নকর্ত্তা নাস্তিক, নতুবা এরূপ স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত করিবেন কেন।

---

(১) হত্বা ছিত্বা চ ভিত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ। প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে। ৩। ৩৩

(২) সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি। স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥ ৩। ৩৪

তাহারা বলিবে, শুভদিনে শুভলগ্নে বরও কন্যাপক্ষীয়দিগের সম্মুখে অগ্নি সাক্ষী করিয়া কন্যা বরের যে পরস্পরের পাণিগ্রহণ তাহাই বিবাহ, আর পুত্র উৎপাদন করাই ইহার উদ্দেশ্য—আবার কি? কিন্তু চিন্তা-শীল সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত—বিবাহের এই লক্ষণে ও শুদ্ধ এই উদ্দেশ্য নির্ব্বা-চনে পরিতৃপ্ত হইবেন না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিবেন—বিবাহ কাহাকে বলে এবং ইহার উদ্দেশ্যই বা কি? দেখা যাউক আমরা এই চিন্তাশীল সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি কি না। মনু বলেন—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" পুত্র উৎপাদন করিবার নিমিত্ত স্ত্রী ও পুরুষের যে পরস্পর মিলন, তাহাকে বিবাহ বলা যায়। কম্‌ট বলেন প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর সংসর্গনিরপেক্ষ হৃদয় ও মনের যে মিলন, তাহাই বিবাহ। আমরা এই দুই সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তয়িতার মতদ্বয়ের সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক বিবাহের লক্ষণ নির্দ্দেশ করি—প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর সংসর্গসাপেক্ষ হৃদয় ও মনের যে মিলন তাহাই বিবাহ। কম্‌ট যে বিবাহের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রণয়ের লক্ষণ, বিবাহেব লক্ষণ নহে। প্রণয় ও বন্ধুত্ব একই, তবে কেবল এই মাত্র প্রভেদ যে স্ত্রী ও পুরুষের হৃদয় ও মনের মিলন হইলে তাহাকে আমরা প্রণয় বলি এবং স্ত্রী ও স্ত্রীর বা পুরুষ ও পুরুষের হৃদয় ও মনের মিলন হইলে তাহাকে আমরা বন্ধুত্ব বলি। সুতরাং বন্ধুত্বকে যেমন আমরা বিবাহ বলি না, সেইরূপ শুদ্ধ প্রণয়কেও আমরা বিবাহ বলি না। আমাদিগের মতে হৃদয় মন ও শরীর—এ তিনেরই মিলন না হইলে বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু এই দুঃখময় জগতে আমরা বিবাহের এ পবিত্র ও পূর্ণ ভাবের কত সহস্র ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। পৃথিবীর বিশেষতঃ হতভাগ্য ভারতভূমির প্রতিগৃহই এই ব্যতিক্রমের বিষময় ফল ভোগ করিতেছে। প্রতি সুশি-ক্ষিত ব্যক্তিরই হৃদয় এই বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত। যাঁহারা ভাবিতে শিখেন নাই, যাঁহারা বিবাহকে শুদ্ধ ইন্দ্রিয়সেবার উপায়স্বরূপ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগের মনে কোন অসুখ নাই। স্ত্রীর সহিত শারী-রিক মিলনেই তাঁহারা পরম সুখী। স্ত্রী দেখিতে সুন্দর হয়, ধনবান্ লোকের কন্যা হয়, এবং পুত্রপ্রসবিনী হয়, তাহা হইলেই তাঁহাদিগের

পরম সুখ! কিন্তু যাঁহাদিগের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইয়াছে, যাঁহাদিগের চিন্তাশক্তি উদ্দীপিত হইয়াছে, এবং যাঁহারা সকল বিষয়ের তল স্পর্শ করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা ইহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। প্রচলিত বিবাহে তাঁহাদিগের হৃদয়ের শান্তি হইতে পারে না। হৃদয়ে হৃদয়ে, মনে মনে, ও দেহে দেহে যে অদ্বৈত ভাব, তাহার অভাবে তাঁহাদিগের সুখের উচ্চ আদর্শ পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। সুখের এই উচ্চ আদর্শের পরিতৃপ্তি বিরহেই অনেক সুশিক্ষিত যুবক শৃঙ্খল ভেদপূর্ব্বক বেশ্যালয় গমন প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। যাঁহারা দাম্পত্য সুখের উচ্চ আদর্শ জানিতে পারেন নাই, তাঁহারা একপ্রকার সুখে আছেন। কিন্তু যাঁহারা একবার সেই উচ্চ আদর্শ জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা ইহার পরিতৃপ্তি বিরহে কখনই প্রশান্ত থাকিতে পারেন না। দাম্পত্য সুখে বঞ্চিত হতাশা প্রপীড়িত যুবকের হৃদয়ের যে কি যন্ত্রণা, তাহা যিনি অনুভব করিয়াছেন, তিনিই জানেন। আমরা সমাজ ও রাজবিধি হইতে অসংখ্য সুখ প্রাপ্ত হইয়াছি বটে: কিন্তু আমরা সে সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত আছি, তথাপি দাম্পত্যসুখে বঞ্চিত হইতে চাহি না। আমরা পবিত্র দাম্পত্য সুখের বিনিময়ে প্রহরিপরিবেষ্টিত গগনস্পর্শিনী অট্টালিকায় রত্নখচিত পর্য্যঙ্কে বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিতে চাহি না। আমরা পর্ণশালায় বল্কল পরিধান করিয়া ভূমিশয্যায় শয়ন করি, তাহাতে আমাদের দুঃখ নাই, সমস্ত দিবস পর্য্যটনের পর সচ্ছন্দবনজাত ফল মূল শাকাদি দ্বারা জীবন ধারণ করি, তাহাতে আমাদের দুঃখ নাই, কিন্তু তথাপি যেন আমরা সাবিত্রী শকুন্তলা ডেস্‌ডেমেনা প্রভৃতির ন্যায় স্ত্রী পাই। তাহা হইলে সেই বল্কল আমাদের বহুমূল্য বস্ত্র, সেই ভূমি আমাদের দুগ্ধফেননিভ শয্যা এবং সেই ফল মূলাদি আমাদের বহুমূল্য মিষ্টান্ন হইয়া উঠিবে। যে বিষয়ে আমাদের জীবনের সমস্ত সুখ নির্ভর করিতেছে, সে বিষয়ে আমরা সমাজ বা রাজা কাহারও বাধা সহ্য করিতে পারি না। সমাজ বা রাজবিধির দোষে এ বিষয়ে আমরা অসুখী হইলে যখন সমাজ বা রাজা আমাদিগের সে অসুখ নিবারণে অক্ষম, তখন তাঁহাদিগের এ বিষয়ে

হস্তক্ষেপ করা কখনই উচিত নহে। এ বিষয়ে যাঁহারা সুখ-দুঃখের ভাগী, তাঁহাদিগেরই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। আমরা নিজের বুদ্ধিতে চিরজীবন কষ্ট পাই তাহাতে আমাদিগের দুঃখ নাই, কিন্তু আমরা পরের বুদ্ধিতে একদিনও কষ্ট পাইতে চাহিনা।

পাঠক! বিবাহ বিষয়ে আমাদিগের মত ব্যক্ত করিলাম। এক্ষণে দেখা যাউক বৃদ্ধ মনুর কি মত। মনু যখন—বিপক্ষ কন্যাপক্ষীয়দিগকে হত আহত করিয়া প্রাচীরাদি ভেদ-পূর্ব্বক রোরুদ্যমানা ক্রোধান্বিতা রমণীর কৌমার্য্য হরণ করাও বিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তিনি যখন—নিদ্রায় অভিভূতা বা মদ্যপানে বিহ্বলা অথবা অনবধানযুক্তা রমণীতে নির্জ্জন প্রদেশে গমন করাও বিবাহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; তখন স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক আর অনিচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, সংসর্গ মাত্রকেই তিনি বিবাহ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ দ্বয় যে মনুর মতে অতি নিকৃষ্ট, তাহা নামকরণেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। তিনি এই অপকৃষ্টত্ব অবগত হইয়াও যে এতদ্বয়ের বিবাহত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহার অভ্যন্তরে গভীর অর্থ নিহিত আছে। মনে কর, এইরূপে বলপূর্ব্বক বা অজ্ঞানাবস্থায় যে রমণীর কৌমারব্রত ভঙ্গ হইল, তাহার অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল, এবং সেই বলকৃত বা অজ্ঞানকৃত সংসর্গে তাহার গর্ভসঞ্চার হইল। এ অবস্থায় সেই সংসর্গকে বিবাহ বলিয়া স্বীকার না করিলে সেই হতভাগিনী রমণীর এবং তদ্গর্ভোৎপন্ন নিরপরাধ সন্তানের দশা কি হইবে? মনু এরূপ বিবাহকে বিধিবদ্ধ করিয়া অতিবুদ্ধিমান্ ও দূরদর্শীর কার্য্য করিয়াছেন সন্দেহ নাই। এরূপ ঘটনা যে সকল দেশেই সকল সময়ে ঘটিয়া থাকে, তাহা কে অস্বীকার করিবেন? কিন্তু এরূপ বিবাহ বলপূর্ব্বক চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা করা অনুচিত। যদি সেই রমণী সেই স্বামীর সহিত সহবাস করিতে না চান, বিধি বা সমাজের তাঁহাকে বলপূর্ব্বক সেই স্বামীর সহবাস করিতে বলার কোন অধিকার নাই। এরূপ অনিচ্ছা স্থলে সেই বলকৃত বা অজ্ঞানকৃত বিবাহকে শুদ্ধ সাময়িক বিবাহ মাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করাই উচিত।

মনু যে আট প্রকার বিবাহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ ভিন্ন আর কোন বিবাহেরই মূলে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগ নাই। হৃদয় ও মনের অদ্বৈত ভাবেই অনুরাগ জন্মে। যে বিবাহের মূলে বর ও কন্যার হৃদয় ও মনের অদ্বৈতভাব ও তজ্জনিত অনুরাগ নাই, তাহা উৎকৃষ্ট বিবাহ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব বিবাহের মূলে এই অদ্বৈতভাব আছে বলিয়া সে সকলকে আমরা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। একজন বর বিদ্যাসদাচারসম্পন্ন হইলেও যদি তিনি বিবাহার্থী না হন, যদি তিনি কন্যার প্রতি অনুরাগী না হন, তাহা হইলে তাঁহার হস্তে কন্যা সমর্পণ করিতে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রই ভীত হইবেন সন্দেহ নাই। বিদ্যাসদাচারসম্পন্ন অপ্রার্থক বরকে কন্যা সম্প্রদান করার নামই ব্রাহ্ম বিবাহ। এই ব্রাহ্ম বিবাহ অধুনা বিস্তীর্ণরূপে হিন্দুসমাজে প্রচলিত থাকায় আজকাল যে সকল অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে, তাহা কাহার অবিদিত? কন্যা অষ্টমবর্ষীয়া হইলেই জনকজননী তাহার বিবাহের জন্য ব্যাকুল হইয়া বস্ত্রালঙ্কার ধনাদির প্রলোভন দ্বারা কোন সুশিক্ষিত পাত্রকে প্রলুব্ধ করিয়া তাঁহার হস্তে কন্যা সমর্পণ করেন। কন্যা অষ্টমবর্ষীয়া, সুতরাং সে বিবাহ কাহাকে বলে, স্বামী কাহাকে বলে, আর পরিণামেই বা কি হইবে, কিছুই অবগতা নহে। সুশিক্ষিত যুবক ভাবিলেন, বয়োবিদ্যা গুণে তাঁহার অনুরূপ ভার্য্যা ত দুর্ল্লভই, তবে যাহা কিছু অর্থ আত্মসাৎ করিতে পারা যায় তাহাই লাভ। কিন্তু এরূপ বিবাহের বিষময় ফল অচিরাৎ ফলিতে আরম্ভ হয়। অর্থ বা অন্য কোন দ্রব্যের প্রলোভন শীঘ্রই তিরোহিত হয়। স্বামী ও স্ত্রী ক্রমেই দাম্পত্য প্রেমের অভিলাষী হইয়া উঠেন। দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক সময়েই তাঁহারা ইহাতে বঞ্চিত হন। যাঁহাদিগের অমানুষ ধৈর্য্য আছে, তাঁহারা এইরূপে হতাশা-প্রপীড়িত হইয়াও চিরজীবন অতিকষ্টে অতিবাহিত করিতে পারেন। কিন্তু জীবন তাঁহাদিগের নিকট জীর্ণ অরণ্যবৎ প্রতীয়মান হয়। কোন কার্য্যেই তাঁহাদিগের উৎসাহ থাকেনা। এইরূপ মানসিক অবস্থায় আবার ইন্দ্রিয়সংসর্গ যে কিরূপ বিশুদ্ধ ও প্রীতিপ্রদ, তাহা যাঁহা-

দিগের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তাঁহারাই জানেন। আমরা অনেকস্থলে দেখিতে পাই যে অনেক পরিণতবয়স্ক পুরুষ পরিণীতা দশমবর্ষীয়া বালিকার কৌমারব্রত ভঙ্গ করিতেও সঙ্কুচিত নন। বালিকা নবোঢ়া ও ভয়ে বিহ্বলা; সুতরাং স্বামীর অপবিত্র আলিঙ্গন নিবারণে অসমর্থা। কি ভয়ানক! বলাৎকার আবার কাহাকে বলে? কিন্তু এই প্রভেদ যে এ বলাৎকার আইনে দণ্ডার্হ নহে।

দাম্পত্য প্রেমে হতাশ দম্পতীর যদি ধৈর্য্য বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে সংসার যে কি ভয়ঙ্কর স্থান হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। স্বামীর স্ত্রীতে ও স্ত্রীর স্বামীতে যদি প্রণয়বৃত্তি চরিতার্থ না হয়, তাহাহইলে সেই বৃত্তি অন্য স্ত্রীতে বা অন্য পুরুষে চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা স্বভাবতঃ বলবতী হইয়া থাকে। যদি বিয়োজন-প্রথা (System of divorce) প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য স্ত্রী বা অন্য পুরুষকে অনায়াসে বিবাহ করিতে পারেন। তাহাহইলে কোনও বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। আমরা যে বিয়োজন-প্রথার প্রার্থী, তাহা ইংলণ্ড বা অন্যান্য ইউরোপীয় সভ্যসমাজের বিয়োজন-প্রথার অনুকারিণী হয়, ইহা আমাদের অভিলাষ নয়। স্বামী বা স্ত্রী বিচারালয়ে আসিয়া আপনাদের পরস্পরকে বা অন্য-তরকে ব্যভিচারিণী বা ব্যভিচারী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার যে চেষ্টা করে, তাহা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় বা লজ্জাকর বিষয় জগতে আর কি হইতে পারে জানিনা। এরূপ প্রথা ভারতবর্ষে, প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা আমরা কখন ইচ্ছা করিনা। স্বামী ও স্ত্রীর একত্র অবস্থিতি অতিশয় ক্লেশকর হইয়া উঠিলেই তাহাদিগকে পরস্পর বিয়োজিত করা উচিত। এরূপ অবস্থায় বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে সংযোজিত রাখিবার চেষ্টায় যে কত গরলময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। দম্পতী সহিষ্ণু হইলে কোন বাহ্য অনিষ্ট সংঘটিত হয় না বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের মন সতত বিষণ্ণ ও স্ফূর্ত্তিবিহীন হওয়ায় তাহারা উৎকৃষ্ট সন্তান জনন বা জগতের আর কোন হিতসাধন করিতে পারেন না। ক্রমেই তাঁহারা মনুষ্য-বিদ্বেষী হইয়া উঠেন। যাহাহউক, এরূপ লোক জগতের

পক্ষে অকর্ম্মণ্য হইলেও তাঁহাদিগের দ্বারা সমাজস্থিতির বিশেষ বিশৃ-ঙ্খলা ঘটে না। কিন্তু এরূপ ধৈর্য্য জগতে অতি বিরল! প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপস্থলে দম্পতীর উভয়ের বা অন্যতরের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতির ধৈর্য্যচ্যুতি হইলেও তাঁহারা অনেক সময় কলহ বিবাদাদি দ্বারাই ক্রোধ শান্তি করিয়া থাকেন। কিন্তু পুরুষ-জাতির স্বাধীনতা আছে, সুতরাং তাঁহাদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি হইলে তাঁহারা অনেক সময় নির্ভয়ে নায়িকান্তর অবলম্বন করিয়া অতৃপ্ত প্রণয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু স্ত্রীজাতির অতৃপ্ত প্রণয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার স্পৃহা বলবতী হইলেও তাঁহারা পুরুষজাতির ন্যায় নির্ভয়ে ইহা চরিতার্থ করিতে পারেন না। তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার গুপ্ত উপায় অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু পুরুষ জাতির ন্যায় তাঁহারা সহজে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। পুরুষজাতি প্রায় গৃহের বাহিরেই স্বাভিলাষ পূর্ণ করেন, সুতরাং স্বীকার না করিলে প্রায় ধরা পড়েন না। কিন্তু স্ত্রীজাতির অবস্থা স্বতন্ত্র। তাঁহাদিগকে প্রায় গৃহের অভ্যন্তরেই মনোরথ পূর্ণ করিতে হয়। গৃহ পরিত্যাগ করিয়া এরূপ করিলে তাঁহা-দিগকে সমাজচ্যুত হইয়া অবশেষে অগত্যা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। যতদিন গর্ভসঞ্চার না হয়, ততদিন তাঁহারা গৃহের অভ্যন্তরে থাকিয়া কথঞ্চিৎ মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন। কিন্তু গর্ভসঞ্চার প্রণয়-সম্মিলনের অনিবার্য্য ফল। গর্ভসঞ্চার হইলে প্রসূতির দুইটী বই পথ থাকে না (১) গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গর্ভরক্ষা (২) অথবা স্বহস্তে কুক্ষিস্থ সন্তানের প্রাণ-সংহার পূর্ব্বক গৃহে অবস্থিতি। অসহায়া রমণী গৃহ পরিত্যাগ করিতে সাহসিনী না হইয়া অনেক সময় অগত্যা প্রিয়তম সন্তানের প্রাণ-সংহার করেন। কোন কোন সময় স্বয়ং সন্তানের প্রাণ-বিনাশে অসমর্থা হইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। যাঁহারা সন্তানের প্রাণরক্ষা করিবার নিমিত্ত গৃহ পরিত্যাগ করেন, সমাজ তাঁহাদিগকে প্রতিগ্রহণ করেন না। সুতরাং বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করা ভিন্ন তাঁহা-দিগের আর উপায়ান্তর থাকে না। হতভাগিনী রমণীর প্রণয়-নাটকের শেষ অঙ্ক এইরূপে প্রায়ই নরহত্যা বা বেশ্যাবৃত্তিতে পর্য্যবসিত হয়।

এই সকল ভয়ানক অনিষ্টপাতের জন্য কে দায়ী? আমরা বলি, প্রধানতঃ সমাজ, দ্বিতীয়তঃ সমাজের অনুবর্ত্তন দ্বারা রাজবিধি। যদি সমাজ ও রাজবিধি নরনারীর বিবাহের অন্তর্ব্বর্ত্তী না হইতেন, যদি তাহাদিগকে বিবাহ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন, যদি মনোনীত করণে আত্মকৃত ভ্রমপ্রমাদ নিরাকরণ জন্য অনিয়ন্ত্রিত বিয়োজন-প্রথার প্রবর্ত্তন করিতেন, তাহা হইলে নরনারীর গোপনে প্রণয়ের অনুসরণ করার কোন আবশ্যকতা থাকিত না। সুতরাং জগতে ভ্রূণহত্যা, স্ত্রীহত্যা, বেশ্যাবৃত্তি, ব্যভিচার প্রভৃতি কিছুই থাকিত না। অনেকে বলিবেন, ইউরোপে ত বিবাহে স্বাধীনতা ও বিয়োজন প্রথা প্রচলিত আছে, তবে সেখানে ভ্রূণহত্যা, বেশ্যাবৃত্তি, ব্যভিচার প্রভৃতি কেন বিদ্যমান রহিয়াছে? তদুত্তরে আমরা এই বলিব, যে সেখানেও রীতিমত বিবাহে স্বাধীনতা এবং বিয়োজন-প্রথা প্রচলিত নাই। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, যতদিন সমাজে বিবাহে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও অবিশৃঙ্খলিত বিয়োজন-প্রথা প্রচলিত না হইবে, ততদিন ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি সামাজিক দুর্ঘটনা সকল কখনই নিবারিত হইবেনা। মনু যে কয় প্রকার বিবাহের লক্ষণ প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রাজাপত্য বিবাহের লক্ষণ পর্য্যালোচনা করিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, এ বিবাহে কন্যা ও বর পরস্পরের প্রতি অনুরাগী হইয়া পরস্পরকে মনোনীত করেন। পিতামাতা বা অভিভাবকগণ তাঁহাদিগের বিবাহের অনুমোদন করেন মাত্র। ব্রাহ্ম-বিবাহে বর ব্রহ্মবিদ্যা ও সদাচারাদিসম্পন্ন এবং অপ্রার্থক হইবেন। সুতরাং সে বিবাহের মুখ্য অংশ বরের গুণ—কন্যার প্রতি বরের অনুরাগ তাহার গৌণ অংশ মাত্র। কিন্তু প্রাজাপত্য বিবাহে বরের ব্রহ্মবিদ্যাতে প্রবেশ থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে; কিন্তু বরের প্রার্থক হওয়া চাই। এই প্রাজাপত্য বিবাহে অনুরাগ এবং পিতামাতা বা অভিভাবকগণের অনুমোদন এই দুইই আছে বলিয়া মনু এই বিবাহকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুমোদন করিয়াছেন। তিনি আর এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পিশাচ, এই পাঁচ প্রকার বিবাহের মধ্যে প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস এই তিন

প্রকার বিবাহ সকল বর্ণেরই ধর্ম্ম্য (১)। প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব বিবাহের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে আমরাও মনুর অনুগমন করিলাম। কিন্তু রাক্ষস-বিবাহ বলাৎকারমূলক, মনুর সহিত আমরা তাহার শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন করিতে পারিলাম না। প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব বিবাহের মূলে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ ব্যবস্থাপিত আছে বটে; কিন্তু মনু—অষ্টম ও দ্বাদশ বর্ষ-রূপ কন্যার বিবাহের যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন (২), সে সময়ে কন্যার অন্তরে অনুরাগের উদ্ভূতির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ত্রিংশৎবর্ষবয়স্ক পুরুষ দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে এবং চতুর্ব্বিংশতিবর্ষবয়স্ক ব্যক্তি অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে—মনুর এই বিধি প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব বিবাহের উপযোগী হইতে পারে না। এই উভয় প্রকার বিবাহেই বর ও কন্যার যুবা ও যুবতী হওয়া আবশ্যক। নতুবা বর ও কন্যার পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ববিবাহ প্রায় একই রূপ। উভয়েতেই বর ও কন্যার পরস্পরের প্রতি অনুরাগ থাকা প্রথম প্রয়োজনীয়। তবে এই মাত্র প্রভেদ যে, প্রাজাপত্য বিবাহ পিতামাতা বা অভিভাবকগণের অনুমোদনসাপেক্ষ, এবং গান্ধর্ব্ব বিবাহ পিতামাতা বা অভিভাবকগণের অনুমোদন-নিরপেক্ষ। এই বিবাহদ্বয়ের পুনঃ প্রবর্ত্তনা অতীব প্রয়োজনীয়। মনু প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব বিবাহকে বিধিবদ্ধ করিয়া বিবাহে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি মনোনীত করণে ভ্রমপ্রমাদাদি নিরাকরণ জন্য অবিশৃঙ্খলিত বিয়োজন-প্রথার প্রবর্ত্তন করেন নাই। বিবাহ তাঁহার মতে চিরস্থায়ী। একবার প্রজাপতি কর্ত্তৃক পতি ও পত্নী সম্বন্ধ সংঘটিত হইলে, বিক্রয় ও ত্যাগেও সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার নহে (৩)। তাঁহার বিধানানুসারে স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে, বা দশবৎসর পর্য্যন্ত মৃতপ্রজা হইলে, বা একাদশবর্ষ পর্য্যন্ত স্ত্রীজননী হইলে, অথবা

---

(১) পঞ্চানাস্তু ত্রয়োধর্ম্ম্যা দ্বাবধর্ম্ম্যৌ স্মৃতাবিহ। ৩। ২৫।

(২) ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্। ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টমবর্ষাম্বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ। ৯। ৯৪।

(৩) ন নিষ্ক্রয় বিসর্গাভ্যাং ভর্ত্তুর্ভার্য্যা বিমুচ্যতে। এবং ধর্ম্মং বিজানীমঃ প্রাক্ প্রজাপতি নির্ম্মিতম্। ৯। ৪৬।

অপ্রিয়বাদিনী হইলে স্বামী তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিতে পারেন বটে (১), কিন্তু স্বামী সদাচারবিহীন, অন্য স্ত্রীতে অনুরক্ত বা বিদ্যাদিগুণবিহীন হইলেও স্ত্রীর তাঁহাকে সতত দেবতার ন্যায় সেবা করিতেই হইবে (২)। স্ত্রীর কিছুতেই নিস্তার নাই, পতি তাঁহাকে পরিত্যাগ করুন বা ভার্য্যান্তরগ্রহণ করুন, স্ত্রীকে আজীবন তদনুধ্যান করিতেই হইবে। ইহাতেও স্ত্রীর যন্ত্রণার অবসান হইবেনা। পতি প্রেত হইলেও স্ত্রী পুষ্প মূল ফলাদিদ্বারা বরং দেহের ক্ষপণ করিবেন, তথাপি পরপুরুষের নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন না। মনু যদি কম্‌টের ন্যায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতির পক্ষে আজীবন এই বিবাহব্রত প্রতিপালনের ব্যবস্থা দিতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার উপর দোষারোপ করিতে পারিতাম না। কিন্তু তিনি যখন স্বামীর হস্তে অপ্রিয়বাদিত্বরূপ সামান্য অপরাধেও এক ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যান্তর গ্রহণের অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তখন ভার্য্যাকে স্বামী বিষয়ে আজীবন কঠোর ব্রত প্রতিপালনের আদেশ করা তাঁহার মত উচ্চাশয় ব্যক্তির অনুচিত হইয়াছে। শাস্ত্রকারদিগের এরূপ স্বজাতিপক্ষপাতিতা অতীব দোষার্হ সন্দেহ নাই। পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা বা বিধবা নারী পুনর্ব্বার অন্যের ভার্য্যা হইয়া উহাঁ দ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করেন, সেই পুত্র উৎপাদকের পৌনর্ভবনামক পুত্র হয় এবং সেই নারী পুনর্ভূ—নামে আখ্যাত হন (৩)—এই বচন দ্বারা মনু পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা বা বিধবা নারীর বিবাহের অনুমোদন করিয়াছেন বটে; কিন্তু বিবাহের যে সকল মন্ত্র আছে, তাহা কন্যা অর্থাৎ অক্ষতযোনি স্ত্রীর বিষয়েই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, অকন্যাদিগের বিষয়ে নহে, যাহার

---

(১) বন্ধ্যাষ্টমেহধিবেদ্যাব্দে দশমেতু মৃতপ্রজা। একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী। ৯ ৮১।

(২) বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ। উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ। ৫১। ৫৪।

(৩) যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া। উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে। ৯। ১৭৫।

কন্যাত্ব নষ্ট হয়, তাহার ধর্ম্ম্য বিবাহের অধিকার লোপ হইয়া যায় (১) এবং—বিবাহবিধায়ক শাস্ত্রে এমন উক্তি নাই যে, বিধবা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ হয় (২) ইত্যাদি বচনদ্বারা তিনি আবার বিধবা প্রভৃতির বিবাহের প্রতিষেধ করিয়াছেন, এরূপ সংশয় স্থলে কোন্ পক্ষ তাঁহার অভিমত তাহা আমরা নির্ণয় করিতে পারিনা। কিন্তু নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে প্রতীতি হয় যে, বিধবা বা পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা নারী পত্যন্তর গ্রহণ করেন, ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা নয়, তবে তাঁহারা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে করিতে পারেন, অগত্যা এরূপ অনুমোদন করিয়াছেন মাত্র। তাঁহার অনুমোদনের উদ্দেশ্য এই যে তাঁহাদিগের বিবাহ—তাঁহার সম্পূর্ণ অভিমত না হইলেও তদানীন্তন প্রচলিত আচার ব্যবহার বা শাস্ত্রের বিরোধী হইবে না। এইরূপে তাঁহার পরস্পর-বিসম্বাদি মত দ্বয়ের কথঞ্চিৎ সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারা যায়। যে মনু প্রথমে দ্বিজাতিদিগের সবর্ণা বিবাহই বিধেয় ও যাহারা কাম-প্রবৃত্ত হইয়া বহুবিবাহ করিতে চায়, তাহারা অনুলোমক্রমে ক্রমশঃ নিকৃষ্ট বর্ণের স্ত্রীকে বিবাহ করিবে (৩), এই বচন দ্বারা একস্ত্রী সত্ত্বেও পুরুষের বহুবিবাহের অনুমোদন করিয়াছেন; যে মনু স্ত্রী মদ্যপানে আসক্তা, কদাচারা, ভর্ত্তার প্রতিকূলাচরণশীলা, কুষ্ঠাদিরোগগ্রস্তা, হিংস্রস্বভাবা, অর্থনাশকারিণী (৪) বা অপ্রিয়বাদিনী হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করার ভার স্বামীর হস্তে অর্পণ করিয়াছেন; সেই মনুই স্ত্রী স্বামীকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা বা বিধবা হইলেও তাঁহার পক্ষে আজীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। ধন্য রে পুরুষজাতি! ধন্য তোমার স্বার্থপরতা! স্ত্রীজাতির প্রতি তোমার

(১) পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ। নাকন্যাসু ক্বচিন্নৃনাং লুপ্তধর্ম্মক্রিয়া হিতাঃ। ৮। ২২৬।

(২) ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ। ৯। ৬৫

(৩) সবর্ণাগ্রেদ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি। কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃস্যুঃ ক্রমশোবরাঃ। ৩। ১২।

(৪) মদ্যপাঽসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যাভবেৎ। ব্যাধিবেত্তব্যা হিংস্রাঽর্থঘ্নীচ সর্ব্বদা॥ ৯। ৮০।

নিষ্ঠুরতা এতদূর বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, যে যাঁহারা তোমার ভূষণ-স্বরূপ বলিয়া পরিগণিত, তাঁহারাও এই পাপের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই।

এক্ষণে আমরা এই মাত্র বলিয়া বিবাহবিষয়ে মনুর মতের সমালোচনার উপসংহার করিলাম। সম্প্রতি পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। যে ঔদার্য্যগুণে মনু বিপক্ষ কন্যাপক্ষীয়দিগকে হত ও আহত করিয়া প্রাচীরাদি ভেদ করতঃ রোরুদ্যমানা ক্রোশন্তী রমণীর বলপূর্ব্বক কৌমারব্রত ভঙ্গ করাকেও বিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া এবং নিদ্রায় অভিভূতা বা মদ্যপানে বিহ্বলা অথবা অনবধানযুক্তা স্ত্রীতে নির্জ্জন প্রদেশে গমন করাকেও বিবাহনামে আখ্যাত করিয়া, বলাৎকৃতা হতভাগিনী রমণীর ও তদ্গর্ভজাত নিরপরাধ সন্তানের গৌরবরক্ষা করিয়াছেন; এবং যে ঔদার্য্যগুণে মনু কন্যা এবং বরের *পরস্পরের প্রতি অনুরাগী হইয়া নির্জ্জনে সংসর্গপূর্ব্বক পরস্পরের সহিত* মিলিত হওয়াকে উৎকৃষ্ট বিবাহমধ্যে পরিগণিত করিয়া ভারতের রত্নস্বরূপ শকুন্তলা, সীতা ও ভরত প্রভৃতিকে "ব্যভিচারজাত" এই অপবাদ হইতে মুক্ত করিয়াছেন; সেই ঔদার্য্যগুণেই মনু ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন, অপবিদ্ধ, কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ন্দত্ত ও পারশব ঔরস ভিন্ন এই একাদশ প্রকার পুত্রকে বিধিবদ্ধ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বীরবর ভীমসেন, মহারথী কর্ণ ও অর্জ্জুন, মহামতি নকুল ও সহদেব, মহারাজ পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্র এবং ধার্ম্মিকপ্রবর বিদুর প্রভৃতিকে সমাজের উচ্চ সিংহাসন প্রদান করিয়াছেন। মানুষের যত প্রকার সন্তান হওয়া সম্ভব, মনু তৎসমস্তকেই বিধিবদ্ধ করিয়া প্রগাঢ় বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। চৈতন্য ও মহম্মদ ভিন্ন জগতের আর কোন ব্যবস্থাপক অদ্যাবধি মনুর এই গভীর মর্ম্মের উদ্ভেদ করিতে পারেন নাই।

তাঁহারা প্রকৃতির স্রোত বলপূর্ব্বক রোধ করিতে গিয়া অনেক সময় সমাজে ভীষণ তরঙ্গ উত্থাপিত করিয়া থাকেন। মনু—প্রকৃতির স্রোত রোধ না করিয়া ইহার অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন মাত্র। আমরা দ্বাদশ

প্রকার পুত্রের লক্ষণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক মনুর মতের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি।

স্বামী—স্বকীয়া পরিণীতা ভার্য্যাতে স্বয়ং যে পুত্র উৎপাদন করেন, তাহাকে ঔরস পুত্র বলে। এই পুত্র মুখ্যপুত্র বলিয়া গৃহীত। (১)। অপুত্র, মৃত, পুংসক বা ব্যাধিত ব্যক্তির ভার্য্যা, নিয়োগধর্ম্মানুসারে গুরু-জনকর্তৃক নিযুক্ত হইয়া, সপিণ্ড ব্যক্তির দ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহাকে ক্ষেত্রীর ক্ষেত্রজপুত্র বলে। (২)। পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্র এবং যুধি-ষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইঁহারা সকলেই ক্ষেত্রজ পুত্র। স্বজাতীয় কোন ব্যক্তির অপুত্রত্বরূপ আপৎকালে জনক জননী প্রীতি পূর্ব্বক যে পুত্রকে দান করেন, সেই পুত্র গ্রহীতার দত্তক পুত্ররূপে পরিগণিত হয়। (৩)

যদি কেহ গুন-দোষ বিচক্ষণ পুত্রোচিত গুণোপেত স্বজাতীর কোন ব্যক্তিকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন, সেই পুত্র গ্রহীতার কৃত্রিম পুত্ররূপে খ্যাত হয়। (৪)

আপনার পরিণীতা ভার্য্যাতে অজ্ঞাতপুরুষ কর্তৃক জনিত পুত্র, ভর্ত্তার গূঢ়োৎপন্ন পুত্ররূপে পরিগৃহীত হয়। (৫)

জনক জননী উভয়েই যে পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথবা জননীর মরণানন্তর জনক, বা জনকের মরণানন্তর জননী, একাকী যে পুত্রকে ত্যাগ করিয়াছেন, সেই পুত্রকে যিনি গ্রহণ করেন, সেই পুত্র গ্রহীতার অপবিদ্ধ নামক পুত্র হয়। (৬)

---

(১) স্বে ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্তু স্বয়মুৎপাদযেদ্ধিয়ম। তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিতম্। ৯। ১৬৬

(২) যস্তল্পজঃ প্রমীতস্য ক্লীবস্য বাধিতস্য বা। স্বধর্ম্মেণ নিযুক্তায়াং সপুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্মৃতঃ। ৯। ১৬৭

(৩) মাতা পিতা বা দদ্যাতাং যমদ্ভিঃপুত্রমাপদি। সদৃশং প্রীতি-সংযুক্তং সজ্ঞেয়ো দত্রিমঃ সুতঃ। ৯ ১৬৮

(৪) সদৃশন্তু প্রকুর্য্যাদ্ যং গুণদোষ বিচক্ষণম্। পুত্রং পুত্রগুণৈর্যুক্তং স বিজ্ঞেয়শ্চ কৃত্রিমঃ। ৯। ১৬৯

(৫) উৎপদ্যতে গৃহে যস্য ন চ জ্ঞায়তে কস্য সঃ। স গৃহে গূঢ় উৎপন্নস্তস্য স্যাদ্ যস্যতল্পজঃ।। ৯। ১৭০

(৬) মাতাপিতৃভ্যামুৎসৃষ্টং তয়োরন্যতরেণ বা। যং পুত্রং পরিগৃহ্ণীয়াদপবিদ্ধঃ স উচ্যতে। ৮। ১৭১

পিতৃগৃহে থাকিয়া অবিবাহিতা কন্যা নির্জ্জনে যে পুত্র উৎপাদন করে, ঐ কন্যাকে যে বিবাহ করে, সেই পুত্র তাহার কানীন নামক পুত্র হয়। এই নিয়মানুসারে অঙ্গরাজ কর্ণ পাণ্ডুর কানীন পুত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। (১)

জ্ঞাতগর্ভা বা অজ্ঞাতগর্ভা কন্যাকে যে বিবাহ করে, সেই গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সেই পুত্র পরিণেতার সহোঢ় নামক পুত্র হয়। (২)

মাতা পিতার নিকট হইতে অপত্যার্থ মূল্য দ্বারা যে পুত্রকে ক্রয় করাযায়, সেই পুত্রকে ক্রেতার ক্রীতপুত্র বলাযায়। (৩)

পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা মৃতপতিকা স্ত্রী পুনঃ সংস্কারদ্বারা অন্যের ভার্য্যা হইয়া উহাদ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করেন, ঐ পুত্র উৎপাদকের পৌনর্ভব নামক পুত্র হয়। (৪)

মাতৃ-পিতৃ-বিহীন, অথবা অকারণে মাতাপিতাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত পুত্র যদি স্বয়ং আপনাকে দান করে, তাহাহইলে সেই পুত্র গ্রহীতার স্বয়ংদত্ত পুত্র হয়। (৫)

যে ব্রাহ্মণ কামাতুর হইয়া শূদ্রাতে পুত্র উৎপাদন করে, সেই পুত্র সমর্থ হইয়াও পিতার শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের অনধিকারী প্রযুক্ত মৃততুল্য, এইজন্য এই পুত্র ঐ ব্রাহ্মণের পারশব পুত্র নামে আখ্যাত। (৬)

এইরূপে মনু যে দ্বাদশ প্রকার পুত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাদিগকে আমরা প্রাকৃতিক ও গৃহীত এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করিলাম।

---

(১) পিতৃ বেশ্মনিকন্যা তু যং পুত্রং জনয়েদ্রহঃ। তং কানীনং বদেন্নাম্না বোঢ়ুঃ কন্যা সমুদ্ভবম্। ৯। ১৭২

(২) যা গর্ভিনী সংস্ক্রিয়তে জ্ঞাতাঽজ্ঞাতাপি বা সতী। বোঢ়ুঃসগর্ভোভবতি সহোঢ় ইতি চোচ্যতে। ৯। ১৭৩

(৩) ক্রীনীযাদ্ যস্তপত্যার্থং মাতাপিত্রোর্যমন্তিকাৎ। সক্রীতকঃ সুতস্তস্য সদৃশোঽ সদৃশোঽপিবা। ৯। ১৭৪

(৪) যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া। উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে। ৯। ১৭৫

(৫) মাতাপিতৃ বিহীনোযস্ত্যক্তোবাস্যাদকারণাৎ। আত্মানং স্পর্শয়েদ্ যস্মৈ স্বয়ন্দত্তস্তু স্মৃতঃ। ৯। ১৭৬

(৬) যং ব্রাহ্মণস্তু শূদ্রায়াং কামাদুৎপাদয়েৎ সুতম্। স পারয়ন্নেব শব স্তস্মাৎ পারশবঃ স্মৃতঃ। ৯। ১৭৭।

যে সকল পুত্রের সহিত স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের বা অন্যতরের রক্তসম্বন্ধ আছে, তাহাদিগকে আমরা এই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিলাম।

(১) ঔরস (২) পৌনর্ভব (৩) পারশব (৪) ক্ষেত্রজ (৫) কানীন (৬) সহোঢ় এবং (৭) গূঢ়োৎপন্ন, এই সপ্তবিধ পুত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তন্মধ্যে ঔরস, পৌনর্ভব ও পারশব, এই ত্রিবিধ পুত্রের সহিত স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই রক্তসম্বন্ধ এবং অবশিষ্ট চতুর্ব্বিধ পুত্রের সহিত শুদ্ধ স্ত্রীর রক্তসম্বন্ধ আছে। (৮) দত্তক (৯) কৃত্রিম (১০) অপবিদ্ধ (১১) ক্রীতক (১২) এবং স্বয়ন্দত্ত, এই পঞ্চবিধ পুত্র গৃহীত বিভাগের অন্তর্গত। এই পঞ্চবিধ পুত্রেব সহিত গ্রহীতা বা গ্রহীতৃ পত্নীর রক্তসম্বন্ধ থাকিতেও পাবে, না থাকিতেও পারে।

বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর উদার ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিয়া দায়ভাগপ্রণেতা জীমতবাহনের সঙ্কীর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। জীমূতবাহন পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ প্রকাব পুত্রের মধ্যে শুদ্ধ ঔরস ও দত্তক পুত্রকে স্বীকাব করিয়াছেন, তিনি আর দশ প্রকার পুত্রকে অস্বীকার করিয়া তাহাদিগকে সমাজ ও বিধির বহির্ভূত করিয়াছেন। মনুকে এরূপ অবমাননা করিয়া জীমূতবাহন হিন্দুসমাজের উপকার বা অপকার করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। উপকার বা অপকারের নির্ণয় করিতে গেলে দেখিতে হইবে, বর্ত্তমান সময়ে অবশিষ্ট দশপ্রকার বা তাহাদিগের মধ্যে কোন প্রকার পুত্রের অস্তিত্ব সম্ভবপর কিনা। যদি সম্ভবপর হয়, তাহাহইলে তাহাদিগকে সমাজ ও বিধির বহির্ভূত করা অতি সঙ্কীর্ণমনা ও নৃশংসের কার্য্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই। জীমূতবাহন যে শ্রেণীর পুত্রকে বিধি বহির্ভূত করিয়াছেন, আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, যে সেই শ্রেণী হইতেই পুরাকালে অসংখ্য হিন্দুকুলতিলক উৎপন্ন হইয়াছেন। যে ব্যাস ও পাণ্ডুপুত্রগণ না জন্মিলে মহাভারতের সৃষ্টি হইত না, যে সতীত্বভূষণা সীতা জন্মগ্রহণ না করিলে রামায়ণের সৃষ্টি হইত না, কোন্ পাষাণ হৃদয় ব্যক্তি তাদৃশ পুরুষরত্ন ও রমণীরত্ন দিগকে হিন্দুসমাজ হইতে বহিস্কৃত করিতে চাহেন, আমরা জানিতে চাই। ইহাঁদিগকে পরিত্যাগ করিলে হিন্দুপুরাবৃত্তে

ঘোর অন্ধকার উপস্থিত হয়, হিন্দু-সাহিত্যসিন্ধু শুকাইয়া যায়, হিন্দু-হৃদয়ের প্রীতিস্রোত সংরুদ্ধ হয়। এক সীতার সতীত্ববলে ভারতললনা অদ্যাপি জগতের রমণীকুলের শিরোমণি হইয়া রহিয়াছেন, এক ব্যাসের রচনাবলে ভারতসাহিত্য জগতের সাহিত্যসমাজে অদ্যাপি উচ্চ সিংহাসন অধিকার করিতেছে, এক যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মবল দুর্ব্বল ভারতবাসীদিগের অন্তরে অদ্যাপি ধর্ম্মবল প্রদান করিতেছে, এক ভীমের গদা ও এক অর্জ্জুনের গাণ্ডীব এখনও নির্ব্বীর্য্য আর্য্যসন্তানদিগকে ভাবী স্বাধীনতার আশা দিতেছে। যে আর্য্যনামে আমরা এত গর্ব্বিত, যে আর্য্যনাম শুনিবামাত্র আমরা উন্মত্ত হইয়া উঠি, সেই আর্য্যনামের এত গৌরব ইঁহাদিগেরই জন্য। আমরা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করি, সেখানেও দেখি, এই শ্রেণীর পুত্রের গৌরবে ইউরোপের মুখ উজ্জ্বল। যে খ্রীষ্টিয়ধর্ম্মের ও খ্রীষ্টিয় বীর্য্যের জয়ধ্বনি এক্ষণে জগতের প্রায় সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতেছে, যে খ্রীষ্টিয় বীর্য্যের নিকট অকূল সাগর ও গগনস্পর্শী পর্ব্বতও আর দুর্লঙ্ঘ্য নাই, সেই খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম ও খ্রীষ্টিয় বীর্য্যের প্রণোদক—ক্রাইষ্ট—মেরীর গর্ভজাত কানীন পুত্র। যে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন লাপ্‌লাস্ জন্ম পরিগ্রহ করায় বিজ্ঞানভূমি ফ্রান্স নিউটনজননী ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইতে পারিয়াছিলেন, সেই লাপলাসও এই শ্রেণীর পুত্র। কিন্তু লজ্জার কথা, সুসভ্য ইউরোপও অদ্যাপি এরূপ সন্তানদিগকে বিধিবদ্ধকরণে মনুর ন্যায় ঔদার্য্যপ্রদর্শন করিতে পারেন নাই। মনুর মত রহিত হওয়ায় মনুষ্য প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা আমরা বিশ্বাস করিনা। মনুষ্য প্রকৃতি সেই এক ভাবেই রহিয়াছে। প্রকৃতির কার্য্য সমাজ ও রাজবিধিদ্বারা বিনষ্ট হইবার নহে। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ প্রকৃতির স্রোত রোধ করিতে গিয়া পাপের স্রোত পরিবর্দ্ধিত করিতেছেন মাত্র।

পুরাকালে স্বামী মৃত, নপুংসক অথবা শক্তিবিহীন হইলে স্ত্রী নিয়োগ-ধর্ম্মানুসারে গুরুজন-কর্ত্তৃক নিযুক্তা হইয়া, সপিণ্ডব্যক্তিদ্বারা পুত্র উৎপাদন করিতেন, এবং সেই পুত্র স্বামীর ক্ষেত্রজপুত্ররূপে গৃহীত হইত। এক্ষণে নিয়োগধর্ম্ম প্রচলিত নাই, তথাপি অনেক স্থলে স্বামী

মৃত, নপুংসক অথবা শক্তি-বিহীন হইলে স্ত্রী প্রকৃতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া সপিণ্ড বা অসপিণ্ড ব্যক্তিদ্বারা গর্ভ উৎপাদন করেন, কিন্তু সমাজভয়ে সেই গর্ভের বিনাশ সম্পাদন করেন। পুর্ব্বকালে স্বামীর অনুপস্থিতি-কালে অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক আপনার ভার্য্যাতে গূঢ়ভাবে পুত্র উৎপাদিত হইলে, স্বামী সেই অপরাধে ভার্য্যার প্রাণসংহার না করিয়া সেই পুত্রটীকে আপনার গূঢ়োৎপন্ন পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতেন। এক্ষণে অনুপস্থিতিকালে অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক আপনার ভার্য্যাতে গূঢ়ভাবে পুত্র উৎপাদিত হইয়াছে জানিতে পারিলে স্বামী স্ত্রীর প্রাণ সংহার করিবেন, এই ভয়ে স্ত্রী সেই গর্ভের বিনাশ সম্পাদন করেন। পুরাকালে কন্যা পিতৃ-গৃহে থাকিয়া অপ্রকাশ্যে সন্তান উৎপাদন করিলে, ঐ কন্যাকে যিনি বিবাহ করিতেন, সেই ব্যক্তিই ঐ সন্তানটীকে আপনার কানীন পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতেন। এক্ষণে কন্যা কন্যকাবস্থায় পিতৃগৃহে থাকিয়া গর্ভবতী হইলে তাহার আর বিবাহের আশা থাকেনা, এইজন্য জনক-জননী লোক-লজ্জাভয়ে কন্যার সেই গর্ভের বিনাশ সম্পাদন করেন। পুরাকালে জ্ঞাতগর্ভা বা অজ্ঞাতগর্ভা কন্যাকে যিনি বিবাহ করিতেন, ঐ গর্ভজাত পুত্র সেই পরিণেতার সহোঢ়পুত্ররূপে জনসমাজে পরিগৃহীত হইত। এক্ষণে জ্ঞাতগর্ভা কন্যার বিবাহই অসম্ভব, সুতরাং তাঁহাকে বিবাহের পূর্ব্বে গর্ভনষ্ট করিতেই হইবে, নতুবা তাঁহার বিবাহ হইবেনা। অজ্ঞাত-গর্ভা কন্যার গর্ভ যদি দুই এক মাসের হয়, তবেই তাঁহার রক্ষা, নতুবা, স্বামী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভার্য্যান্তর অবলম্বন করি-বেন, এবং তাঁহাকে অগত্যা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। এরূপ ঘটনা কুলীনদিগের মধ্যে বিরল নহে। পুরাকালে স্ত্রী, পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা বা বিধবা হইলে আবার অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিয়া উহাঁ দ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করিতেন, সেই পুত্র পরিণেতার পৌনর্ভব-পুত্র নামে সমাজে গৃহীত হইত। এক্ষণে স্ত্রী স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে তাঁহার আর বিবাহের ব্যবস্থা নাই, সুতরাং সে অবস্থায় তাঁহার গর্ভ হইলে সে গর্ভ নষ্ট না করিলে তাঁহার আর সমাজে থাকার আশা নাই। আহ্লাদের বিষয় এই যে এক্ষণে বিধবার বিবাহ প্রচলিত

হইয়াছে, এবং পরিণীতা বিধবার পুত্র ঔরসপুত্রমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, কিন্তু অবিবাহিতা বিধবার গর্ভসঞ্চার হইলে সেই গর্ভস্থ সন্ততির রক্ষার কোন উপায় নিরূপিত হয় নাই। এই সকল কারণে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ প্রতিদিন ভীষণ ভ্রূণহত্যার পাপে দূষিত ও কলঙ্কিত হইতেছে। প্রায় প্রতি গৃহ এই পাপের স্রোতে প্লাবিত হইতেছে. আমরা কন্যাকে মনোমত পাত্রে ন্যস্ত করিবনা, অথচ স্বামীসহবাসে অসুখিনী-কন্যার অন্যপুরুষ-কর্ত্তৃক গর্ভসঞ্চার হইলে জলন্ত অনলের ন্যায় প্রজ্জলিত হইয়া উঠিব এবং যে কোন উপায়ে সেই নিরপরাধ কুক্ষিস্থ জীবের প্রাণ সংহার করিব। আমরা বিধবার বিবাহ দিবনা, অথচ সেই বিধবার গর্ভ হইলে তাহা রক্ষা করিবনা। আমরা পুত্রকন্যাদিগকে প্রকৃত প্রেমের অনুসরণে বিবাহ দিবনা, অথচ তাহারা স্বয়ং প্রকৃত-প্রেমের অনুসরণ করিলে তাহাদিগকে আমরা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারণী বলিয়া অধঃকৃত করিব। হয়ত অনেক সময় এরূপ ঘটিয়া থাকে, যে যাহাকে আমরা ব্যভিচার বলি, তাহাই প্রকৃত বিবাহ; এবং যাহাকে আমরা পবিত্র বিবাহ বলি, তাহাই প্রকৃত ব্যভিচার। যতদিন বিবাহপ্রথা সম্পূর্ণরূপে বিশোধিত না হইবে, ততদিন এই ব্যভিচার কখনই সম্পূর্ণরূপে তিবোহিত হইবেনা। বিবাহ বিষয়ে সমাজের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করার নামই ব্যভিচার। যতদিন সমাজ বিবাহ বিষয়ে অন্যায় নিয়ম সংস্থাপন করিবেন, ততদিন নরনারী সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করিবেই করিবে, কেহই রক্ষা করিতে পারিবেন না। কোন কালে কোন দেশে ব্যভিচার সম্পূর্ণরূপে বিশোধিত হয় নাই, সুতরাং কোন কালে কোন দেশে ব্যভিচার সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয় নাই। কোন কালে কোন দেশে বিবাহপ্রথা যে সম্পূর্ণরূপে বিশোধিত হইবে, তাহার আশা দেখা যায় না, সুতরাং কোন কালে কোন দেশে ব্যভিচার যে সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইবে, তাহারও আশা দেখা যায় না। এইজন্য মনুর ন্যায় উদারচেতা সূক্ষ্মদর্শী বিচক্ষণ পণ্ডিত ব্যভিচারোৎপন্ন নিরপরাধ সন্তানগণকে বিধি ও সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহাদিগকে "ব্যভিচার জাত" এই অপবাদ হইতে উন্মুক্ত করিয়া-

ছিলেন। মনু জানিতেন যে ইহাদিগকে সমাজের বহিভূর্ত করিলে ইহারা মনুষ্য-বিদ্বেষী হইয়া উঠিবে, সুতরাং ইহাদিগের দ্বারা জগতের অনিষ্ট বই ইষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিবেনা। কিন্তু ইহাদিগকে সমাজের ক্রোড়ে গ্রহণ করিলে ইহারা জগতের অশেষ হিতসাধন করিবে। এইজন্যই তাঁহার এত প্রকার পুত্রের ব্যবস্থা।

প্রতি গৃহে যাহা চলিতেছে, যাহা নিবারণ করিতে কেহ সক্ষম নহে, সেই মনুষ্য-সুলভ দুর্ব্বলতা লুকাইতে গিয়া আমরা গুরুতর ভ্রূণহত্যা পাপে নিমগ্ন হই। নরহত্যা মাত্রই গুরুতর পাতক সন্দেহ নাই, কিন্তু নিরপরাধ কুক্ষিস্থ জীবের প্রাণ-সংহাররূপ নরহত্যা অপেক্ষা গুরুতর পাপ জগতে আর নাই। মনু সূক্ষ্মদর্শী ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন, সুতরাং এই সকল ভয়ঙ্কর অনিষ্টপাত নিবারণের জন্যই তিনি নানাপ্রকার পুত্রের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আধুনিক স্মার্ত্তেরা তাঁহার এই গভীর বুদ্ধির উপর প্রবেশ করিতে না পারিয়া, তাঁহার অতি শুভকর নিয়ম সকল উঠাইয়া দিয়া হিন্দুসমাজের শত্রুর কার্য্য করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সমাজসংস্কারক ও ব্যবস্থাপকেরা মনুপ্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের গভীর বুদ্ধির অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, ইহাই আমাদিগের ইচ্ছা।

আমরা উপসংহারকালে এই প্রস্তাব-রচয়িতা বাবু ঈশানচন্দ্র বসু মহোদয়কে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। যদিও তিনি মনুকে যে ভাবে লোকের নিকট অবতারিত করিয়াছেন, মনু অনেক স্থলে সে ভাবের লোক ছিলেন না, যদিও অনেক স্থলে আমরা তাঁহার সহিত মতে মিলিতে পারিনা, তথাপি এরূপ প্রস্তাবের অবতারণা করিয়া তিনি যে আমাদিগকে বিশেষ প্রীত করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি, তিনি এইরূপ প্রস্তাব লিখিয়া মধ্যে মধ্যে আমাদিগের চিন্তাশক্তিকে আকৃষ্ট করিবেন